নাট্য মন্দির-সূচীপত্র।

(দ্বিতীয় বর্ষ)

নাট্য-মন্দির।

[বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।]

দ্বিতীয় বর্ষ। } শ্রাবণ, ১৩১৮। { প্রথম সংখ্যা।

নববর্ষে নাট্য-মন্দির।

(শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি লিখিত।)

অশান্তি, কলহ, বাধা, যাতনা, অভাব,
দুঃখ, দৈন্য, নিস্তব্ধতা, রোগ, শোক এবে—
গিয়াছে বিস্মৃতি রাজ্যে [illegible]
অতীতের স্মৃতি হয়ে ফিরিবেনা আর!
হয় ত বা ছিল সুখ অতীতের মাঝে,
হয় ত বা শান্তি-কণা ছিল সে অতীতে;
হয় ত বা ক্ষত-হৃদে, রবে ক্ষত-স্মৃতি,
তথাপি অতীত বর্ষ বিদায় তোমায়।
স্বাগত নবীন বর্ষ—মধুর উজ্জ্বল,
আশা-মন্ত্রে উদ্দীপিত কর নরলোক,
উদ্যম, উৎসাহ, শান্তি লয়ে এসো সাথে,
কর্ম্মময়, জ্ঞানময় করহ জগৎ!
ফুটুক আশার আলো এ নাট্য-মন্দিরে,
শান্তি-পথ সে আলোক দেখাক্ সবারে!!!

দুই ভগিনী।

[নাট্য-গল্প]

(শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

[কক্ষমধ্যে লতিকা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা,—শয্যা-পার্শ্বে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী রোরুদ্যমানা যূথিকা আসীনা ;— কাল সন্ধ্যা।]

লতিকা। দিদি! আর তো আমার সময় নেই, এখনই [illegible] নিয়ে যাবে ; আচার্য্যকে ডেকে পাঠাও দিদি।

যূথিকা। ব্যস্ত হ'য়ো না বোন, তিনি এখনই আসবেন।

লতিকা। হাঁ দিদি—তিনি আসুন, পুণ্যাত্মা তিনি,—তাঁর আগমনে আমার এ অপবিত্র কক্ষ পবিত্র হোক্। দিদি, আমি আজ তাঁর কাছে অকপটচিত্তে মুক্তকণ্ঠে আমার সব কথা ব্যক্ত করবো—জীবনে যা কিছু পাপাচরণ করেছি, মরবার আগে তাঁর কাছে সমস্ত প্রকাশ করবো ; তাহলেই আমি পাপমুক্ত হবো—আমার আত্মার সদ্গতি হবে—প্রেমময় বিশ্বপিতার পদপ্রান্তে স্থান পাবে। হাঁ দিদি, আমার এ আশা কি সফল হবে না ?

যূথিকা। তুমি বোন পুণ্যবতী, তোমার মনে এ আত্মগ্লানি শোভা পায় না ; আচার্য্যের উপদেশ শুনে তোমার আত্মগ্লানি দূর হোক্—তোমার রোগ-যাতনার অবসান হোক্—তোমার জ্যোতিহীন কোটরগত চক্ষু দুটি আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠুক,—ভগবানের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

(আচার্য্যের প্রবেশ।)

লতিকা। এসেছেন প্রভু? আমি আজ বিশ্বস্ততার শেষপ্রান্তে এসে পড়েছি, এখন আপনার কৃপা ব্যতীত বিশ্বাসতার পরপ্রান্তে পঁহুছাইবার উপায় নেই। আপনি কি আমাকে দয়া করবেন? আমার পাপ-কাহিনী শুনে কি আমায় উদ্ধার করবেন?

আচার্য্য। বৎসে! তোমার মনে যখন অনুতাপ উপস্থিত হয়েছে—তখন তোমার আত্মার কল্যাণ হবেই, ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন। তুমি নির্ভয়ে তোমার মনোভাব ব্যক্ত করো।

লতিকা। হাঁ প্রভু, তাই করবো, —এ কপটতাটুকু নির্ভয়ে আমার মনোভাব ব্যক্ত করবো। দিদি, দিদি ভাই! আমার গুপ্ত কথা শোনো, ক্ষমা ক'রো আমাকে ক্ষমা ক'রো।

যূথিকা। কি তুমি বল্‌ছো বোন? তোমাকে আমি ক্ষমা করবো? কেন? কিসের জন্য? তুমি তো আমার কাছে কোনো অপরাধে অপরাধী নও, জীবনে তুমি তো আমার প্রতি কোনো অন্যায়াচরণ কর নাই। তুমি সেবা-পরায়ণী—তুমি ত্যাগস্বীকারিণী। আমার জন্য তুমি আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছ, তোমার সুকোমল হৃদয়কে মরুভূমির মতন ভীষণ ক'রে তুলেছ, আমার জন্য তুমি চিরজীবন কষ্ট সহ্য করেছ। তোমার আত্মত্যাগ অতুলনীয়, তোমার আদর্শ

লতিকা। দিদি, দিদি, চুপ করো, আমার অনুরোধ, চুপ করো ভাই; আমার মনোভাব আমাকে ব্যক্ত করতে দাও; সময় উপস্থিত, এখনি দীপ নিবে যাবে। আমি যা বল্‌বো—তা মন দিয়ে শোনো। ওঃ—সে কি ভয়ানক! আমার উক্তির প্রত্যেক কথাটি যে তীব্র কালকূট-মাখা! আমি আজ বিশ্বভূমির শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি;—লোক-গঞ্জনা—নিন্দা ভৎর্সনা

সে জ্বালা কি ভীষণ—কি ভীষণ! সে আগুনে আমার মনের সুখ শান্তি পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেলো; আহারে রুচি রৈল না, চক্ষে আর নিদ্রা এলো না; কত দীর্ঘ রাত্রি আমি অনিদ্রায় কাটালুম; দারুণ যাতনায় আমি অধীর হয়ে উঠলুম; রোগে শোকে মর্মাহত হ'য়ে আমি বিছানায় আশ্রয় নিলুম; হিংসাবিষে আমার সমস্ত হৃদয় জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠলো, মনে মনে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম অটল আমার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা, আমি তাকে কোন মতে অপরের করগত হ'তে দেবো না; দিদি তাকে বিবাহ ক'রে সুখী হবে—এ আমার অসহ্য! দিদিকে আমি এমন সৌভাগ্যের অধিকারিণী হ'তে দেবো না; সহস্র চেষ্টা ক'রেও দিদি অটলকে বিবাহ করতে পারবে না; অটল আমার, তার জন্য আমি আমার হৃদয়-আসন শূন্য করে রেখেছি; অটল আমার হবে,—আমি তাকে বিবাহ করবো।

[illegible]বিকা। [illegible]—শান্তি—চাই, তুই চুপ কর্; তোর কথা আমি শুনতে চাই না—তুই চুপ কর্; তোর অবস্থা দেখে আমি ভয় পাচ্ছি—

[illegible]হিকা। ভয় পেয়ো না দিদি,—আমি তোমার ভগিনী বোন হলেও, এতদিন যখন এক সঙ্গে কাটিয়ে এসেছো, তখন আর শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়ো না দিদি; হৃদয়কে পাষাণে বেঁধে আমার কথা শুনে ফেলো;—তারপর এইভাবে কিছুদিন কেটে গেলো; আমি অনন্ত আশা—অতৃপ্ত পিপাসা নিয়ে অটলের পাছু পাছু ঘুরতে লাগলুম; কিন্তু বুঝলুম—অটল আমার নয়, অটলের জন্য আমি মন প্রাণ জীবন যৌবন সমস্ত উৎসর্গ করেছি—তার জন্য আমার হৃদয়-সিংহাসন সাজিয়ে পেতে রেখেছি, কিন্তু অটল তার প্রার্থী নয়; আমার এই কুসুমকোমল-তুল্য অতুলনীয় রূপরাশি—আমার মধুময় নব যৌবন—আমার স্বার্থশূন্য অপ্রমেয় প্রেম—এসব কিছুরই সে প্রত্যাশী নয়;—সে চায় তোমাকে,

তার হৃদয় যূথিকাময় ;—লতিকার জন্য সেখানে তিল মাত্রও স্থান নাই! একদিন সন্ধ্যার পর তোমরা দুজনে নদীর ধারে বেড়াতে গেলে ; আমিও চুপি চুপি তোমাদের পাছু নিলুম। সে দিন শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী, আকাশে রজত কিরণ ঢেলে দিয়ে চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠেছিল, পূর্ণচাঁদের সুধাধারায় স্নাত রজনী হাস্যময়ী। সেই অমল ধবল জ্যোৎস্নারাশি প্রকৃতির বুকের উপর প'ড়ে যেন কোনো স্বপ্নের সাগরের অতীত স্মৃতিকে খুঁজে বার ক'রছিল! এই জ্যোৎস্নাবারিধি ভেদ ক'রে তোমরা দুজনে নদীর ধারে শিলাতলে গিয়ে ব'স্‌লে, আমি দূরে দাঁড়িয়ে তোমাদের দুজনকে দেখতে লাগলুম। দেখলুম অমর তোমাকে তার সেই সুন্দর সুঠাম সুবিশাল বক্ষের উপর টেনে নিয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করলে, শতবার সে আদরে তোমার মুখচুম্বন করলে। আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটে গেলো, দেহের সমস্ত শোণিত উত্তপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, দারুণ যাতনায় আমার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দগ্ধ হ'তে লাগ্‌ল, ক্রোধে ক্ষোভে আমি হিতাহিত জ্ঞানহারা হলুম; প্রতিশোধ লালসায় আমি উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌লুম। আমাকে উপেক্ষা ক'রে অতুল তোমাকে বিবাহ করে, এ চিন্তাকেও আমি অন্তরে স্থান দিতে পারলুম না। যে অতুলকে এতদিন আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে পূজা করতুম, যার ভুবনমোহন মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলুম, এবার তাকে অন্যচক্ষে অন্যরূপে দেখ্‌লুম। তাকে পরম শত্রু ব'লে গণ্য করলুম। হৃদয় হ'তে তার প্রতিমূর্ত্তি উৎপাটিত ক'রে ফেললুম; —প্রতিহিংসা-রাক্ষসী আমার শূন্যহৃদয় অধিকার ক'রে ব'সল।

যূথিকা। লতি, লতি, চুপ কর—তোর কথা শুনে অতীতের সুখ স্মৃতি আবার আমার মনে জেগে উঠ্‌ছে—প্রণয়দেবতার মনোহর কান্তি আমার চোখের ওপর ফুটে উঠেছে—তাঁর জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি আমি যে মনশ্চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি বোন,—চুপ কর তুই—

লতিকা। বাধা দিয়ো না দিদি-- আমায় বল্‌তে দাও, সময় শেষ হয়ে আস্‌চে-- বল্‌তে দাও দিদি শেষ কথাগুলি বলে ফেলি আমি-- তুমিও দিদি শুনে নাও। তোমার বোধ হয় মনে আছে-- অটল কেক্ বড় ভালবাস্‌তো, তাই তুমি তার জন্য নিজের হাতে কেক তৈরী কর্‌তে। এক দিন সন্ধ্যার পর তুমি কেক তৈরী ক'রে রেখে কোথায় গিয়েছ, এমন সময় আমি চুপি চুপি রান্নাঘরে গেলুম, সমস্ত কেকে বিষ মাখিয়ে দিলুম। অটল সে দিন তিনখানা কেক খেলে, আমি একখানি খেয়েছিলুম, শরীর ভাল ছিল না ব'লে তুমি মোটেই খাও নি। বাকি কেকগুলো আমি পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিলুম। মনে পড়ে তিন দিন পরে হাঁসগুলো সব মরে গিয়েছিল?

যূথিকা। উঃ!!!

লতিকা। দিদি, চুপ করো, কিছু ব'লো না ভাই, শুনে যাও।-- সেই কেক খেয়ে অটলের প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে উড়ে চলে গেলো, আমার মরণ হ'লো না, আমি চিররুগ্ন হয়ে পড়ে রইলুম। তখন তোমার বিবাহের সমস্ত আয়োজন হয়েছিল, বিবাহের তিন দিন মাত্র বাকি, এমন সময় এই দুর্ঘটনা ঘটলো; বসন্তের নির্মল আকাশে সহসা বজ্রাঘাত হ'লো, সুখের প্রথম প্রভাত প্রলয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'লো, তোমার অন্তরের বিকাশোন্মুখ প্রেম-কুসুম অকালে শুখিয়ে ঝরে পড়ে গেলো! নিষ্ঠুর অদৃষ্টের এই তীব্র উপহাসে তোমার হৃদয় ভেঙ্গে পড়্‌লো, আশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো! তোমার দীর্ণবিদীর্ণ হৃদয়-মন্দির হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল! তুমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, আর কখনো বিবাহ করবে না; বিধবার পরিচ্ছদে তুমি তোমার অতুলনীয় রূপরাশি ঢেকে ফেল্‌লে। সহসা আমার যেন চেতনা হ'লো, অনুতাপের জ্বলন্ত অনলে আমার হৃদয় দগ্ধ হতে লাগ্‌ল, আমি আমার পাপের গুরুত্ব বুঝ্‌তে পার্‌লুম। মনে আছে?—

এক দিন আমি তোমাকে বললুম—দিদি, আমিও তোমার মতন বে করবো না, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। আমার কথা শুনে তুমি প্রথমে উপহাস করেছিলে, আমি যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবো এ কথা তুমি বিশ্বাসই করতে পারনি। কিন্তু যখন পিতা মাতার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে তোমার মিনতি অগ্রাহ্য ক'রে আমি অবিবাহিত রইলুম, যখন শত শত সুশিক্ষিত সুন্দর রূপবান যুবক ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে ফিরে গেলো সহস্র প্রলোভনেও আমার প্রতিজ্ঞা টললো না, তখন তুমি বুঝেছিলে, যে আমি মিথ্যাবাদিনী নই! —কেমন মনে আছে তো? সেই দিন থেকে আমরা কখনো পৃথক হই নি, আমরা দুজনে সর্বদাই এক সঙ্গে থাকতুম। দেখে সকলে বলতো—বোন দুটি যেন একবৃন্তে ফোটা দুটি ফুল। কিন্তু একদিনের জন্যও আমার বিষাদদিগ্ধ মুখখানি দেখোনি, জান নি কি এক তীব্র জ্বালা, কি এক অসহ্য বেদনা আমার জীবনের সুখ শান্তি হরণ করেছিল। চিন্তায় চিন্তায় আমার শরীর ভেঙে গেলো। শীঘ্রই আমি জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লুম। উঃ অতীতের সেই শোচনীয় স্মৃতির দিন হ'তে পলে পলে আমার অন্তর পুড়ে ছিল প্রতি মুহূর্তে আমার হৃদপিণ্ড দগ্ধ হ'চ্ছিল! আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম একদিন দিদিকে এসব কথা বলবো। মৃত্যুর আগে দিদিকে সমস্ত কথা বলে যাবো!—উঃ দিদি ভাই, আজ সেই দিন,—তাই আজ তোমাকে এই ডাকিনীর পাপের কাহিনী শুনিয়ে দিলুম! —উঃ—দিদি আজ আমার মরতে ভয় হচ্ছে! এই ভয়—মৃত্যুর পর পরলোকে যদি অটলের সঙ্গে আমার দেখা হয়, আমি তাহলে তাহলে—তাকে কি বলবো? কি ক'রে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব?—উঃহঃ, বড় জ্বালা—

যূথিকা।—(স্বগতঃ) হা জীবনাধিক! এই ভাবে তোমার জীবনের অবসান হয়েছিল?—আমাদের সংযোগ-কাহিনী যে বড় মর্মস্পর্শী

স্ত্রী-শিক্ষা।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

যে বঙ্গমহিলা বিদ্যাবতী হন, দুর্ভাগ্য বশতঃ সমাজ তাঁহার প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন। সমাজ তাঁহাকে অশেষ দোষের আকর বিবেচনা করেন। তাঁহার চাল-চলন, [illegible] সমস্তই সমাজের ঘৃণিত. —সমাজের মতে স্ত্রী শিক্ষা বিড়ম্বনা [illegible]! শিক্ষায় সমাজ, শিক্ষাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু শিক্ষাই,—শিক্ষা কখনও বিড়ম্বনা হয় না,—শিক্ষার অভাবই বিড়ম্বনা। আধুনিক শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যতীত অপর কিছুই নয়। বাঙ্গালা ভাষাও পাশ্চাত্য-ভাবে পরিপূর্ণ। বঙ্গমহিলা বাঙ্গালা বা ইংরাজি বিদ্যাই লাভ করুন, তাহাও পাশ্চাত্য-বিদ্যালাভ করেন মাত্র। পরন্তু; বস্তুর সহিত প্রাচ্য-বিদ্যার প্রভেদ, ধরণে—মূলে নয়। দেবী সরস্বতী শুভ্রবর্ণা, শ্বেত পদ্মাসনা, বীণাযন্ত্রধারিণী পূর্ব্বে পশ্চিমেও,—কেবল পরিচ্ছদের প্রভেদ। পাশ্চাত্য বিদ্যায় ধর্ম্ম দীক্ষা ও বৈষয়িক দীক্ষা স্বতন্ত্র। প্রাচ্য দীক্ষায় বিশেষতঃ হিন্দু দীক্ষায় এক ধর্ম্ম দীক্ষা আছে, আর সমস্ত দীক্ষাই তাহার অন্তর্গত। পাশ্চাত্য দীক্ষায় বঙ্গমহিলা কেবল বৈষয়িক দীক্ষাই পান; ধর্ম্ম-দীক্ষার অভাব রহিয়া যায়। এই ধর্ম্ম-দীক্ষার অভাবই লক্ষ্য করিয়া সমাজ শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, কিন্তু বোঝেন না—সে অভাবের নিমিত্ত সমাজ দোষী, শিক্ষা দোষী নয়। একটু স্থির চিত্তে বিচার করিলে, সমাজ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দু-সমাজ-সৃষ্ট শিক্ষিতা হিন্দুমহিলার কোলে স্তন্যপান করিয়া নিদ্রা যাইতে যাইতে কৃষ্ণের সহস্রনাম শুনিয়া শিক্ষিত

ঠাকুমার কাছে, গল্প ছলে রাম-চরিত যুধিষ্ঠির-চরিত্র শ্রবণ করিয়া সেখান হৃদয় হইতে সমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন। শিক্ষিতা পিতামহী, শিক্ষিতা মাতা, শিক্ষিতা ভগিনী ও শিক্ষিতা সহধর্ম্মিণীর শিক্ষায় তিনি সমাজ স্রষ্টা. মাতৃ দুগ্ধের সহিত ধর্ম্মশিক্ষা পাইয়া স্বেচ্ছায় কখনও অসত্য কথা উচ্চারণ করিতে পারেন নাই. চেষ্টায় কখনও পর অহিত সাধনে সমর্থ হন নাই,—স্বার্থ তাড়নে পরধন অপহরণে সমর্থ হন নাই, সন্ন্যাসী হইবার চেষ্টা করিয়াও জিহ্বাকে বিমুখ করিতে সক্ষম হন নাই। ধর্ম্ম শিক্ষা অস্থির সহিত, মজ্জার সহিত, শিরার সহিত, শোণিতের সহিত এক হইয়া তাঁহাকে সমাজ স্রষ্টা করিয়াছে। তবে সৃষ্টি করিব বলিয়া সমাজ সৃষ্টি করেন নাই. তাঁহার আচার ব্যবহার, রীতি নীতির আদর্শে সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে. অতি কদাচারী ব্যক্তিও তাঁহার ধর্ম্মজ্যোতি-প্রভাবে চরণে আসিয়া অবনত হইয়াছে, কঠোর হৃদয়ে দয়া প্রবেশ করিয়াছে, দুঃশীল শান্ত সহিষ্ণু হইয়া [illegible] [illegible]। ইন্দ্রিয়-প্রবলা বিধবা তাঁহারই উক্ত আদর্শে ব্রহ্মচারিণী [illegible] তাঁহারই মিষ্ট উপদেশে বালক [illegible] পরিহার পূর্ব্বক মাতা[illegible] [illegible]কট কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান—দীক্ষার্থী। চঞ্চল বালক, সমবয়স্কের সহিত বিদ্যানুশীলনে রত, পরস্পর কলহ করে না, প্রহারের ভয় নয় অন্য কোনও ভয় নয়,—ভয় পাছে সেই শিক্ষিতা স্ত্রী-দীক্ষিত সমাজ-স্রষ্টা মনোক্ষুণ্ণ হন। শিক্ষিতা স্ত্রী-দীক্ষার সমাজ এতদূর বলশালী। শিক্ষার অভাবই ঘৃণ্য, শিক্ষা ঘৃণ্য নয়। সমাজ অন্য কিছুই নয়, আমরা সকলে মিলিয়াই সমাজ। যদি পাশ্চাত্য শিক্ষা ধর্ম্ম শিক্ষা ব্যতীত সুফলপ্রদ না হয়, সে ধর্ম্ম-শিক্ষা বালিকাকে কে দিবে? পাঠক! যোড় হস্তে বিনয় বচনে আপনার নিকটে নিবেদন,—আপনাদের মধ্যে কয়জন কার্পেট জুতা নির্ম্মাত্রী বালিকা অপেক্ষা সত্যবাদিনী বালিকায় আদর করিয়াছেন? কয়জন পিতা বিশ্রাম সময়ে স্বীয় কন্যার মুখে,

"কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা," শ্লোক না শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম বলিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন? কয় জন স্বামী স্বীয় পত্নী-কন্যার ধর্ম্মোন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। যদি নিজ নিজ গৃহে এ কার্য্য না করিয়া থাকেন, তবে একত্র মিলিয়া একজন প্রগলভা কুমারীকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এ শিক্ষার অভাব তাহার পূরণ করুন—শিক্ষার দোষ দিবেন না।

বহুদিন নয়, মুসলমান আসিবার কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষরে, জাপানে "প্রণব" ক্ষোদিত হইয়াছে। যদি আধুনিক জাতীয় নাশকারী কুসংস্কার উপেক্ষা করিয়া কালাপানীর ভয় পরিহারে জাপানে যান—দেখিতে পাইবেন,—যে বাঙ্গালা অক্ষরেই প্রণব ক্ষোদিত বটে। ফিলি-পাইন ও জাভায় বাঙ্গালা মুদ্রাকে চিনিতে পারিবেন. যে বাঙ্গালী এখন পানসী চড়িতে ভয় পায়। বহু দিন নয়, সিরাজদ্দৌলার আমলে বীরপুরুষ বাঙ্গালা দাম্ভিক ইংরাজ সৈন্যকে স্তম্ভিত করিয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী দিবে। বহু দিন নয়,—ইংরাজ আমলেও বাঙ্গালী—"আমি বাঙ্গালী" বলিয়া স্বদেশের আদর করিত, বহু দিন নয়, পঞ্চাশ বৎসর গত মাত্র, বাঙ্গালী নির্ম্মিত বস্ত্রে ইংরাজ রাজমহিষী ভূষিতা হইতেন। বহু দিন নয় পঞ্চাশবর্ষ অপেক্ষা ন্যূন গতমাত্র, এক পল্লীতে বাঙ্গালীর পরস্পর সদ্ভাব ছিল,—একের বিপদ বা সম্পদে—পল্লীর বিপদ বা সম্পদ বলিয়া গণ্য হইত। বহু দিন নয়—বাঙ্গালী মুরব্বি মানিত, মুরব্বির কর্ণে হুঁকার ধ্বনি প্রবেশ করিলে লজ্জিত হইত। বহু দিন নয়,—মৃত ব্যক্তির সৎকারের নিমিত্ত সমস্ত পল্লী অগ্রসর হইত, পত্নীর বা পুত্রবধূর মৃত দেহ সৎকার আশঙ্কায় গড-ছলনা হইত না, কিন্তু কিছুই আর নাই। বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে—বাঙ্গালী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

কিন্তু একটী রত্ন বাঙ্গালীর গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয় নাই,—এ রত্ন

নারী-রত্ন। যাহারা পতির সহিত সহমরণে যাইত তাহারা আজও আছে;—প্রকাশ্যে পতির সহিত আইন ভয়ে দগ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু পতি আর বাঁচিবে না নিশ্চয় করিয়া বিনা রোগে বস্ত্রাচ্ছাদনে, ধরণীশয়নে মৃত্যু মুখে পতির অনুগামিনী হয়। অতি প্রগল্‌ভাও পরপুরুষ দর্শনে মস্তক অবনত করেন। ইংরাজী নভেলের 'হিরোইন' বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে 'পরাজিত'। যে কুৎসিৎ লম্পট, পত্নীকে প্রত্যা-খ্যান করিয়া বারবিলাসিনীর গৃহে দাস্যভাবাপন্ন হইয়া বাস করে, সেও আজও জানে যে, সে পত্নী তাহার প্রত্যাখ্যানে কোন-বৃত্তি-অর্থ অর্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে বটে, তথাপি দারুণ সংক্রামক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া পরিত্যক্ত পত্নীর নিকট আসিলে সাধ্বী, শত শত দুর্ব্যবহার ভুলিয়া সীতা সাবিত্রী—আদর্শ শিক্ষিতা দুঃখিনী পরিত্যক্তা মর্ম্মপীড়িতা রমণী যে তাহাকে আশ্রয় দিবে, এ বিশ্বাসে সন্দেহ জন্মে না,—এই নারীরত্ন বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে দেবী—সেই গৃহ-লক্ষ্মী সম্প্রতি ত্যক্তা হইয়াও চঞ্চলা হয় না।

আশ্চর্য্য, সমাজ কালে শিক্ষা অভাবে যাহাতে এই কুলদেবী পাশ্চাত্য-প্রেমিকা হন, এই চেষ্টায় তাঁহাকে শিক্ষা দিতে অসম্মত। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় বহু দোষই থাকুক, স্ত্রীশিক্ষা দানে পরাঙ্মুখ কেন? পাশ্চাত্য বিদ্যা স্বাধীনতার পক্ষপাতী, স্বাধীনতার পক্ষপাতী অন্তঃপুরের নয়। স্বাধীনতায় উপদেশ দেয়, আপনার ভার কাহাকেও দিব না, আপনার সংসার আপনি রক্ষা করিব,—আপনার সন্তানের নিমিত্ত আপনি দায়ী, আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম, ভরণপোষণ—আপনার দ্বারাই নির্ব্বাহ করিব। পাশ্চাত্য শিক্ষায় এই স্বাধীনতা শেখায়। বাঙ্গালী মহিলা এ স্বাধীনতা নূতন শিখিতেছে না,—প্রপিতামহী পরম্পরাক্রমে তাঁহার প্রপিতামহী হইতে ধারাবাহিক ক্রমে এই স্বাধীনতা শিখিয়া আসিতেছে। সেই শিক্ষা বলে আজও দেখা যায় যে অসূর্য্যম্পশ্যা বাঙ্গালী নারী দুর্দ্দিনে

নিপতিতা হইয়া পরগলগ্রহ অবস্থাকে ঘৃণা করিয়া পরগৃহে সামান্য রন্ধনকার্য্যে নিযুক্তা। বাঙ্গালীর ঘরে গিন্নী নাই। এই এ[illegible] প্রধান অভাব। গিন্নীর কার্য্য অনেক ছিল যাহা অদ্যাপি কোনও সুশিক্ষিত ব্যক্তি করিতে পারেন না। গিন্নী অতি সুশিক্ষিতা ছিলেন, কত আয়ে কত ব্যয় করিতে হয়, তিনি জানিতেন। তাঁহার গুণে, চাকরী যাইলেও ইন্সলভেন্সি গ্রহণ বা জেলে যাইতে হইত না। কি নিয়ম পালনে বালক নীরোগ হইয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহা গিন্নী সম্পূর্ণ জানিতেন। গিন্নীর প্রভাবে পঞ্চাশ টাকা মাহিনার অর্দ্ধেক বা অর্দ্ধাংশ ডাক্তারকে বা ডাক্তারখানায় দিতে হইত না। গিন্নী জানিতেন পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া কিরূপে আপনার করিতে হয়; কিরূপে স্বামীকে ভক্তি দেখাইয়া স্বামী সোহাগিনী হইতে হয়। গিন্নী জানিতেন কি নিয়মে দাসদাসীকে পরিবারস্থ করিয়া তাহাদের নিজ গৃহ ভুলাইয়া দিয়া তাঁহার গৃহে গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করাইতে হয়। গিন্নীর শিক্ষায় ভৃত্য, প্রভুর নিমিত্ত প্রাণ দিতে সঙ্কুচিত হইত না। গিন্নী জানিতেন, কিরূপে নাতিগুলিকে মানুষ করিতে হয়, কালে সেই নাতিগুলিই দশ-কর্ম্মান্বিত। গিন্নী শিক্ষিতা, এ শিক্ষায় যিনি শিক্ষা না বোঝেন, অক্ষর শিক্ষা যাঁহার শিক্ষা বোধ, তিনিও গিন্নীর প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া বুঝিবেন যে, গিন্নী অক্ষর জানিতেন— বুঝিবেন যে, কর্ণ দিয়া হউক বা চক্ষু দিয়া হউক গিন্নী অক্ষরের মর্ম্ম জানেন। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত তো তাঁহার কণ্ঠস্থ বটেই, এ ব্যতীত সাধু সেবায় গিন্নী ষড়্-দর্শনে শিক্ষিতা হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন কোন স্থানে চাউলের কি দর, বস্ত্রের কি দর,—কখন চাউল কিনিলে সুবিধা—এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা, তিনি একজন ব্যবসায়ীকে দিতে পারিতেন। দৈব বিপাকে উপার্জ্জনকারীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সংসার একেবারে নিরাশ্রয় হইত না। তিনি সাময়িক শিল্পকার্য্য সকলই জানিতেন,—চিকিৎসা—

পাইবেন যে তাঁহার পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূটী বৈধব্য অবস্থায় অসতী হইবার আশঙ্কা দূরে থাকুক দিন দিন মলিন হইয়া পতির সহগমনে অগ্রসর হইতেছে। বিরহ জনিত দারুণ পীড়ায় যদি মৃত্যুমুখে অব্যাহতি পায়, দেখিবেন তখন আর তাহার সে বেশ ভূষার পারিপাট্য নাই। সুবেশা বিবি এখন ব্রহ্মচারিণী, এরূপ ব্রহ্মচারিণী তাঁহার গৃহে তিনি বহুদিন দেখেন নাই। চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বুঝিতে পারিবেন যে, পুত্রবধূটী পতিপ্রাণা। বিবিয়ানা সাজ বাহিক আবরণ মাত্র ছিল। স্বামীর তুষ্টির নিমত্ত, স্বামীকে গৃহে রাখিবার নিমিত্ত, স্বামীর প্রেমাকাঙ্ক্ষীণী হইয়া বিবিয়ানা ভান করিয়াছিল।

বধূ যদি এরূপ সচ্চরিত্রা এরূপ পতিপ্রাণা, তবে পুত্রের জীবিত অবস্থায় সংসার কার্য্যে কি নিমিত্ত বিরক্তি প্রকাশ করিত ? কেন, বুঝিলেই বুঝিতে পারেন যে, তাহার গৃহিণী পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া আপনার মেয়ের মত যত্ন করিতে পারে নাই। সেই নিমিত্তই সে শাশুড়ীকে যত্ন করে নাই। দেখিয়াছে গৃহিণীর স্বীয় কন্যা সুসজ্জিতা হইয়া বেড়ায়। জামাই আসিলে অতি আগ্রহের সহিত গৃহিণী কন্যা জামাতা যাহাতে অনেক সময় একত্রে সহবাস করে, তাহার নিমিত্ত উদ্যোগী, কিন্তু সে সুবেশা হইয়া স্বামীকে গৃহে আবদ্ধ রাখিলে গৃহিণী দারুণ বিরক্তা। কন্যার সহিত ব্যবহারে এই প্রভেদ দেখিয়া পুত্রবধূটীও শ্বশুড়ীকে যত্ন করিতে শেখে নাই। তিনি (গৃহস্বামী) বুঝিবেন যে, তাঁহার গৃহিণী আমাদের বর্ণিত গিন্নীর মত গিন্নী নয়। হিন্দুগৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার গৃহিণীর অনেক ক্রটী ছিল। পুত্রবধূটীরও এই নিমিত্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে ক্রটী ঘটিত।

এদিকে আবার পুত্রকেও পর করিয়াছিলেন। সুন্দরী পত্নীকে পুত্রটী ভালবাসিত কিন্তু নিত্য দেখিত, মা বা ভগিনী কেহই তাঁহাকে যত্ন করে না, গোবর নেদী দিয়া, ধোঁয়ার গন্ধ গায়ে মাখিয়া, বেল

বিন্যাস না করিয়া মলিন বসনে যাহাতে তাহার শয্যাপার্শ্বে আসে,—তাহার মাতা ও ভগিনীর তাহাই চেষ্টা ছিল। একখানি পুস্তক না পড়ে, একটি আমোদ আহ্লাদ না করে, ভগিনী ও মাতার ইহাই ইচ্ছা। ত্রুটি হইলে উপদেশ নাই, কেবলই তিরস্কার। নিত্য সজল নয়নে গভীর রাত্রে তাহার নিকট আসে। এ সকল পুত্রের সহ্য হয় নাই। সেমিজ, শাড়ি কিনিয়া দিয়াছে, আতর এসেন্স কিনিয়া দিয়াছে, নভেল কিনিয়া দিয়াছে, আমোদ উপযোগী ক্রীড়ার যন্ত্র কিনিয়া দিয়াছে, সুসজ্জিত হইতে উপদেশ দিয়াছে,—মাতৃবাক্য এবং ভগিনীবাক্য তাচ্ছিল্য করিতে উপদেশ দিয়াছে। সুসজ্জিত হইয়া তাহার নিকট নভেল পড়িতে বলে, উত্তম তাস লইয়া তাহার সঙ্গে খেলিতে বলে—লাজ লজ্জায় পড়িয়া কখনও গৃহকার্য্যে গেলে বিরক্তি প্রকাশ করে। এ অবস্থায় দোষ ঘটিলে চমৎকৃত হন কেন? এ সকল দোষ শিক্ষার নহে শিক্ষার অভাবের দোষ।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর গৃহে স্ত্রী-পুরুষের স্বর্গীয়, সরস প্রেমালাপ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "বিষবৃক্ষে" শ্রীশচন্দ্র স্ত্রৈণ অপবাদ অখ্যাতি বিবেচনা না করিয়া সুখ্যাতি ভাবে গ্রহণ করিয়া নিন্দুকের নিমিত্ত ভোজ আয়োজনের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কমলমণি রসিকা কম নন, সুবেশাও বটেন; কিন্তু দাম্পত্য প্রেমচিত্র দর্শনে এখন গৃহশূন্য পিতামহও মুগ্ধ হইবেন। সর্ব্ব গুণযুক্তা বুড়ি কিরূপ রসিকা ছিলেন, তাঁহার মনে পড়িবে। পিতামহ লম্পট নন—এখন সমাজ স্ত্রৈণ বলিলেও বলিতে পারেন।

স্ত্রী শিক্ষা যে আজকাল প্রচলিত তাহা নহে, বহু দিন ভারতবর্ষে আছে। কবিতা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র তাহার ভূরী ভূরী প্রমাণ দিবে। বৌদ্ধ-ইতিহাসে শিক্ষিতা স্ত্রীর কথা পত্রে পত্রে। ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্বতন পুরুষেরা আমাদের অপেক্ষা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, কিন্তু স্ত্রী-

শিক্ষায় ঘৃণা করিতেন না,—শিক্ষায় অভাবই ঘৃণ্য। অশিক্ষিতা মাতা, শিশু সন্তানকে শিক্ষিত করিতে পারে না, এই বঙ্গদেশের প্রধান বিড়ম্বনা।

পরিচ্ছদের প্রতি বিরক্তির কথা বলিতে বলিতে আমাদের একটী গল্প মনে পড়িল। কোন একটী কলিকাতাস্থ যুবক, পূর্ব্ব অঞ্চলে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরিবার পরমাসুন্দরী. যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। যুবা যুবতীকে দেখিতে শ্বশুরালয়ে গেল। সাধ করিয়া উত্তম বস্ত্র, উত্তম অলঙ্কার, এসেন্স, ফিতে. চুলের কাঁটা মায় কলিকাতার চলন, সঙ্গে লইল। শ্বশুরগৃহে রজনীতে যখন লাবণ্যবতীপত্নী তাঁহার শয্যাগৃহে আসিল, তখন যুবা পূর্ব্বঅঞ্চলের উঁচু খোঁপা খুলিয়া, কেশ পৃষ্ঠে দড়ি করা ব্যাহর করিয়া ফিতা দিয়া স্বহস্তে কেশবিন্যাস করিয়া খোঁপায় কাঁটা কোঁপে দিয়া দিলেন; হস্তের শঙ্খ বলয় খুলিয়া সুন্দর বলয় পরাইয়া দিলেন; স্বহস্তে সুন্দর আভরণে ভূষিতা করিলেন, মোটা সাড়ী বদলাইয়া নূতন সৌখিন পরিচ্ছদে ভূষিতা করিলেন। একে সুন্দরী, সুন্দর বসন ভূষণে সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। পতির এই সকল চর্চ্চে সুন্দরী মোহিত। প্রাতঃকালে যুবতীর মাতা অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিয়া কন্যার শয়ন গৃহের দ্বারে উপস্থিতা। কলিকাতার জামাই না জানি কন্যার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, কন্যা শয়ন গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। কন্যার বেশ ভূষার পরিবর্ত্তন দেখিয়া মাতা চমৎকৃতা ও বজ্রাহতা; মাতা কন্যার গলা জড়াজড়ি করিয়া রোদন করিতে করিতে চীৎকার করিয়া উঠিল,—
"ওরে নটী সাজাইয়া দিছেরে, নটী সাজাইয়া দিছে!"

উপসংহারে আবেদন, স্বামীর সহিত আলাপে স্ত্রীর, স্পষ্টাক্ষরে বলিলে দোষ হয়, বেশ্যার ন্যায় আচরণ কর্ত্তব্য। ইহা হিন্দুশাস্ত্র, যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী শিক্ষিতা স্ত্রীকে ঘৃণা করেন। এই

শাস্ত্র অবহেলাই বঙ্গ যুবকবৃন্দের ব্যভিচারের কারণ। এই শাস্ত্র অবহেলনে শতশত বঙ্গযুবক, কুরূপা বেশ্যার লাঞ্ছনায় প্রেমজ্ঞানে আবদ্ধ। যদি কোন স্থানে ত্রুটি হইয়া থাকে, বিষয় বড় বৃহৎ—পাঠক মার্জ্জনা করিয়া উপদেশ দিবেন। আমরা বলিয়াছি আমরা শিক্ষার্থী, শিক্ষক নয়।

কলা-বিদ্যার বিপর্য্যয়।

(শ্রীমনোমোহন গোস্বামী লিখিত।)

"রঙ্গালয়ের অবনতি" "রঙ্গালয়ের অবনতি" বলিয়া এক সম্প্রদায়স্থ লোক প্রায়ই তারস্বরে চীৎকার করিয়া থাকেন এবং 'এডেন' কোন্ পথে না জানিয়াও বিলাতি রঙ্গালয়ের নামে সৃক্কনি-লেহন করিতে থাকেন। "নাটক" বা "অভিনয়" শব্দ উচ্চারিত হইলেই তাঁহারা লাফাইয়া উঠেন এবং নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া নিজেদের সুরুচি জাহির করিতে থাকেন। বিলাতি রঙ্গালয়ের সহিত যে আমাদের রঙ্গালয়ের তুলনা হয় না, একথা আমরা সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বিলাতি রঙ্গালয় কি একদিনেই এই উন্নতি-শীর্ষে আরোহণ করিয়াছে? তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যে রঙ্গালয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, রাজকীয়-দানে পরিপুষ্ট ও আমীর ওমরাহগণের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হইয়া যাহার কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, সমগ্র জাতি দ্বারা যে রঙ্গালয় সাদরে পালিত হইতেছে, তাহার সহিত মাত্র ত্রিশ বর্ষ বয়স্ক অর্দ্ধভোজী আমাদিগের শিশু রঙ্গালয়ের তুলনা চলে কি? বলদৃপ্ত, অভাবশূন্য, ধনী যুবকের সহিত, একটা অনশনক্লিষ্ট অনাদর পালিত শিশুর তুলনা কেহ কখন করিতে পারে কি?

আমাদিগের রঙ্গালয়ের অবনতি হইতেছে এ কথা আমি বলিতে পারি না, বরং যে উন্নতিই হইতেছে তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। তবে উন্নতির গতি শম্বুকের ন্যায় ধীর এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। আমার অভিজ্ঞতানুযায়ী তাহার কারণ বলিতে চেষ্টা করিব।

আপনাদের সহানুভূতির অভাবই বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের উন্নতির পথে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। উন্নতি অবরোধকারী যে কয়টী কারণ বর্ত্তমান আছে, সকলেরই মূলে আপনাদিগের অসহানুভূতি। অর্থকৃচ্ছ্রতাই বলুন, মূর্খতাই বলুন, আর আত্মম্ভরিতাই বলুন, সকলেরই জনক ঐ অসহানুভূতি। সাজসজ্জা, বেশভূষা, দৃশ্যপট, নৃত্যগীত, অভিনয় ও নাটকাদি সমস্তই বিদ্যা বুদ্ধি ও অর্থের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণের সহানুভূতি নাই বলিয়াই, রঙ্গালয়ে বিদ্যাবুদ্ধি ও অর্থের উন্নতি নাই এবং সেই কারণেই রঙ্গালয়ের প্রকৃত উন্নতির গতি এত মন্থর।

আপনারা আমাদিগকে গালি দিয়া গলা ভাঙ্গাইয়া ফেলেন, রঙ্গালয়ের সর্ব্বনাশ কামনা করতঃ কলম ভোঁতা করিয়া ফেলেন, ঘৃণায় কুঞ্চিত বদন বিভীষিকাময় করিয়া তোলেন, কিন্তু কখনও আমাদিগকে এতটুকু সহানুভূতি দেখাইয়াছেন কি? আমাদিগের দুঃখের অশ্রুর সহিত কখন এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়াছেন কি? রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে কখনও আপনাদের ওই বৃহৎ মস্তিষ্কে এতটুকু সহানুভূতি দেখাইয়াছেন কি? তবে করিয়াছেন কি জানেন—"Questionable characters" এর সহিত অনেকের প্রত্যক্ষে পরোক্ষে আমাদিগের অপেক্ষাও গূঢ়তর সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, আপনাদিগের নাসিকাকুঞ্চন কৃতবিদ্যযুবকগণকে রঙ্গালয় হইতে তফাৎ রাখিয়া, জ্ঞানালোক উদ্ভাবনের পক্ষে বিষম ব্যাঘাত প্রদান

করতঃ, রঙ্গালয়িক উন্নতির পথে কণ্টক রোপন করিয়াছেন। দেশহিতৈষী আপনারা, জাতির মস্তক আপনারা, বিদ্যাবুদ্ধির আধার আপনারা; কিরূপে ভুলিয়া যান যে Press, Platform, Stage জাতীয় জীবনের প্রধান অঙ্গ? প্রথম দুইটীর উন্নতিকল্পে যে প্রাণপাত চেষ্টা করেন, তৃতীয়টীর জন্য তাহার শতাংশের একাংশও কখন করিয়াছেন কি? জাতীয় রঙ্গালয় দেখিলেই যে জাতিটাকে বুঝিতে পারা যায় এ প্রবাদবাক্য কি কখন আপনাদের মনে উদিত হয় না? শুদ্ধ গালাগালি দিলে এবং নিন্দা করিলেই কি আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল? রঙ্গালয়ের পরিচালকগণ আপনাদিগের কথা শুনেন না বলিয়া আক্ষেপ করিলেই কি সুকৃতির একশেষ হইল? আপনারা কি জানেন না যে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সাধারণের ভৃত্য? আপনারা আমাদিগের কাণে ধরিয়া আপনাদিগের সঙ্গত হুকুম পালন করিতে আমাদিগকে বাধ্য করেন না কেন? আবার সময়ে সময়ে আদর করিয়া আমাদিগকে বুকে টানিয়া আমাদেরও অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না কেন? আপনারা আমাদিগের দোষ দেখাইতে পারেন না, গুণ বুঝিতে চাহেন না, নাটকের চর্চ্চা করেন না, কলাবিদ্যার ধার ধারেন না, সমালোচনা করিতেও জানেন না। আমাদিগকে শিক্ষা দিবেন না, আমাদিগের জন্য কোন উপকার করিবেন না, আমাদিগকে আদর করিবেন না, তবে শুদ্ধ করিবেন আমাদের ক্ষতি, দিবেন গালাগালি, আর দেখাইবেন ঘৃণা। এতে আপনারাই যে অবনতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছেন, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন কি? বিদ্যা বুদ্ধি ও অর্থের অভাবে আমাদিগের কোন্ কোন্ বিভাগ কিরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা আমি একে একে দেখাইব। দেখিবেন আপনারা যাহা দেখিতে জানেন না, যে ভ্রম আপনারা সংশোধন করিতে পারেন না, তাহা আমরা সমস্ত বুঝিতে

পারি। আপনারা এ সমস্ত ভ্রম যদি ধরিতে পারিতেন, বহুদিন পূর্ব্বে সে সমস্ত সংশোধিত হইত।

সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, নৃত্যগীত, অভিনয়, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় আমি একে একে আলোচনা করিব।

রঙ্গালয়ে প্রবেশ।

কোন আফিসে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে যেরূপ বহুদিন উমেদারি করিতে হয়, এ স্থলেও তদ্রূপ। রঙ্গালয় সংশ্লিষ্ট কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে না ধরিলে প্রায়ই লোকে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার পর তাহাকে কিছুকাল 'কাটাসৈন্যের' শিক্ষানবিশি করিতে হইবে এ কথা নিশ্চয়। শিক্ষানবিশগণ প্রায়ই নিম্নশ্রেণীস্থ একজন অভিনেতার অধীনে থাকে; সে মহাত্মা তাহাদিগের উপর যথাসম্ভব প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া নিজের ক্ষমতা দেখাইতে একটুও সঙ্কুচিত হন না। এ সব সহিয়া, ক্রমশঃ দলে ভিড়িয়া যিনি টেকিয়া যাইতে পারেন তিনি যদি উত্তমরূপে কর্ত্তৃপক্ষের মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, তবেই দু একটি ভূমিকা প্রাপ্ত হইবার আশা করিতে পারেন। পাঠক! তাই বলিয়া মনে করিবেন না যে এ বিষয়ে রঙ্গালয়ই একমাত্র দোষী।

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিতে আসে। (১) কতকগুলি "মায়ে তাড়ান বাপে খেদান" কুচরিত্র গণ্ডমূর্খ, রঙ্গভূমিকে ইয়ারকির কেন্দ্রভূমি মনে করিয়া আগমন করে এবং কিছু দিন পরে নিয়মের বাঁধাবাঁধি দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রস্থান করে। (২) আর কতকগুলি আছেন তাঁহারা আপনাদিগকে দিগ্‌গজ অভিনেতা বলিয়া মনে করেন এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আপনাদিগের কৃতিত্ব দেখাইয়া সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিবার প্রয়াস করেন। তাঁহাদের ভিতর কেহ বলেন "আমি নাড়াজোল থিয়েটারের manager," কেহ বলেন,

"আমি বাঁপড়দহে Heroর অংশ অভিনয় করিয়াছি," আবার কেহ সগর্ব্বে পরিচয় প্রদান করেন "আমি কাঁসারিহাটী ক্লবে Heroine এর অংশ একচেটিয়া করিয়াছিলাম।" এইরূপ "Hero, Heroine" এর দল যখন দেখেন যে সাধারণ রঙ্গালয়ের মূর্খ কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের অসাধারণ গুণপনা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, তাঁহাদিগকে সাধারণ ভূমিকাপ্রদান করে, তখন তাঁহারা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে নাট্যমন্দির হইতে চম্পট প্রদান করেন। (৩) আর কেহ কেহ কিঞ্চিৎ আয়ের জন্য রঙ্গালয়ের আশ্রয় গহণ করে, যেন রঙ্গালয়ের অর্থ কাংস নির্ম্মিত, রজতের নহে, তাই সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে কোনরূপ আয়াসের আবশ্যক করে না!

কলাবিদ্যা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে শতকরা একজনও রঙ্গালয়ে যোগদান করেন কি না সন্দেহ। কয়েকবার আমি কয়েকটি সদ্বংশজাত কৃতবিদ্য যুবককে রঙ্গালয়ে গ্রহণ করি এবং তাঁহাদিগকে উপযুক্ত ভূমিকা প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের একটু interest লইতে থাকি। কিন্তু তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞান এত অল্প যে তাঁহারা কোনরূপ সংবাদপ্রদান না করিয়াই অভিনয় রাত্রে মধ্যে মধ্যে অনুপস্থিত হইতে আরম্ভ করেন! তাঁহারা কিছুতেই বুঝিলেন না যে রঙ্গালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির punctuality ও regularity একান্ত আবশ্যক; গ্লানি যেখানে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে, সহস্র রসনায় ব্যাপ্ত হইবে, সে স্থলে অফিসের ন্যায় কল্যকার arear অদ্য make up করিবার নহে। অগত্যা তাঁহাদিগকে ভূমিকা হইতে বঞ্চিত করিতে হইল এবং তাঁহারাও বিদায় লাভ করিলেন।

শিক্ষা।

প্রকৃত শিক্ষাদান আমাদিগের রঙ্গালয়ে হয় না। তাই বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে শিক্ষকেরা অপটু বা অজ্ঞ। অবশ্য

মান্যবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি বা ৺অমৃতলাল মিত্রের ন্যায় শিক্ষক বিরল বটে, কিন্তু এখনও যে উত্তম শিক্ষক নাই এ কথা বলিতে পারি না। তবে পূর্ব্বে কলাবিদ্যার চর্চ্চা ছিল প্রাণের জিনিস, এখন সম্পূর্ণ অর্থকরী। পূর্ব্বে শিক্ষক প্রাণপাত করিয়া শিক্ষাদান করিতেন, শিক্ষার্থীও অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শিক্ষালাভ করিতে চেষ্টা করিত। এখন শিক্ষক বজায় করেন চাকরি, আর শিক্ষার্থীও শিক্ষার প্রার্থী নন, কারণ তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। পূর্ব্বে শিক্ষকগণের মধ্যে কেহ বা অংশীদার ছিলেন কেহ বা যথেষ্ট বেতন গ্রহণ করিতেন, কাজেই অর্থাগম ও সখ উভয়ের সংমিশ্রণে এবং শিক্ষার্থীগণের আগ্রহে, তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া পরিশ্রম করিতেন। এখনকার স্বল্প বেতনে শিক্ষকেরা, আগ্রহবর্জ্জিত শিক্ষালাভে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে লইয়া, অধিক পরিশ্রমের প্রবৃত্তি আসিবে কোথা হইতে?

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি, যে অভিনেতাগণের মধ্যে অধিকাংশই গণ্ডমূর্খ অথচ তাহারা আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত বলিয়া মনে করে। অনেকেরই কোন ভূমিকা উত্তমরূপে বুঝিবার বা তাহার সম্যক্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা নাই অথচ তাহা বুঝিতে চেষ্টাও করিবে না। কোনরূপে মুখস্থ করিয়া, হাত পা নাড়িয়া তোতা পাখীর ন্যায় বলিতে পারিলেই, সে আপন কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করে। তাহার উপর কোন উপায়ে যদি একবার দর্শকের করতালি লাভ করিতে পারে, তবে আর তাহাকে পায় কে?

মহলা দিবার সময় নিজেদের অংশ একবার কোন উপায়ে উদ্গীরণ করিয়া, অন্তরালে গমন পূর্ব্বক তাম্রকূট সেবনই ইহাঁদের জীবনের ব্রত। মহলার সময় প্রত্যেক অংশ মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলে যে অনেক শিক্ষা করা যায়, তাহা এই শ্রেণীর অভিনেতাগণ একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

দশ পনের বা বিশ ত্রিশ টাকার অভিনেতার নিকট ইহার অধিক আর কি আশা করিতে পারেন ? এই শ্রেণীর অভিনেতাগণ অনেকেই দিবাভাগে অন্যান্য কার্য্য করে এবং সেই কার্য্যকেই তাহারা জীবিকা বলিয়া মনে করিয়া থাকে, আর থিয়েটারটাকে একটা Souice of Supplementary income মনে করিয়া, কায়ক্লেশে মাত্র ছকুড়ি সাতের খেলা বজায় করে। তাহলেই দেখা যাইতেছে যে রঙ্গালয়ের মূর্খতার মূলে স্বল্প বেতন।

অভিনেত্রীর পক্ষেও তাই। সুন্দরী ও সুগায়িকা এবং উত্তম অভিনেত্রী নানারূপ লোকসান সহ্য করিয়া স্বল্প বেতনে অধিক দিন থাকিতে পারে না। সুযোগ পাইলেই প্রস্থান করে। তবে এ কথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে অভিনেতা অপেক্ষা অভিনেত্রীর শিক্ষা করিতে যত্ন ও আগ্রহ আছে, এবং তন্নিমিত্ত শিক্ষকও অভিনেত্রীবর্গের শিক্ষাদানে অধিকতর পরিশ্রম করিয়া থাকেন

যাঁহারা "বিলাতি রঙ্গালয়" "বিলাতি-রঙ্গালয়" বলিয়া চীৎকার করেন তাঁহারা জানেন কি যে সেখানকার সাধারণ অভিনেতা ও অভিনেত্রী অন্ততঃ পাঁচ সাত শত মুদ্রা বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ তাঁহারা চার পাঁচ সহস্র মুদ্রা পাইয়া থাকেন। তদুপরি কলাবিদ্যা সেখানে এ স্থানের মত ঘৃণার জিনিস নহে বরং বড় আদরের সামগ্রী। তবে বলুন দেখি সে স্থানের সদ্বংশজাত কৃতবিদ্য যুবক যুবতী কলাবিদ্যা প্রাণের সামগ্রী করিবে না কেন? সেই সাধনায় জীবনপাত করিবে না কেন ? আর এখানে অভিনেতাকে আপনারা পেট ভরিয়া খাইতে দিবেন না, আদর করিবেন না, সহানুভূতি দেখাইবেন না ; করিবেন ঘৃণা, দিবেন গালাগালি, আর তাহাদিগের নিকট আশা করিবেন, কলাবিদ্যার সুচারু চর্চ্চা ? ইহাকে ধৃষ্টতা না বলিয়া আর কি আখ্যা প্রদান করিব ?

স্বল্প বেতন ও সাধারণের ভ্রূকুটী সহ্য করিয়া, শিক্ষিত ও সদ্বংশজাত যুবক কি সহজে রঙ্গালয়ে যোগ দান করিতে পারে? যে কয়জন করিয়াছেন তাঁহারাই বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের যাহা কিছু উন্নতি সাধনও করিয়াছেন।

স্বল্প বেতনের জন্য আপনারা হয় ত রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকেই সম্পূর্ণ দোষী করিবেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় দোষী আপনারা। বিলাতে এক লণ্ডন সহরে প্রায় ৩০।৪০টী থিয়েটার আছে, তাহার প্রত্যেকটির দৈনিক আয় প্রায় দশহাজার টাকা, আর এখানে মাত্র চারিটি থিয়েটার তাহার প্রত্যেকের মাসিক আয় বড় জোর উহার অর্দ্ধেক! সেখানে প্রত্যহ অভিনয় হয়, এখানে সপ্তাহে তিন দিন মাত্র! এই কলিকাতা সহরেই যে বিলাতী থিয়েটার আছে, তাহার সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর মূল্য এক টাকা। সে শ্রেণীও আবার সম্ভ্রান্ত লোকদিগের জন্য নহে, Sailor Soldier প্রভৃতির জন্য। আর এখানে অধিকাংশ ভদ্র লোকই আট আনার আসন পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। তদুপরি ফ্রি পাসের ঠেলায় আমরা বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি। বিলাতে ফ্রিপাসে থিয়েটার দেখা বড়ই অপমানের কথা, কিন্তু এখানে সাঁসালো বন্ধুও তাঁহার দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি কুটুম্বের জন্য ফ্রি পাস লইতে সঙ্কোচিত হয়েন না। এটা যে ব্যবসায়ের স্থল সেটা ভদ্রলোকেরা একবার ভাবিতেও ভুলিয়া যান, এবং তাঁহারাই "দেশী রঙ্গালয় বড় জঘন্য, বিলাতীর মত নহে" বলিয়া সদম্ভে আস্ফালন করিতে একটুও লজ্জিত হয়েন না! এখন বলুন দেখি রঙ্গালয়ের উন্নতি হইবে কোথা হইতে?

পরিচ্ছদ।

সর্ব্বাপেক্ষা অসংলগ্নতা লক্ষিত হয় আমাদিগের রঙ্গালয়ের পরিচ্ছদে, আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই অসংলগ্নতাই দর্শকের প্রশংসাভাজন

হয়। সাধারণতঃ তিন প্রকারের পোষাক থিয়েটারে প্রচলিত ; যথা মিলিটারি, রয়েল মিলিটারি ও জোড়া এবং সখি-স্কার্ট, পেশোয়াজ-স্কার্ট ও সাড়ি ; শিরস্ত্রাণের মধ্যে পাগড়ি, মোড়েসা এবং কেশের মধ্যে বাবরি ও কারলিং। আবার সে সব পোষাকের ছাঁট—না হিন্দু, না মুসলমান, না পাঠান, না খ্রীষ্টান, না সিংহলী না চিনে। বাঙ্গালী হ'ক, বেহারী হ'ক, রাঠোর হ'ক, চৌহান হ'ক, জাঠ হ'ক শিখ হ'ক, মারহাট্টা হ'ক, মান্দ্রাজী হ'ক—সব এক পোষাক ; সেই ফুল ষ্টকিং, হাফপ্যাণ্ট, মিলিটারি কোট তাথ চুমকির কাজ, মাথায় বাবরি বা কারলিঙ তদুপরি পাগড়ি, গলায় মুক্তার মালা, কটিতে তরবারি ; বৃদ্ধ হইলে ফুলপ্যাণ্ট এবং জোড়া। আর মোগল হ'ক পাঠান হ'ক তুরকি আরবি হ'ক, পারসি হ'ক আফগান হ'ক সবই সেই শুদ্ধ মস্তকে পাগড়ির বদলে একটি মোড়েশা।

মন্ত্রী বা উজির হইলেই শাদা জোড়া ও শাদা মুখ, [illegible] হইলেই রাঁধুনী শাদা পোষাক এবং দূত বা সৈন্য হইলেই থাকি রং মাখা করা থাকে, তাহার কিছুতেই অন্যথা হইবার যো নাই। ফিমেলদের পক্ষে আরও চমৎকার ; হিন্দু হউক মুসলমান হউক সখী সাজিলেই তাহার পোষাক একপ্রকার, Heroine অন্যবিধ এবং বয়স্কা রাণী হইলেই তিনি বেনারসি বা পার্শী কাপড় (অবশ্য বাঙ্গালীর ন্যায়) পরিতে বাধ্য ; কাহারও সাধ্য কি যে হাতে প্রোগ্রেম না থাকিলে বলিতে পারে যে ইহারা কোন্ জাতি ?

(ক্রমশঃ)

নাট্য-কলা ও বাগীশ্বরী।

(শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

বীণাপাণি বাগীশ্বরী সরস্বতী—সকল কলারই জননী, সকল কলারই তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নাট্যকলা, নাট্যশালা এবং নাট্যাভিনয়ের সহিতও দেবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। দেবী সরস্বতী বাক্ বা বাক্যের ঈশ্বরী; তিনি নিজেই বাক্য নিজেই ভাষা, নিজেই বর্ণ-মাতৃকা। বিদ্যার বিপুল ক্ষেত্রে দেবী বাগীশ্বরী বাণীশ্বরী বাণী বলিয়া প্রসিদ্ধা; —নাটক ও নাট্যশালার অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেবী গীর্দ্দেবী ভারতী নামে আখ্যাতা। সঙ্গীত-শাস্ত্রে দেবীর নামে একটি সর্ব্ব-সুলক্ষণা রাগিণীর নামকরণ হইয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞেরা সেই বাগীশ্বরী (বাগেশ্রী) রাগিণীকে দেবীর অতি প্রিয় ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন বলিয়া গণনা করিয়াছেন।

পুরাণে দেবী সরস্বতী পরমাত্মার মুখোদ্ভূতা অথবা কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বরেই দেবী সরস্বতী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী ও কবিগণের ইষ্টদেবতা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই দেবীর সম্মানবৃদ্ধির জন্য মাঘী শুক্ল পঞ্চমীতে তাঁহার পূজা করিয়া বাক্যরাজ্যে অধিষ্ঠাপিত করেন। দেবী সরস্বতী বেদ-বিদ্যারও অধিষ্ঠাত্রী, তাই পরমাত্মা তাঁহাকে বেদপ্রকাশক ব্রহ্মার সহচারিণী শক্তিরূপে নিযুক্ত করিয়া দেন। দেবী বাগীশ্বরী নানারূপে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শক্তিরূপে সর্ব্বত্র সকল বিদ্যা ও সকল কলার অধিকারিণী ও দানকর্ত্রীরূপে চিরদিন ভারতে পূজিতা হইতেছেন।*

---

* সম্প্রতি গয়ার বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের সান্নিধ্যে দেবী সরস্বতীর চতুর্ভুজা, বীণাপুস্তক-হস্তা, স্মিতবদনা এক প্রস্তর প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক এই

উত্তর ভারতে দেবী বিষ্ণুশক্তি, ব্রহ্মশক্তি এবং ব্রহ্মার কন্যারূপে নানাভাবে পূজিতা হন, কিন্তু দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্র দেশে দেবী গণেশের পত্নী বা গণেশের অনুচরী রূপে পূজিতা হন। সে দেশে বিবাহের সময়ে স্বামীর নামে নাম মিলাইয়া বধূর এক নূতন নামকরণ করিবার প্রথা বর্ত্তমান আছে। এই প্রথানুসারে 'রাম' ও 'কৃষ্ণ'নামযুক্ত বরের বধূনাম 'সীতা' ও 'রাধা' হয়, সেইরূপ বরের নাম 'গণেশ' হইলে বধূরনাম 'সরস্বতী' রাখা হয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে যখন বোম্বাই প্রদেশে শাস্ত্রীয় প্রথায় নাট্যাভিনয় চলিতেছিল, তখন অভিনয়ের প্রারম্ভে রঙ্গমঞ্চে প্রেক্ষাগার সমক্ষে বিঘ্নাপহর্ত্তা বিঘ্নবিনাশন গণেশদেব আমন্ত্রিত করা হইত এবং সূত্রধার তাঁহারই আদেশে রঙ্গ-পরিচালনা জন্য দেবী সরস্বতীকে আবাহন করিতেন। দেবী শিখীবাহনে বিচিত্রবসনে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হইতেন এবং গণেশের সম্মুখে নৃত্যগীতাদি করিয়া রঙ্গের উদ্বোধন করিতেন। অবশেষে দেবী সূত্রধরকে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিতেন। সূত্রধার নটনটীর সুস্বর সুশ্রাব্য বাক্যস্ফূর্ত্তি প্রার্থনা করিতেন। দেবী তাহাদিগকে বৃহস্পতি তুল্য বাণীশুদ্ধি ও নিজের ন্যায় গীতশুদ্ধির বরদান করিয়া অন্তর্হিত হইতেন। বোম্বাইএ এইরূপে নাট্যারম্ভপ্রথা আবহমান কাল প্রচলিত ছিল। কেহ ইহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন কখনও করে নাই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে একবার পুণার এক নাট্যসম্প্রদায় এই দীর্ঘ প্রবন্ধ ত্যাগ করিয়া একমাত্র

নবাবিষ্কৃত প্রাচীন প্রতিমার নামকরণ করিয়াছেন,—The Goddess of Learning. এই প্রতিমা বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমন্দির নির্ম্মাণের সমকালে উৎকীর্ণ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন। গয়ায় দেবী বাগীশ্বরী নামেই প্রসিদ্ধা। ইহা অপেক্ষা দেবীর প্রাচীন প্রতিমা এ পর্য্যন্ত আর কোথায়ও আবিষ্কৃত হয় নাই। স্থানান্তরে এই প্রাচীন প্রতিমার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল।

বিষ্ণু আবাহন দ্বারা মুখবন্ধ শেষ করিয়া পইয়া নাট্য আরম্ভ করে; আশ্চর্য্য এই,—সেই রাত্রিতে পুলিসের সঙ্গে নাট্যসম্প্রদায়ের কোন সূত্রে গণ্ডগোল ঘটে এবং অভিনয় কার্য্য ঘণ্টাধিক কাল বন্ধ হইয়া থাকে। তখন প্রত্যেকেই চিরাগত প্রথা পরিবর্ত্তনের জন্যই যে এই বিঘ্ন ঘটিয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন কিন্তু গত ২৫ বৎসরের মধ্যে বোম্বাইএর নাট্যশালা হইতে এ সকল শাস্ত্রীয় নীতি, চিরাগতপ্রথা বিসর্জ্জিত হইয়া অধুনা ইংরাজী প্রথায় অভিনয় চলিতেছে।

বোম্বাই প্রদেশে দেবী সরস্বতী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বিবাহ উৎসবে বিশেষরূপে পূজিতা হন। প্রজাপতি ব্রহ্মার শক্তি বা কন্যারূপে যে তিনি ঐ দেশে এত পূজা পাইয়া থাকেন, তাহা নহে। তাঁহা হইতেই পঞ্চভূতের উৎপত্তি, তাঁহা হইতে চরাচর বিশ্বের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং তিনি বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং নারী জাতির সর্ব্বপ্রধান গৌরবের বস্তু সতীত্বের রক্ষাকর্ত্রী এই জন্য বিবাহ-কালে তাঁহার বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। এই ভাবের মন্ত্র ও স্তোত্রও সে দেশে পঠিত হয়।

শারদীয় নবরাত্রির সময়ে বোম্বাই প্রদেশে দেবী সরস্বতী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হন। ঐ দিন বেদীর উপর প্রতি পরিবারের দলীলাদি এবং লেখন পঠনের উপকরণাদি সাজাইয়া পূজা করা হয়। এ দেশের ন্যায় ঐ দিন অনধ্যায় হইয়া থাকে কিন্তু আচারগত প্রথায় ঐ দিন নূতন দলীলাদি লেখাপড়া করা বড় শুভ জনক বলিয়া সকলেই তাহা করিয়া থাকে। এই দিন বালকগণের বিদ্যারম্ভ হয়।

শ্রীপঞ্চমীর দিন বোম্বাইপ্রদেশে দেশীয় রাজন্যবর্গ এক একটি দরবার করেন। সেখানে কুঙ্কুম গুলিয়া সর্দারদিগের বস্ত্রে ছিটাইয়া দেওয়া হয়, তৎপরে আ গুলাব ও পান বিতরণ করা হয়।

মহারাষ্ট্রীয়েরা বালকদিগকে ঐ দিন নববস্ত্র ক্রয় করিয়া দেন। তাহারাও ঐ দিন কুঙ্কুমে বর্ণ রঞ্জিত করিয়া পরিধান করে। যে সপ্ত পবিত্রা নদীর নাম স্মরণে কূপতড়াগাদির জলও পবিত্র হয়, সেই সপ্ত পবিত্রা নদীর মধ্যে এক নদীর নাম সরস্বতী। পুরাণ মতে দেবী সরস্বতীই নদীরূপে জলরূপা হইয়া সরস্বতী নদী মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে বর্ত্তমানা। এই নদীতীরেই ব্রহ্মর্ষি দেশে সর্ব্বপ্রথম আর্য্য-নিবাস প্রতিষ্ঠিত ও বেদগান ধ্বনিত হইয়াছিল। বেদস্রষ্টা চতুর্ম্মুখের শক্তি দেবী সরস্বতীর জলময়ী মূর্ত্তি-তীরেই প্রথম বেদধ্বনি গীত হয়। এই নদীরূপা সরস্বতী গঙ্গা ও যমুনার সহিত মিলিত হইয়া তীর্থরাজ প্রয়াগের সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাহা হউক, বাগীশ্বরী সরস্বতীর সহিত নাট্যকলার, সঙ্গীতের, সাহিত্যের, শিল্পের এমনকি সকল বিদ্যার মূল বেদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা আজিও ভারতের সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ আছে। ওঁ ঐঁ বাগ্‌দেবতায়ৈ সরস্বত্যৈ নমঃ—এ হেন মহিমময়ী বাগ্‌দেবী সরস্বতীকে নমস্কার।

বিলাতি রঙ্গিণী।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ম্যাডাম রোসিনী ইতিমধ্যে গোপনে মিঃ স্মিথকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল এবং গোপনে তাহার প্রত্যুত্তরও পাইয়াছিল। ঠিক রাত্রি দশটার সময় একটী সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে আলোকাদি প্রজ্জলিত করিয়া এবং নানা প্রকার সুখসেব্য আহার্য্য দ্রব্যাদি রাখিয়া--রোসিণী মেরিয়াসকে একখানি পালঙ্কে উপবেশন করাইল। মেরিয়াস কলের পুত্তলিকার ন্যায় রোসিনীর আদেশমত কার্য্য করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ফটকে একখানি বড় জুড়ীগাড়ী উপস্থিত হইল। গাড়ী আসার শব্দ শুনিয়া রোসিনী মেরিয়াসকে স্নেহসূচকস্বরে বলিল---"ঐ আমার ভাই এসেছেন। বাছা মেরিয়াস! আজ তোমার সঙ্গে একজন বড় লোক—ভদ্রলোক—বিদ্বান লোকের আলাপ করিয়ে দেবো—যার দ্বারায় তোমার খুব ভা.. হবে!"

"মা! আমার আর কে কি ভাল ক'র্ব্বে? আপনি যা করেছেন তাই আমার খুব ভাল—"

"চুপ্ কর—চুপ্—কর! ঐ তিনি এসেছেন।"

রোসিনীর কথা শেষ হইবা মাত্রই মিঃ স্মিথ মিস্ ওয়ারেন নাম্নী যুবতীর সহিত সেই কক্ষে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই রোসিনী তাড়াতাড়ী তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার হাত

ধরিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক একখানি পালঙ্কে উপবেশন করাইল।

মিঃ স্মিথ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন---"সব খবর ভাল?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি একেবারে তাঁহার দৃষ্টি লজ্জাবনতমুখী সঙ্কুচিতা মেরিয়াসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মিঃ স্মিথের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। কেশে ও গুম্ফে কলপ মাখানো বলিয়া মনে হয়। দীর্ঘ দেহযষ্টি প্রশস্তে কিঞ্চিৎ ন্যূন। পোষাক পরিচ্ছদ মূল্যবান হইলেও তেমন জাঁকজমকের নয়; হস্তে হীরকাঙ্গুরীয়ের খুব চাকচিক্য।

ম্যাডাম রোসিনী মেরিয়াসের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া মিঃ স্মিথকে বলিল—"ভাই স্মিথ! ঐ যুবতীর নাম মেরিয়াস্---যার কথা তোমাকে বলেছিলেম।"

মিঃ স্মিথ হাসিয়া বলিলেন—"বটে! বটে। বড় সুখী হলেম---বড় আনন্দিত হলেম! কি নাম বল্লে?"

"মেরিয়াস লিভিংষ্টোন্! বড় শান্ত মেয়ে-" বলিয়া রোসিনী মেরিয়াসের নিকট গিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিল।

"বেশ---বেশ---বড় খুসী হয়েছি! চেহারা দেখে প্রাণে বড় আরাম পাচ্ছি তা- অতদূরে বসেছেন কেন? তা,- আমিই না হয় ওঁর কাছে গিয়ে বস্‌ছি,---তাতেই বা কি ক্ষতি?" এই বলিয়া মিঃ স্মিথ মেরিয়াসের পালঙ্কে তাহার পাশে গিয়া বসিলেন। মেরিয়াস আরও সঙ্কুচিতা হইয়া একটু সরিয়া বসিল। মিঃ স্মিথ বলিলেন—"তাহ'লে এস---সকলে মিলে একত্রে আহারাদি করে একটু আনন্দ করা যাক্। দেখ্‌ছিতো—রোসিনী খুব উদ্যোগ আয়োজন করেছে। বাঃ—বাঃ—বড় আনন্দ—বড় মজা হবে কিন্তু! আঃ—আমি আজ সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেছি।"

মিঃ স্মিথের কথামত রোসিনী, মেরিয়াস ও স্মিথকে লইয়া একত্রে আহার করিতে বসিলেন। রোসিনী খুব তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিল। মেরিয়াস লজ্জায় এবং ভয়ে কিছুই খাইল না এবং মিঃ স্মিথ সামান্য কিছু আস্বাদন করিয়া প্রাণভরিয়া খুব মদ্যপান করিয়া লইলেন।

এমন সময় মিস্ ওয়ারেন সেই কক্ষে আসিয়া রোসিনীকে বলিল—"মা তোমাকে একবার বাহিরে আসিতে হইবে—একটি ভদ্রলোক বিশেষ কার্য্যের জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন।"

ম্যাডাম রোসিনী যেন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—"আঃ এত রাত্রে আবার কে ডাকে? কি জ্বালা গা! তা যাই একবার, দেখে আসি। তা ভাই স্মিথ্! আমাকে মাপ কর—আমি মিনিট কতকের জন্যে একবার বাহিরে যাই—এক্ষুনি আবার আসছি।

মিঃ স্মিথ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বলিলেন "তা কি হয়েছে? যাওনা, কাজ আছে তোমার—তোমাকে আমি বাধা দোবো কেন? আগে কাজ, তারপর আমোদ। তুমি যাও যাও এক্ষুনি যাও—"

রোসিনী যেমন বাহিরে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মেরিয়াসও কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া রোসিনী হাত দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া কেদারায় বসাইয়া বলিল—"তুমি কোথা যাবে বাছা! তুমি মিঃ স্মিথের কাছে বসে ওঁকে তোমার সমস্ত কাহিনী বলতে আরম্ভ কর। উনি তোমার কাছে তোমার মুখে সমস্ত সঠিক শুনে—তবেতো তার ব্যবস্থা কর্বেন! বোসো বোসো—তুমি বোসো।"

"না না—আমি বাহিরে যাব—" বলিয়া মেরিয়াস রোসিনীর প্রস্তাবে অসম্মতিজ্ঞাপন করিল। কিন্তু রোসিনীর ভ্রূকুটি-কুটিল-কটাক্ষে নির্ম্মলহৃদয়া সরলা বালিকা বিশেষ ভীতা হইয়া পুনরায় নিজস্থানে

বসিতে অগত্যা বাধ্য হইল। পরমুহূর্ত্তেই রোসিনী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই মেরিয়াস দেখিল সেই কক্ষমধ্যে মিঃ স্মিথ আর সে ভিন্ন অন্য কেহই নাই।

মিঃ স্মিথ এতক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া সহাস্য বদনে মেরিয়াস এবং রোসিনীর ব্যাপার দেখিতেছিলেন। রোসিনী বিদায় হইলে পর, তিনি একপাত্র সুরা ঢালিয়া নিজে গলাধঃকরণ করিলেন এবং আর এক পাত্রে মেরিয়াসের জন্য ঢালিয়া বলিলেন—"প্রিয়তমে! তুমি কি চাও আমাকে ব'লবে না? বল বল তোমার সুধামাখা কথা শুন্‌তে আমি বড় ভালবাসি! আহা—তোমার কি চমৎকার মুখখানি! দেখেই আমি একেবারে মরে গেছি! রোসিনী খুব বাহাদুর মেয়েমানুষ, খুঁজে খুঁজে তোমাকে খুব বা'র করেছে-হ্যাঁ! তা তা তোমার কি বল্‌বার আছে বল। আমার মনে হ'চ্ছে রোসিনী যেন ব'লছিল তোমার বাপ মা আছে—"

"না মশাই এ সংসারে ম্যাডাম রোসিনী ভিন্ন আমার আর কেউ আপনার লোক নেই!"

"কেন—আমি আছি। আমি তোমার খুব আপনার—খুব প্রাণের লোক আছি। তা বল্‌ছিলুম কি তোমার এমন দশা কেন হ'ল? বোধহয় কিছু প্রেমের ব্যাপার—"

স্মিথের কথায় বাধা দিয়া ভ্রূকুটী করিয়া মেরিয়াস বলিল—"কি ব'লছেন?"

"বল্‌ছি কি—যে বোধ হয় কিছু প্রণয়ঘটিত ব্যাপার হ'য়েছিল—কি বল?"

"আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পাচ্ছি না মশাই!"

"আর বোঝাবুঝির আবশ্যক কি? ও সব পরের কথায় এখন আর আমারই বা আবশ্যক কি—তোমারই বা লাভ কি? এখন

তোমার আমার প্রেমের পালা! তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় খুব ভালবাসি! হা হা হা কি বল! ভালবাসবে না? কেন—আমি তো মন্দ লোক নই। তোমার গোলাম হয়ে থাকব—তুমি যা বলবে তাই করব -নাও—এস কাছে এস—একটু পান কর—" এই বলিয়া মিঃ স্মিথ কেদারায় বসিয়াই সুরাপানে মত্তাবস্থায় নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন।

মেরিয়াসের স্থিরদৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত ছিল। অসহায়া রমণী তখন মনে মনে কেবল ভাবিতেছিল কি উপায়ে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাই।—এ উন্মত্তের নিকট একাকিনী অবস্থান করা কোন মতে যুক্তি সঙ্গত নয়।" কিছুক্ষণ পরে প্রকাশ্যে স্মিথকে বলিল "যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে আমি একবার ম্যাডাম রোসিনার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি—" বলিয়াই মেরিয়াস কেদারা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"না না না—তা হবে না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না" বলিয়া মিঃ স্মিথও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কেদারা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। "তোমার যাবার কোনও দরকার নেই। আমি রোসিনীর সঙ্গে সকল বিষয় বন্দোবস্ত করে নেবো। আমি যা ব'লবো সে তাতেই রাজী হবে—তার কিছুতেই আপত্তি থাকতে পারে না। তোমার তার সঙ্গে কোনও পরামর্শ ক'রতে হবে না। সে সব পরামর্শ বহুকাল স্থির হয়ে গেছে—বুঝলে?"

"কি স্থির হ'য়ে গেছে মশাই?" মেরিয়াস সভয়ে কম্পিতকণ্ঠে এই কথাটী জিজ্ঞাসা করিল। স্মিথের পানে একবার চাহিয়া দেখিল তিনি দস্তুর মতন মাতাল হইয়াছেন, স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া অভাগিনীর হৃদয় শুকাইয়া গেল। "কি স্থির হ'য়ে গেছে তা তুমি জান না? জান না? এই এই—তা

তুমি সবই জান - কেমন!" এই বলিয়া মিঃ স্মিথ বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন। মেরিয়াস বলিল "ঈশ্বরের শপথ বল্‌ছি মশাই আমি কিছু জানি না, আমাকে মাপ করুন—"

"মাপ কি? হা হা হা হা! আমিও ঈশ্বর শপথ বল্‌ছি, আমি এমন মন মজানো চেহারা কখনো দেখিনি সুন্দরী! আহা—যেন টাট্‌কা ফোটা শিশিরে ধোয়া একটী প্রাণ মাতানো গোলাপ ফুল! প্রাণেশ্বরী, হৃদয়েশ্বরী—তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি; তোমার জন্যে আমি একেবারে ম'র্ত্তে বসেছি। তুমি হুকুম কল্লে আমি লাফিয়ে গিয়ে আকাশের চাঁদটাকে পর্য্যন্ত ধরে এনে তোমাকে দিতে পারি। আ মরি মরি—কি মিষ্টি কথা! দেখ প্রিয়তমে আমি জীবনে কখনো কাকেও ভালবাসিনি—কিম্বা ভালবাসবো না! এই যা তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি—" এই বলিয়া মেরিয়াসকে ধরিবার জন্য তাহার দিকে মিঃ স্মিথ টলিতে টলিতে অগ্রসর হইলেন। মেরিয়াস তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। মিঃ স্মিথ কক্ষের দ্বার এবং মেরিয়াসের মধ্যস্থলে দাড়াইয়া টলিতে লাগিলেন।

মেরিয়াস বলিল—"না না—দোহাই বল্‌ছি—আমাকে অভয় দিন। কেন আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার ক'চ্ছেন? আপনি ভদ্রলোক—"

"শুধু ভদ্রলোক? আমি বড়লোক—মস্ত লোক! এর চেয়েও আমি লক্ষগুণে বড় লোক হ'লেও তোমার গোলামের গোলামেরও যোগ্য নই। প্রাণেশ্বরী! তুমি নিশ্চয়ই আমার হবে—হ'তেই হবে—" এই বলিয়া মিঃ স্মিথ একেবারে রোসিনীর কাছে গিয়া তাহার কোমল হস্তখানি ধারণ করিলেন। জালনিবদ্ধা বিহঙ্গিনী অবলা মেরিয়াস তখন প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর—"

"আঃ—কি কর! জানালা খোলা রয়েছে—রাস্তার ধারে চেঁচাও কেন? এ তোমার বড় নষ্টামি ছিঃ! এখুনি রাস্তার লোক জন জান্‌তে পারবে—"

তবুও মেরিয়াস চীৎকার করিতে লাগিল—"রক্ষা কর রক্ষা কর—"

চীৎকার শুনিয়া ম্যাডাম রোসিনী কক্ষের ভিতর তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া মেরিয়াসের হাত ধরিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক জানালার নিকট হইতে সরাইয়া দিল এবং জানালাটী নিজে বন্ধ করিল। রোসিনী বলিল—"তুমি কি পাগল হয়েছে বাছা। এ রকম চেঁচামিচি ক'রলে আমার বাড়ীর একটা কলঙ্ক হবে তা জান?"

রোসিনী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করাতে মেরিয়াস কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল "আঃ বাচলুম মা তুমি এসেছ! এ লোক কেমন তা কি তুমি আগে জান্‌তে না মা? এঁর স্বভাব চরিত্র বড় মন্দ—"

"চুপ্ চুপ্" বলিয়া রোসিনী মেরিয়সকে ওসকল কথা কহিতে নিষেধ করিল। কিন্তু মেরিয়াস নিষেধ মানিল না; সে বলিতে লাগিল—"অতি ভয়ানক প্রকৃতির লোক; আমি প্রথমে দেখেই একটু সন্দেহ করেছিলেম। এখন বুঝছি এঁর সঙ্গে কথা কওয়া, এঁর কথায় কর্ণপাত করা, এঁর মুখ দর্শন করা পর্য্যন্ত মহাপাপ। হাঁ। মা! তুমি কি এই জন্যে আমাকে তোমার বাটীতে আশ্রয় দিয়েছিলে? এই জন্যে কি আমাকে মেয়ের মতন যত্ন করেছিলে? এমন আদর যত্ন আশ্রয়ের চেয়ে পথের গাছতলা সহস্রগুণে ভাল। আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে বেড়াব—অনাহারে পথে মরে পড়ে থাক্‌ব—শৃগাল কুকুরের সঙ্গে একত্রে আহার ক'র্ব্ব—এক বস্ত্রে সারা জীবন কাটাব—সেও বরং মঙ্গল, তবু এ পাপস্থানে আর কখনো থাক্‌ব না। জগদীশ্বর দুঃখিনীকে রক্ষা কর্ব্বেন। পৃথিবীতে কি সত্য সত্যই কেউ ভাল লোক নেই যিনি আমাকে দয়া কর্ত্তে পারেন?"

মেরিয়াসের কথা শুনিয়া উন্মত্ত স্মিথ তাহার পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া বলিলেন—"আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার পায়ে এনে দিচ্ছি —সুন্দরী, আমার প্রতি নিদয় হোয়ো না।"

অতি ঘৃণাভরে মেরিয়াস বলিল—"আমি আপনাকে যেমন আন্তরিক ঘৃণা করি, আপনার ঐশ্বর্য্য ধন রত্নকে সেইরূপ ঘৃণা করি জানবেন।"

ম্যাডাম রোসিনী বিষম ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল,—"চুপ্ কর বলছি মেরিয়াস! বড় বাড়াবাড়ি ক'চ্ছো দেখছি!" পরে অতি সমাদরে মিঃ স্মিথকে হাতে ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইয়া কেদারায় উপবেশন করাইয়া বলিল "ভাই স্মিথ! কিছু মনে কোরোনা; উঠে ভাল হয়ে বোসো। একেবারে তুমি বড় বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছ। প্রথম দিন কি অতদূর ভাল? একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছেলেমানুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মিষ্টি কথা ক'য়ে আদর যত্ন ক'রে তবে না আপনার ক'রে নিতে হয়।"

মিঃ স্মিথ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ আমার একটু দোষ হ'য়ে গিয়েছিল বটে! তা বটে তা বটে বালিকা বই ত নয়—"

এমন সময় মিস্ ওয়ারেন আসিয়া তাড়াতাড়ি রোসিনীকে বলিল— "মা কে একটা ভদ্রলোক এসে মিস্ মেরিয়াস লিভিংষ্টোনকে খুঁজছে।"

মেরিয়াস বলিল "আমাকে?"

রোসিনী বলিল "না না তোমাকে না।"

মিঃ স্মিথ বলিলেন "যাও তাকে তাড়িয়ে দাও।"

"তাড়িয়ে দোবো কি?" মিস্ ওয়ারেন বলিল "সে বলে যে নিশ্চয়ই সে মেরিয়াসের সঙ্গে দেখা ক'র্ব্বে! দেখা না করে কিছুতেই এ বাড়ী থেকে যাবে না। সে আরও ব'ল্লে মেরিয়াস্ জানলা থেকে তাকে ডেকেছে—মেরিয়াসের সঙ্গে তার খুব জানা শুনো আছে—"

এই সময় নীচের তলার একটা গোলমাল উঠিল। মিস ওয়ারেণ তাড়াতাড়ী সেই কক্ষের একটা গুপ্ত দ্বার খুলিয়া ফেলিল এবং রোসিনী মেরিয়াসকে টানিয়া লইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল। ওয়ারেণও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভিতরে গিয়া রোসিনী, অর্দ্ধ অচৈতন্যা অভাগিনী মেরিয়াসকে একটা বেঞ্চিতে বলপূর্ব্বক শয়ন করাইয়া দন্তে দন্তে পেষণ করিয়া বলিল 'বাধ্ বেটীকে বেশ ক'রে এই বেঞ্চিতে বেঁধে রাখ্। বেটীর এইবার বদমাইসির দৌড় দেখে নিচ্ছি।" এই বলিতে বলিতে প্রথমে একখানি রুমাল দিয়ে মেরিয়াসের মুখটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং আর একখানা রুমালের দ্বারা তাহার হাত দুটী পশ্চাদ্ভাগে বাঁধিয়া তাহাকে নড়নচড়ন রহিত করিয়া দিল। বন্ধন কার্য্য শেষ হইলে বলিতে লাগিল "এইবার কেমন জব্দ! এখন চেঁচাও, ছুটে বেরিয়ে যাও -" এই বলিয়া সেই কোমল গণ্ডে একটী মুষ্ট্যাঘাত করিয়া হতভাগিনীকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ফেলিল। মেরিয়াসকে তদবস্থায় রাখিয়া রোসিনী ওয়ারেণকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং পুনরায় সেই সজ্জিত কক্ষে মিঃ স্মিথের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ স্মিথ তখন জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং একমনে কত কি চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া, রয়েল ভিক্টোরিয়া থিয়েটারের অভিনেতা জর্জ্জ ভিল্লিয়ার্স তাঁহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভিল্লিয়ার্স কক্ষে প্রবেশ করিয়াই নম্রভাবে বলিল—"আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। অনুমতি না নিয়ে এখানে প্রবেশ করেছি। এই ঘরের জানলায় কে একটা যুবতী চীৎকার করিলেন না? তাঁর কণ্ঠস্বর আমার খুব পরিচিত, আর আমি যেন চকিতে তাঁকে লক্ষ্য করেছি। যুবতীটীকে আমি চিনি,—আমি নীচে থেকে তাঁকে দেখলুম আর তাঁর কথা শুনে বুঝলুম যে তিনি যেন সাহায্যের

জন্য কাকে ডাকছিলেন। আমি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে চাই।"

স্মিথ বিষম রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—"আপনি জানেন মশাই যে এ ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করাটা আপনার দস্তুর মতন অন্যায় কাজ হয়েছে! এ রকম অনধিকার প্রবেশ করাই মার্জ্জনা করা যায় না?"

রোসিনী বলিল "আপনি কি এমন মাতব্বর লোক—কে আপনি—যে হঠাৎ একটা ভদ্রলোকের বাড়ীতে না বলে কয়ে একেবারে জোর করে প্রবেশ করেন?"

"আমি কে তা জেনে আপনাদের কোনও লাভ নেই। আমি রাস্তা থেকে শুনলুম একজন রমণী সাহায্যের জন্যে চীৎকার কচ্ছে—আমি মনে করলুম বুঝি কোন বিপদে পড়ে থাকবে—তাই তাকে সাহায্য করবার জন্যে নিজের ইচ্ছায় এসেছি।"

ম্যাডাম রোসিনী বলিল—"ওয়ারেণ! একটা পাহারাওয়ালা ডাকতো!"

ওয়ারেন বলিল—"দেখ মা ভদ্রলোকের বিশেষ কোনও দোষ নাই, উনি ভুল বুঝে এখানে এসে পড়েছেন। ওঁকে ওঁর ভুলটা বুঝিয়ে দিলেই—উনি নিজেই দোষ স্বীকার ক'রে মার্জ্জনা চেয়ে চলে যাবেন।"

এই বলিয়া জর্জ্জ ভিল্লিয়াসের দিকে চাহিয়া মিস্ ওয়ারেন বলিতে লাগিলেন—"মশাই! আপনি রমণীকণ্ঠে সাহায্যের জন্য চীৎকার শুনেছিলেন সত্য বটে—কিন্তু যে স্ত্রীলোককে আপনার পরিচিত মনে করে আপনি এখানে এসে খুঁজছেন সে স্ত্রীলোক এখানে নেই। আমিই সেই স্ত্রীলোক—যে জানলার ধারে দাড়িয়ে "রক্ষা কর রক্ষা কর" বলে চীৎকার কাচ্ছল। আমরা তিনজনে খেলা কর্ত্তে কর্ত্তে আনন্দে মত্ত হয়েছিলাম। আমার এই ভাই আমার হাত থেকে খেলার ছলে একটা আংটী খুলে নিয়েছিলেন—সেটি ফিরিয়ে নেবার জন্যে আমি

ঐ রকম চীৎকার করছিলুম। এখন বুঝলেন এর সঙ্গে আপনার কোনও সংস্রব নেই!"

জর্জ্জ ভিল্লিয়ার্স আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"সেকি? তুমি চীৎকার করছিলে?"

"তবে কি আমি মিথ্যে কথা বলছি? এই দেখুন আমার ভায়ের হাতে এখনও ঐ আংটী রয়েছে—ওটী আমার আংটী উনি কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে পরেছেন—"

মিঃ স্মিথ গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন—"এতো বড় বিপদের কথা যে নিজের বাড়ীতে নিজের ঘরে বসে আমোদ কর্ত্তে পাবনা! আমরা আমোদ কর্ব্ব আর রাস্তার লোকে ছুটে এসে আমাদের আমোদে বাধা দেবে!"

জর্জ্জ ভিল্লিয়ার্স সত্য সত্যই অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—"মশাই! আমার সত্যই অন্যায় হয়েছে; আমি আপনাদের সকলের কাছে মার্জ্জনা চাইছি। কিছু মনে করবেন না। এই, আমার কার্ড দিচ্চি এতে আমার পরিচয় পাবেন। আমি বিদায় হই আমার প্রতি রাগ কর্ব্বেন না।" এই বলিয়া রোসিনীর হাতে একখানি কার্ড দিয়া জর্জ্জ ভিল্লিয়ার্স বিদায় হইলেন।

"মিঃ জর্জ্জ ভিল্লিয়ার্স—"কার্ডে লেখা। রোসিনী তাহার নাম পড়িয়া বলিল—"কে এ লোকটা! দেখে বোধ হয় একজন অভি-নেতা। যাক্ আপদটা চলে গেছে। ওয়ারেন খুব বুদ্ধি খরচ করেছে বটে! তা বলছিলুম কি মিঃ স্মিথ! তুমি তাড়াতাড়ি করে সব গোলমাল করে ফেলেছ! আমি তোমাকে গোড়ায় বার বার বলে-ছিলুম যে স্ত্রীলোকটী এখনও নূতন!"

মিঃ স্মিথ অন্য কোন কথা না বলিয়া ম্যাডাম রোসিনীকে একপার্শ্বে লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"সুন্দরীকে আমার নিশ্চয়ই চাই!

যত টাকা লাগে আমি ওর জন্য খরচ কর্ব্ব! আমি সর্ব্বস্বান্ত হই তাতেও গ্রাহ্য করি না কিন্তু ওকে আমার চাই! বুঝলে! আমি এখন চল্লুম!"

(ক্রমশঃ)

দাসীর দরখাস্ত।

মানাবর

শ্রীযুক্ত নাট্যমন্দির-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

মহাশয়,

সে দিন পথে যাইতে যাইতে একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক হঠাৎ এক খানি দরখাস্ত আমার হস্তে দিয়া প্রস্থান করিল। স্ত্রীলোকটীকে কিছুই জানি না—সে কেবলমাত্র এই বলিয়া গেল—"থিয়েটারের ম্যানেজার মশাইকে এখানি পড়াইবেন।" আমি প্রথমত একটু থতমত খাইয়া গেলাম, কারণ বুঝিলাম না যে কোন্ থিয়েটারের ম্যানেজারের কথা বললে। দরখাস্তখানি খামে আঁটা ছিল না, সুতরাং হস্তগত হওয়াতে না পড়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলাম না। পাঠ করিয়া ব্যাপার বড় গুরুতর বুঝিলাম এবং আপনাকে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হইল; ভাল মন্দ আপনি যাহা বুঝিবেন করিবেন। নিবেদন ইতি।

বশংবদ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(সঠিক অনুকরণ)

পরম পূজনীয়

শ্রীলশ্রীযুক্ত থিয়েটারের ম্যানেজার মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু

হে নরনারী চরিত্রাভিনয়কার্য্যকারী—প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে লোকের দোষগুণ স্পষ্ট বর্ণনাকারী মহাশয়!—

আমরা বড় দুঃখে আজ আপনার নিকট কোনও রকম উপায়ে এই দরখাস্তখানি বড় আশায় পেশ্ করিলাম। অনুগ্রহপূর্বক ইহার প্রতি একটু মনোযোগ প্রদান করিবেন। আমাদের পরিচয় অগ্রে গ্রহণ করুন ;—আমরা এই সহরের সর্ব্বকার্য্যক্ষমা দাসীবৃন্দ অর্থাৎ ঝিয়ের দল। যে কারণে আজ সকলে একজোট হইয়া এই দরখাস্ত করিতেছি তাহা বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে পাঠ করুন। শুনিতে পাই আপনারা যদি কোনও লোক বা কোনও সমাজকে ঠেস্ দিয়া নাটক বা প্রহসন প্রভৃতি পঞ্চরং দেখেন এবং অভিনয় করেন তাহা হইলে সেই লোকের বা সেই সমাজের কাছে তাড়া খাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অভিনয় বন্ধ করিতে আপনারা পথ পান না। কেমন—ইহা কি সত্য? ভাল—তাই যদি হয়, তাহা হইলে আমরা অর্থাৎ দেশের ঝিয়েরা সকলে একবাক্যে বলিতেছি যে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় কর্তৃক লিখিত "বিবাহবিভ্রাট" নামক প্রহসনখানির অভিনয় আমরা অত্যন্ত আপত্তিকর বলিয়া বিবেচনা করি।

কেন আপত্তি করি তাহার কারণ এই যে, "বিবাহ বিভ্রাটে" ঝিয়ের যেরূপে চরিত্র পরিস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ ও বিদ্রোহাত্মক। ঝিয়ের চরিত্র ঐরূপে বর্ণনা করিয়া অমৃতবাবু সমস্ত ঝিবর্গের প্রতি ভীষণ বিদ্রূপ শর বর্ষণ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা সকলেই মর্ম্মাহত। কেন? দেশের সকল ঝিয়েরা কি ঐরূপ সেপাই-ভাবাপন্ন? আমরা কি সকলেই ঐরূপ কুঁদুলে—ঐরূপ কোমলতাশূন্য? আমরা কি সত্য সত্যই "চিনিবাস মুদির" ন্যায় একজন ষণ্ডা মদ্দের সঙ্গে হাত পা মুখ নাড়িয়া বচসা করি? আর এই বা কেমন কথা! ঝিয়ের ছাওর বলিয়া কেন সে লাঙ্গল বহিতে যাইবে—চাষা হইতে যাইবে? ঝিয়ের ছাওর কি নিদেন একটা পাড়াগেঁয়ে স্কুল মাষ্টারও হইতে পারে না—না আজকাল হয় না? এ কথাটা অত্যন্ত অপমান-

সূচক। আর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে বাবুভায়াদের সম্মুখে একজন গদী আসিয়া মাগী বলিয়া সম্বোধন করে সেটাও এই সভ্যতার বাজারে অত্যন্ত বিদ্রোহজনক। আমরা কি সকলেই কোমর বাঁধিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে "বিলাসিনী কারফরমাকে" ঘুসী লড়িবার জন্য Challenge করি? আমরা ঝগড়া করি—বিবাদ করি—সকলকে গালমন্দ করি, যা করি তা করি সমস্ত পথে ঘাটে হাটে মাঠে। তাই বলিয়া সে সমস্ত গালাগালি কি রঙ্গমঞ্চে ভদ্রলোকের সম্মুখে অভিনয় করিয়া দেখান উচিত? আমাদের আপত্তি আপনারা যদি অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে জানিবেন আজ হইতে আমরা সকলে ধর্ম্মঘট করিয়া আপনাদিগকে মহা ফাঁসাদে ফেলিব। আজকাল সহরে ঝিয়েদের কি আদর তাহা জানেন তো? বাবুরা যদি না জানেন তাহা হইলে মাঠাকুরাণীদের একবার জিজ্ঞাসা করিবেন যে আমরা যদি বিগড়াইয়া যাই, তাহা হইলে সংসারে কি ভীষণ লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হইবে। (উঠানের জঞ্জাল উঠানেই জমা হইয়া থাকিবে, ঘটি বাটি আঁচল শুদ্ধ আস্ত মৎস্যগুলি অকুটাভাবে পড়িয়া পচিতে থাকিবে, কলতলায় উচ্ছিষ্ট বাসন সকাল মাথা পাড়িয়া পড়িয়া শুকাইতে থাকিবে, বাসি বিছানার পাট হইবে না, দুধের ছেলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইবে, ছেলেপিলে সহিত গৃহিণীদের বাপের বাড়ী নিমন্ত্রণে কিম্বা কোনখানে বেড়াইতে যাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে, উনানে আগুন পড়িবে না। সুতরাং খাওয়া দাওয়ার দফা রফা)! সেকাল নাই যে আমাদের পাঁচ সিকে মাহিনা দিয়া গরুর মতন খাটাইয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম করাইয়া লইবেন। আমাদের হাতে এখন আর আঁসটে গন্ধ পাইবেন না। কারণ মাছ কুটিয়াই আমরা দস্তুর মতন হাতে সাবান মাখিয়া থাকি। মোটা চালের ভাত আর কচু ঘেঁচুর চচ্চড়ীতে আজকাল আমাদের উদর পূরণ করা হয় না। বাবুরাও যাহা খান, আমরাও

তাহাই খাই। ময়লা দুর্গন্ধময় ছেঁড়া কাপড় অঙ্গে পরা দূরে থাকুক, ঘরমোছা ন্যাতার জন্যও তাহা ব্যবহার করি না। জোটপড়া উকুনশুদ্ধ চুল আর আমাদের মাথায় দেখিতে পান কি? এখন দুটি বেলা যত্নপূর্ব্বক চিরুণীর সাহায্যে কেশ-বিন্যাস করিতে হয়। যে রাণী বাবুদের মতন ছার চাকরীর জন্য আমরা আর একটুও লালায়িত নই। রাস্তায় রাস্তায় পান বেচিয়া স্বাধীন ব্যবসার দ্বারায় আমাদের যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে। অতএব আমাদের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিলে আপনাদেরই সমূহ বিপদ জানিবেন। এই বিষয়ে আপনারা বিশেষ মনোযোগ করিবেন এবং শীঘ্র একটা মিটিং করিয়া আমাদের আপত্তির বিষয় তর্কবিতর্ক করিয়া যাহা হোক একটা কিছু মীমাংসা করিয়া আমাদের জ্ঞাত করাইবেন। আপনারা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিলে, আমরা শীঘ্রই মাননীয় কমিশনার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিয়া "বিবাহ বিভ্রাট" সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যাহাতে ভবিষ্যতে আর না অভিনীত হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহার জন্য আমরা সকলে চাঁদার খাতা পর্য্যন্ত করিয়া রাখিয়াছি, কারণ কি জানি—যদিই বা মকর্দ্দমা লড়িতে হয়। একান্তই যদি "বিবাহ বিভ্রাট" অভিনয় করিতে হয়, তাহা হইলে আগাগোড়া ঝিয়ের অংশটা বাদ দিয়া অভিনয় করিতে হইবে; এরূপ করিলে বোধ হয় আমাদের আর কোনরূপ আপত্তি না থাকাই সম্ভব। ইতি

আপনাদের আদেশপালিনী

ঝি—দল।

কলিকাতা।

২০৮

প্রতীচ্য অভিনেত্রী।

ম্যাডাম মেল্‌বো।

(শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

প্রতীচ্য-জগতের যে সকল কলাকুশলা অভিনেত্রী নৃত্য গীত ও অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতার অধিকারিণী হইয়া নাট্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিতা ও সর্ব্বজন-বিদিতা হইয়াছেন, ম্যাডাম মেলবো তাঁহাদের অগ্রগণ্য। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে—নাট্যজগতে যে সকল অভিনেত্রী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, ম্যাডাম মেলবো তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, —ইনি সেখানে 'অষ্ট্রেলিয়ার নাইটেঙ্গেল' নামে অভিহিতা। রঙ্গালয়ে মেলবোর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; মেলবো যেমন অভিনয়-কুশলা, তেমনই নৃত্যগীত-পটীয়সী; তাঁহার খ্যাতি ও প্রাধান্য সর্ব্বজন মান্য।

মেলবো যখন নিতান্ত বালিকা, তখন তাঁহার পিতা ভিক্টোরিয়ার রাজধানী মেলবোর্ণ নগরে বাস করিতেছিলেন। মেলবোর জনক জননী উভয়েই সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মেলবো ও শৈশব হইতে সঙ্গীতে অনুরাগিণী ছিলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ কখনও তিনি পিতামাতার সাক্ষাতে সঙ্গীত-চর্চ্চা করেন নাই; কন্যা যে সঙ্গীতের এরূপ পক্ষপাতিনী, তাঁহার পিতা মাতা ঘুনাক্ষরেও তাহা জানিতে পারেন নাই। একদা গম্ভীর রাত্রে পল্লীর সকলে যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন সহসা মেলবোর নিদ্রা ভঙ্গ হইল; নিদ্রা ভঙ্গে সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; তাহার পর কি ভাবিয়া শয়ন-কক্ষ হইতে বরাবর ড্রয়িংরুমে গিয়া উপস্থিত হইল। নিম্নতলে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম, এই খানে তাহার পিতামাতার সঙ্গীতের উপকরণাদি

থাকিত। ড্রয়িং রুমে গিয়াই মেলবো একটি গান ধরিল; সেই গভীর নিশীথে তাহার সুকোমল কণ্ঠ-প্রসূত মধুর গীতিরবে কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল। এই সময় মেলবোর পিতামাতারও নিদ্রাভঙ্গ হয়। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহারা কিন্নরী কণ্ঠ-লাঞ্ছিত সুমধুর গীতিরব বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের ভবনে এত রাত্রে কে এমন সুধাময় সঙ্গীত বর্ষণ করিতেছে, তাহা তাঁহারা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কন্যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, শয্যাশূন্য—মেলবো সেখানে নাই। অতঃপর গীতিরব লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা ড্রয়িংরুমে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন—যে সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহারা তন্ময়, সেই সুমধুর সঙ্গীত তাঁহাদেরই কন্যার কণ্ঠপ্রসূত; মেলবো সেই সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বসিয়া এক মনে গান গাহিতেছে! বালিকা-কন্যার সঙ্গীতে এরূপ কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা মেলবোর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু মেলবো তখন সঙ্গীতে এরূপ তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে, ড্রয়িংরুমে তাহার পিতা মাতার আবির্ভাবের কথা সে জানিতেই পারিল না। বালিকার সঙ্গীত শেষ হইলে তাহার পিতা স্নেহ বিজড়িতস্বরে তাহাকে ডাকিলেন,—"মেলবো!"

বালিকার চমক ভাঙ্গিল; সে সবিস্ময়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, কক্ষমধ্যে তাহার পিতামাতা উপস্থিত! মেলবো বড় শঙ্কিত হইল; রাত্রিকালে শয়ন-কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া নিচে নামিয়া আসিবার অপরাধে পিতামাতা হয় তো তিরস্কার করিবেন, এই আশঙ্কায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার পিতামাতা তিরস্কারের পরিবর্ত্তে যখন তাহাকে আর একটি গান গাহিতে বলিলেন, তখন সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল, তাহার সুন্দর গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল। মেলবো আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, পিতামাতাকে আর কোন কথা

বলিবার অবসার না দিয়া দ্রুতপদে নিজের শয়ন-কক্ষে পলায়ন করিল।

মেলবোর পিতামাতা তাঁহাদের কন্যার গান শুনিয়া, গানের তান লয় ও মধুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই দিন মেলবোর পিতা তাঁহার পত্নীকে বলিয়াছিলেন,—"দেখ, আমাদের মেলবো কালে একজন শ্রেষ্ঠ গায়িকা হইবে; মেলবো আমাদের অশিক্ষিতা পটীয়সী; শৈশবেই ইহার যেরূপ গুণের পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে মনে হয় অশিক্ষিতা মেলবো নিজ শক্তির প্রভাবে এরূপ গান গাহিতেছে না, এ শক্তি ঈশ্বর প্রেরিত। ভবিষ্যতে মেলবো অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের সকল গায়ক-গায়িকাকেই অতিক্রম করিবে।" মেলবোর পিতার এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই।

ম্যাডাম মেলবো তাঁহার আত্মজীবন-চরিতে তাঁহার শৈশব-কাহিনী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"বাল্যকালে আমার সম্বন্ধে আমার পিতামাতার কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা আমি ঠিক মনে করিতে পারিতেছি না। তবে আমার নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত বলিতে পারি, ভবিষ্যতে একজন শ্রেষ্ঠ গায়িকা হইব—আমার মনে কখনও এরূপ ধারণা ছিল না; হৃদয়ে কখনও আমি এমন আশাকে পোষণ করি নাই। শৈশবের উপযোগী শিক্ষাতেই আমার বাল্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। আমি সে সময় সঙ্গীত বিদ্যার কোনরূপ চর্চ্চা করি নাই, সঙ্গীত শিক্ষায় অবসর ও সুযোগ তখনও আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার পর পিতা মাতা কোনও সূত্রে জানিতে পারেন যে আমি সঙ্গীত-বিদ্যার অনুরাগী, সেই অবধি তাঁহারা আমার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, যাহাতে আমি সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে পারদর্শিনী হই, তাহার ব্যবস্থাবিধানে তাঁহারা সচেষ্ট হন। তখন আমি ছয় বৎসরের বালিকা।

মেলবোর্ণের উপকণ্ঠে রিচমণ্ড টাউনহলে আমি সর্ব্ব প্রথম সর্ব্বজন সমক্ষে গান গাহিয়াছিলাম। সে দিন টাউনহলে অষ্ট্রেলিয়ার এক জন প্রসিদ্ধ গায়ক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন হইয়াছিল, মেলবোর্ণের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সে দিন টাউনহলে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রথমেই আমন্ত্রিত গায়ক গান ধরিলেন, গানে তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কসরৎ দেখাইয়া সর্ব্ব-সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। আমিও এই সভায় গান গাহিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। পিতা আমাকে টাউনহলে লইয়া গিয়াছিলেন। যথাসময়ে আমার পালা আসিল। আমি টাউনহলে অসংখ্য জন-সমাগম দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম, সেই লোকারণ্যের মধ্যে গান করা দূরের কথা- আমার তখন কথা কহিবারও সামর্থ্য ছিল না। গান গাহিতে উঠিয়া আমি নিশ্চল নিরব ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সভার সভাপতি আমার তৎকালীন অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন আমার নিকটে আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন, স্নেহপূর্ণ বচনে আমাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্নেহ-সম্ভাষণে আমি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। তখন তিনি আমাকে তাঁহার উন্নত আসনের উপর দাঁড়াইয়া গান গাহিতে বলিলেন। আমি তখন ভয়ে ভয়ে একটি গান ধরিলাম, গান গাহিবার সময় কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই—পাছে লজ্জা পাই। গান শেষ করিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর সভাপতি মহাশয় আমাকে আর একটি গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এবার গান গাহিতে আর আমাকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না, তখন আমার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এবার আমি অসঙ্কোচে পরিষ্কার ভাবে আর একটি গান গাহিলাম। শুনিয়াছি, সভায় সমবেত জনগণ সকলেই আমার গান শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। সভাপতি

মহাশয় সযত্নে আমাকে একটি স্বর্ণপদক পরাইয়া দেন; আমি কিন্তু তখন স্বর্ণপদক প্রদানের অর্থ বুঝিতে পারি নাই; আমি ভাবিয়াছিলাম,—কেন ইহাঁরা আমাকে গহনা পরাইয়া দিতেছেন!

সঙ্গীত-শাস্ত্রে আমার পিতামাতা উভয়েরই তুল্য অধিকার ছিল। দেখিয়াছি, মাতা অনেক সভায় নিমন্ত্রিতা হইয়া শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে পীযূষ ধারা বর্ষণ করিতেন। সঙ্গীতের প্রভাবেই মেলবোর্ণে আমাদের বংশ বিখ্যাত ও সর্ব্বজন পরিচিত হইয়াছিল। মাতাই আমার শৈশবের শিক্ষক ও যৌবনের উপদেষ্টা ছিলেন, আমি তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারেই পরিচালিত হইয়াছি।

আমি যখন দশ বৎসরের বালিকা, সেই সময়কার একটি ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রান্তবর্ত্তী এক পল্লীগ্রামে—পিতার জমীদারিতে আমরা প্রতি বৎসর শীতকালটা অতিবাহিত করিতাম। এক বৎসর এইরূপ যথাসময়ে আমরা পল্লী ভবনে গমন করিলাম। আমাদের গৃহসজ্জাগুলি পূর্ব্বাহ্নেই প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গেলাম। দেখিলাম, আমার হারমোনিয়মটি শীত-নিবাসে আনীত হয় নাই। যা' ত' একটি বাক্স, বহু আছে, সে সব বড় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। আর তথায় একটিও পিয়ানো নাই। পিয়ানো না পাইয়া আমি অত্যন্ত চটিয়া গেলাম; আমাকে শান্ত করিবার জন্য মাতা আমাকে একটী 'কনসার্টিনা' প্রদান করিলেন। বলিলেন,—'এটি বাজাইতে তোমাকে নিজে শিখিতে হইবে। আমরা শিখাইব না।' আমি প্রথম ভাবিলাম অসম্ভব, তাহা হইতে পারে না। কিন্তু শেষে মাতার সস্নেহ আদেশে 'কনসার্টি বাজাইতে আরম্ভ করিলাম। তিন মাস ক্রমাগত চেষ্টা করিলাম। শেষে যখন আমাদের শীত-নিবাস পরিত্যাগের সময় আসিল, তখন কনসার্টিনা বেশ বাজাইতে শিখিয়াছিলাম। মাতার আদেশ কার্য্যে

পরিণত করিতে পারিয়াছি, একটা নূতন বাদ্য যন্ত্র দখল করিতে পারিয়াছি, দেখিয়া আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না। আমরা যে সময় শীত-নিবাসে অবস্থান করিতেছিলাম সে সময় পিতা কোনও কার্য্যের জন্য রাজধানীতেই ছিলেন। তিন মাস পরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি নিজের চেষ্টায় 'কনসার্টিনা' বাজাইতে শিখিয়াছি, শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন,। বারংবার আমারে সস্নেহে আদর করিলেন, আমার মুখ চুম্বন করিলেন। আমি আদরে গলিয়া গেলাম।

আমার বয়স যখন তেরো বৎসর, তখন আমি অর্গ্যান বাজাইতে শিখিয়াছিলাম। আমি প্রায়ই মেলবোর্ণের গীর্জ্জায় যাইতাম; এই গীর্জ্জায় একটী চমৎকার অর্গ্যান ছিল; গীর্জ্জার যাজক মহাশয় আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সেই অর্গ্যানটি বাজাইতে দিতেন। একদিন আমি অর্গ্যান বাজাইতে বাজাইতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, ক্লান্তি দূর করিবার অভিপ্রায়ে গীর্জ্জার ছাদে গিয়া পদচারণ করিতে লাগিলাম। শ্রান্তি দূর হইলে আবার গীর্জ্জার ভিতর গিয়া অর্গ্যান বাজাইবার ইচ্ছা ছিল। ইতি মধ্যে গীর্জ্জা-রক্ষক গীর্জ্জার দরজা বন্ধ করিয়া বাটী চলিয়া গিয়াছিল। ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলাম আমি গীর্জ্জা মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। তখন নিরুপায় হইয়া আমি অর্গ্যান বাজাইতে বসিলাম। আশ্চর্য্য, অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই আমি মুক্তি লাভ করিলাম। গীর্জ্জা-রক্ষক অর্গ্যানের আওয়াজ পাইয়া গীর্জ্জার দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। সে দিন অর্গ্যানই আমাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিল!

সতেরো বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের দুই বৎসর পরে স্বামীর অনুমতি অনুসারে আমি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিলাম। রঙ্গমঞ্চেই আমার খ্যাতি বর্দ্ধিত হয়। গীতি-নাট্যেই আমি

বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলাম। একটি নাটকে আমি বিভিন্ন ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইতাম। প্রথমে আমি সখ করিয়া অভিনয় করিতাম; অবশেষে গীত ও অভিনয় ব্যবসায় আমাকে জীবিকার্জ্জনের উপায় স্বরূপ অবলম্বন করিতে হয়। আমার বয়স যখন তেইস বৎসর তখন আমি ইংলণ্ডে গমন করি। ইংলণ্ডেই আমার শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। ইংলণ্ডে রঙ্গালয়ে আমি জুলিয়েটের ভূমিকা অভিনয় করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলাম *

মেহের-উন্-নিসা।

(শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এ অপরিচিতা কে?

"আপনিই কি ক্ষত্রিয়রাজ মানসিংহ?"

"হাঁ—কিন্তু তুমি কে মা?"

"আমি অভাগিনী—আশ্রয়হীনা। আমার আবার পরিচয় কি মহারাজ।"

"মা! তোমার রূপ দেখিয়া ত বোধ হয় না, যে তুমি দরিদ্র-কন্যা!"

"খোদা আমাকে গরীবের ঘরে পাঠান নাই বটে, তবে আজ আমি ভাগ্যদোষেই এই অবস্থায় পড়িয়াছি!

---

* জুলিয়েটের ভূমিকায় মেলবোর একখানি চিত্র এবার নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত হইল।

"তুমি মুসলমানী ?"

"হাঁ—"

"আমি তোমায় কন্যা সম্বোধন করিতেছি—প্রকৃত পরিচয় দাও।"

"এখন নয় মহারাজ! সময় আছে। মোটের উপর জানিয়া রাখুন—আপনাদের অত্যাচারেই আজ আমার এ দশা—"

"আমাদের অত্যাচার! ক্ষত্রিয়-বীর কখনও স্ত্রীলোকের উপর অন্যায় অত্যাচার করে না।"

"হইতে পারে। কিন্তু অত্যাচার—আপনার দ্বারা না হইলেও, যে মোগলের নিকট আপনি আত্মবিক্রয় করিয়াছেন—সেই মোগল বাদসাহই করিয়াছেন।

"আকবর-সা—?"

"না—তার পুত্র। যুবরাজ সেলিম!

"এক্ষণে বুঝিয়াছি তুমি কে? তুমি উজীরগড়ের দুর্গাধিপতির কন্যা—"

"আপনার অনুমান যথার্থ—"

"তুমি কি চাও মা?

আশ্রয়—আগে প্রতিজ্ঞা করুন আশ্রয় দিবেন।

"দিব। আমার অম্বর প্রাসাদে স্থানের অভাব নাই—স্বচ্ছন্দে তুমি আমার সঙ্গে আসিতে পার।"

"না—মহারাজ আমি অম্বরে যাইতে চাহি না—

"কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর?

"মোগলের রংমহালে—আগরায়।"

"কেন—"

"সেখানে বাঁদীগিরি করিব।"

মানসিংহ এই কথা শুনিয়া একটু ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন। মনে

মনে কি ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন—"মা! তুমি পাঠান কন্যা! আমি মোগল পাঠানের সঙ্গে অনেক দিন ধরিয়া মিশিতেছি। তোমার চিত্তের মধ্যে ধূমায়িত অগ্নি—তোমার নয়ন কোণে অগ্নি। মোগল প্রাসাদে তোমার স্থান হইবে না। সেখানে তুমি দাবানল জ্বালাইতে পার!"

"কেন—বাঁদিগিরি করিয়া খাইব—তাহাতে আপনার কি আপত্তি মহারাজ?"

"মোগলের হারেমে বাঁদীগিরি করিবে কেন মা? আমার সঙ্গে আমার প্রাসাদে চল। আমার মহিষী তোমায় কন্যার মত পালন করিবেন।"

"মহারাজ! তাহা হইলে ত আমার এক মহা-ব্রত পালন করিতে পারিব না।"

"তাহা বুঝিয়াই ত আমি আপত্তি করিয়াছি মা। তুমি পাঠান কন্যা। তুমি—সেলিম তোমার পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পথের ভিখারী করিয়াছেন—তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন। তুমি সেলিমের উপর প্রতিশোধ লইতে চাও। জানিও—সেলিম সম্রাট-পুত্র হইলেও রক্তসম্পর্কে আমার অতি নিকট আত্মীয়। আমি প্রাণ থাকিতে তাহার অনিষ্ট হইতে দিব না।"

"তাহা হইলে আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে চাহেন!"

"তুমি বালিকা। অন্য কেহ মানসিংহকে এই অপবাদ দিলে এখনি সমুচিত শাস্তি পাইত।"

"যদি এ অপবাদ সহ্য করিতে অনিচ্ছুক হন—তাহা হইলে আমায় আশ্রয় দিন—"

"আমার নিজের গৃহে তোমায় আশ্রয় দিব। রাজকন্যার মত তোমায় পালন করিব—"

"সে আশ্রয় আমি চাহিনা—মহারাজ। আপনাকে এ রাত্রে কষ্ট দিলাম বলিয়া আমি বড়ই দুঃখিতা। আমাকে এই মাত্র কন্যা সম্বোধন করিয়াছেন—দুঃখিনী কন্যার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। কিন্তু জানবেন—যে উপায়ে পারি আমি বাদসাহের হারেমহালে প্রবেশ লাভ করিব—প্রয়োজন হইলে আপনার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করিব।"

এই কথা বলিয়াই সেই কিশোরী সেই চন্দ্রালোকিত পার্ব্বত্য-পথে ছায়ার মত সরিয়া গেল। মানসিংহ স্থিরভাবে সমস্ত কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাহাকে দুই তিনবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। কিন্তু সে আর ফিরিল না।

সহসা—অদূরে কতকগুলি সাবধান বিক্ষিপ্ত পদশব্দ শ্রুত হইল। মানসিংহ তীব্রবেগে অসি কোষোন্মুক্ত করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন।

মনে মনে ভাবিলেন—"প্রতিহিংসাপরায়ণা এই পাঠান-কন্যা হয়ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমায় নষ্ট করিবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। তাহারই লোকেরা আমায় হত্যা করিতে আসিতেছে!"

কিন্তু সহসা একেকজন সেনা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই, উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"আল্লাহো আকবর! মহারাজ মানসিংহের জয়।" মানসিংহ দেখিলেন—তাঁহারই সঙ্গী সেনাদলের কয়েকজন পদাতিক তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তোমরা ব্যস্ত হইয়া এখানে কেন আসিলে।"

তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া বলিল—"মহারাজ! আপনার বিলম্ব দেখিয়া আমরা সন্দেহবশে এখানে আসিয়াছি। এ গিরি-পথ শত্রুসঙ্কুল!"

"চল"—বলিয়া মানসিংহ সেই উপত্যকা পথ হইতে অবতরণ

করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ চিন্তারেখাঙ্কিত। তাঁহার মনে তখনও সেই পাঠান-কন্যার উজ্জ্বল নয়ন—তীব্র দৃষ্টি—প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক দৃঢ় স্বর, বড়ই আধিপত্য করিতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বের কথা।

এই ঘটনার দুই মাস পূর্ব্বে, মানসিংহ ও সাহজাদা সেলিম, আকবর কর্ত্তৃক পার্ব্বতীয় জাতদের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হন। মানসিংহ সেলিমকে অপ্রবল বিদ্রোহীদের দমনের ভার দিয়া নিজে অপরিমেয় সৈন্য লইয়া গভীর পার্ব্বত্য প্রদেশে অগ্রসর হন।

সেলিম দেখিলেন, মানসিংহ যে শত্রুকে দুর্ব্বল ভাবিয়া তাঁহাকে এই ছোট খাট বিদ্রোহ দমনের ভার দিয়া গিয়াছেন—তাহারা নিতান্ত দুর্ব্বল নহে। তাহাদের আশ্রয়দুর্গ ক্ষুদ্র—লোকবল কম—কিন্তু সে দুর্গ এমন সুদৃঢ়, যে সেলিম পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না।

ইহার উপর তাহারা আবার অতর্কিতভাবে সেলিমের শিবিরের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কোথা হইতে একদল পাহাড়ীয়া সহসা গভীর রাত্রে আসিয়া দেখা দিল—আর সুখসুপ্ত মোগলদিগের অশ্ব, অস্ত্র ও রসদ চুরি করিয়া পলাইল। এইরূপ নিশীথ উপদ্রব প্রায়ই ঘটিত।

উজীরগড় অবরোধ জন্য মানসিংহ সেলিমের সঙ্গে দশ সহস্র সেনা রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমাগতঃ নিশীথ লুণ্ঠনে অধিকাংশ মোগলসেনা অস্ত্র ও অশ্বহীন হইয়া পড়িল! পার্ব্বত্য-স্থানে অশ্ব না হইলে যুদ্ধ করা চলে—কিন্তু অস্ত্র না হইলে ত কোনরূপেই চলিতে

পারে না। সেলিম মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে বিদ্রোহ তিনি পক্ষাধিক কালমধ্যে দমন করিয়া রাজধানীতে ফিরিবেন—তাহা দমন করিতে তাঁহার একমাস সময় লাগিল! একদিন তিনি সরোষে সমস্ত বাহিনী লইয়া, সেই ক্ষুদ্র দুর্গের চারিধার ঘিরিয়া ফেলিলেন। সে যুদ্ধে মোগল ও পাঠান অনেক মরিল—অনেক জখম হইল। মোগল পাঠানের ছিন্ন দেহের শোণিত একত্রে মিশিয়া উপত্যকা ভূমি রক্ত রাগময় করিল। শেষ বিধাতা সাহাজাদা সেলিমের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। দুর্গাধিপতি—উজীর খাঁ, আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া, সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সেলিম তাহাতে স্বীকৃত হইলে—দুর্গাধিপতি তাঁহাকে বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ তরবারি সমর্পণ করিতে মোগল-শিবিরে আসিলেন।

কিন্তু সেলিম নবীন সেনাপতি। যুদ্ধনীতির অভিজ্ঞতা তাঁহার তখনও নাই। মানসিংহ এক্ষেত্রে যাহা না করিতেন, অপ্রবীণ সেনাপতি সাহাজাদা সেলিম তাহাই করিলেন। অর্থাৎ শত্রুকে তিনি হাতে পাইয়া বন্দী করিলেন।

দুর্গাধিপকে বন্দী করায়—তাঁহার অধীনস্থ পাঠানগণ তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য, পুনরায় সবলে মোগলদিগকে আক্রমণ করিল। সেলিম ইহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গাধিপতি উজীর-খাঁকে হত্যা করিলেন। আকবরের সন্তান হইয়াও, তিনি পিতার বীর-দর্পপূর্ণ উজ্জ্বল নামে কলঙ্ককালিমা নিক্ষেপ করিলেন।

দুর্গ ধ্বংস করিয়া সেইখানে মোগল সেনা রাখিয়া—একজন মোগল-সেনাপতিকে দুর্গেশ্বরের পদ দিয়া, সেলিম লাহোরের দিকে ফিরিলেন। মানসিংহকে দূতমুখে সংবাদ দিয়া পাঠাইলেন—"দুর্গজয় হইয়াছে। উজীর খাঁ মরিয়াছে—দুর্গ এখন বাদসাহের দখলে! আমি লাহোরে আপনার জন্য অপেক্ষা করিব।"

দুর্গাদিপের পত্নী, কন্যাকে লইয়া মাসখানেক জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিলেন। দারিদ্র্যের কষ্ট তাঁহার সহিল না। নির্জ্জন পার্ব্বত্য উপত্যকায়, পাষাণ-গর্ভে তাঁহার সমাধি প্রতিষ্ঠা হইল।

দুর্গাদিপের একমাত্র কন্যা, সেলিমের ব্যবহারে আর বিধাতার ব্যবস্থায় পিতৃমাতৃহীনা হইল। সে মনে মনে প্রতিশোধ কল্পনা করিল যে সেলিম হইতে তাহার এ দুর্দ্দশা হইল—সে ক্ষুধিতা বাঘিনীর ন্যায় সেই সেলিমের হৃদয়ের রক্ত পান করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

সে একদিন জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে পর্ব্বতের এক উপত্যকা হইতে দেখিতে পাইল, পিপীলিকার ন্যায় সারি দিয়া অনেক সৈন্য অজাগর গতিতে নিম্নের উপত্যকায় নামিতেছে। এ সৈন্য মোগলের না হইয়া যায় না।

সে সন্ধানে জানিল—যে মানসিংহ, উজবেক জাতিকে বিধ্বস্ত করিয়া রাজধানীতে ফিরিতেছেন। কাজেই সে দুই চারি কথায় একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়া, এক পার্ব্বতীয় বালকের হাতে দিয়া তাহা মানসিংহের শিবিরে পাঠাইল। মানসিংহ পত্রখানি পড়িয়া একটু চিন্তিত হইলেন। পত্রে লেখা ছিল—"মহারাজ! আপনি বাদসাহের সেনাপতি, সাহসী বীর। এক অভাগিনী রমণী—কোন বিশেষ কারণে নির্জ্জনে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থিনী। সে ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছে, ইহাতে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা নাই—শত্রুর ছলনা নাই। একটী সামান্য অভিযোগ জানাইবার জন্য তাহার—এ প্রার্থনা। মধ্য রাত্রে উপরের উপত্যকায় উঠিলেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

মানসিংহ—সাহসী বীর। সেই উর্দ্দু পত্রখানি পড়িয়া তিনি বুঝিলেন—যে তাহা সত্য সত্যই স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এ অনুরোধ না রাখিলে, তাঁহার বীরত্ব গৌরবে কলঙ্ক পড়িবে—কাজেই তিনি সেই নিশীথ সময়ে সহচর

মাত্র সঙ্গে না লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহারপর যাহা ঘটিয়াছে—পাঠক তাহা জানেন।

পরদিন প্রভাতে, শিবির ভঙ্গ করিয়া মহারাজ মানসিংহ লাহোরের পথ—ধরিলেন। লাহোরে, সাহাজাদা সেলিমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সেলিম—আত্ম-গরিমায় স্ফীত হইয়া, মহাদম্ভে তাঁহার দুর্গজয়ের বীরত্ব কাহিনী আরম্ভ করিলেন। মানসিংহ তাহার কতক শুনিলেন—কতক বা শুনিলেন না—তবু তারিফ্ করিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু সেই দুর্গাধিপতির কন্যা সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই তাঁহার নিকট ভাঙ্গিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপন্না দেওয়ানা যুবতী।

উল্লিখিত ঘটনার পর—তিনমাস চলিয়া গিয়াছে। সেলিম আগরা রাজ-প্রাসাদের মধ্যে, মোহময়ী সেরাজির শক্তির অধীন হইয়া সুখ-বিলাসে—কালক্ষেপ করিতেছেন। রণক্ষেত্রের সেই কষ্ট পরিশ্রম, উদ্বেগ উত্তেজনা, অসির ঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষা, গজের বৃংহণ কিছুই নাই। বাদসাহের গৃহে জন্মিলে এ দুনিয়ার যে সব অতি দুর্লভ সুখের অধিকারী হওয়া যায়—এখন তিনি তাহার উপভোগেই নিযুক্ত।

আর মানসিংহ! তিনিও ক্রমে ক্রমে বিশাল স্মৃতি-ক্ষেত্র হইতে সেই অপূর্বদৃষ্ট—অপরিচিতা পাহাড়িয়া দুর্গাধিপতির কন্যার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। বাদসাহের সহিত—সাক্ষাৎ করিয়া দুর্গজয়ের পুরস্কার রূপে, শিরোপা ও রাজ-অভিনন্দন লইয়া এখন—তিনি অম্বর সহরে নিজের বিশাল প্রাসাদ মধ্যে সুরূপা মহিষীগণ পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছেন।

ইতিমধ্যে একদিন—আগরার এক প্রশস্ত রাজবর্ত্মে একটা ভয়ানক গোলযোগ উঠিল। সেই শীতলবারিচুম্বিত রাজপথের দুই ধারেই বড় বড় ওমরাহদিগের অট্টালিকা। সেই সমস্ত অট্টালিকার অধিকাংশের শিরোদেশের বিভিন্ন-বর্ণের বিচিত্র পতাকা সমূহ উড়িতেছে। যাঁহারা দরবারের খবর রাখেন, রাজা-রাজড়ার খবর রাখিয়া থাকেন—তাঁহারা সেই পতাকার বর্ণ, আর তাহার উপর অঙ্কিত চিহ্ন দেখিয়াই বলিতে পারেন—যে সে বাড়ীগুলি কোন হাজারী মনসবদারের, বা কোন পদের ওমরাহের।

যাক্—বড় কথায় আমাদের কাজ নাই। যে ছোট ঘটনাটি ঘটিয়া ক্রমশঃ বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমরা তাহার কথাই এখন বলিব।

দিবার প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। সমস্ত অট্টালিকা, রাজপথ, বিপনী, উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে দ্যুতিমান। অসংখ্য জনস্রোত এদিকে ওদিকে ফিরিতেছে—আসিতেছে, যাইতেছে। অশ্বগজ উষ্ট্র তাঞ্জাম ডুলী প্রভৃতি সবই যাত্রী ভার পীড়িত—এই সময়ে রাজ পথের এক কোণে একটা মসজিদের বাহিরের রোয়াকে বড় ভিড়।

এক দরিদ্রা যুবতী, মলিন বসনে তাহার দেহ আবৃত করিয়া—সেই মসজিদের রোয়াকে বসিয়াছে—আর রাজ্যের লোক তাহার চারিদিক ঘেরিয়া জনতা করিয়াছে। সে জনতার মধ্যে মোগল, পাঠান, হিন্দু কাফ্রি, নারী, নর, অন্ধ, বৃদ্ধ, রোগী—জঙ্গলী সবই আছে—আর তাহাদের অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর লোক।

কেহবা বলিতেছে—"ওগো! আমার হাতটা একবার দেখনা—কেহবা বলিতেছে—"ওগো! আমার কপালের সব কথা গুলি ভেঙ্গে বলনা—আধা আধা বলিলে কেন?" কেহবা হাতখানা সবেগে—সেই জনতা-পীড়িত রমণীর চিবুকের নীচে পর্য্যন্ত আনিয়া বলিতেছে—

"আমার বড় জরুরি কাজ—বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না—বলনা গা! আমার আজকের কাজটা সিদ্ধ হইবে কি না?—"

এই সব—অসম্ভব গোলযোগে পড়িয়া সেই যুবতী দেওয়ানা—যেন অনেকটা দিশে হারা হইয়া পড়িয়াছিল। সে যে কাহার কথা—বলিবে আর কাহাকে না—বলিবে কিছুই ঠিক্ করিতে পারিতেছিল না। পরিশেষে সে ত্যক্ত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। তবুও সেই অবাধ্য জনতার লোক গুলা তাহার সঙ্গ ছাড়েনা।

উপায় না দেখিয়া যুবতী দৌড়াইতে লাগিল। সমগ্র জনতাও মহাবেগে তাহার পশ্চাদানুসরণ করিতে লাগিল। কেহ বলিল—পাগল, কেহ বলিল চোর—কেহ বলিল, পাগলুরাণ্ডবাই। কাজে কাজেই চারিদিকে একটা ভীষণ কোলাহল। সেই কোলাহল শুনিয়া দুইজন—সম্ভ্রান্ত লোক, এক অট্টালিকার উপরতলের গবাক্ষ দিয়া মুখ বাড়াইয়া—ব্যাপার কি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—এক দরিদ্রা নীলবসন পরিহিতা—যুবতী, বিপন্ন অবস্থায় দৌড়াইতেছে আর তাহার পশ্চাতে অবাধ্য জনতা। তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে একজন—হস্তেঙ্গিতে সেই বিপন্না যুবতীকে সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন। সেই—বিত্রস্ত জনতাতাড়িত—ভীতা রমণী—সেই প্রাসাদ তুল্য সৌধ মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিলে—দৌবারিকগণ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল—ও সেই সঙ্গে সঙ্গে জনতারও অবসান হইল।

সেই হতভাগিনী যুবতী এইরূপে—প্রাণ বাঁচাইয়া আগন্তুক যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। এমন সময়ে একজন প্রসন্ন মূর্ত্তি ওমরাহ—সেইখানে আসিয়া, স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"তুমি কে মা?"

সেই রমণী এই শিষ্ট কথায়, অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"বাবা! আমি অনাথিনী।"

"তাতো' তোমার অবস্থা দেখিয়া বুঝিতেছি—বোধহয় এ বাদসাহী সহরে তুমি প্রথম আসিয়াছ।"

"হাঁ—বাবা—আজই আমি এখানে আসিয়াছি—"

"ব্যাপারটা—কি? অত লোক তোমার সঙ্গে দৌড়াইতেছিল কেন?

"কিছুই নয়। আমার এই নীলবর্ণের পোষাক দেখিয়া, এক ওমরাহ আমায় সন্ন্যাসিনী ভাবিয়া—হাত দেখাইতে আসিলেন। আমি তাঁহার আশা ভঙ্গ করিলাম না। আমি গুরুর কৃপায়—কিছু কিছু জানি। তাঁহাকে দুই চারিটা সত্যঘটনা বলায়—তিনি আমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া আমায় একটা আসরফি ইনাম্ দিলেন। কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার পরই, যাহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল, তাহারা আমার কাছে আসিয়া চারিদিক ঘেরিল। তার পর যাহা হইয়াছে, সবই আপনি দেখিয়াছেন।"

সেই প্রশান্তমূর্ত্তি ব্যক্তি বলিলেন,—"মা! এ আগরা বাদসাহী সহর। এখানকার রাজপথ সুন্দরী যুবতীর পক্ষে নিরাপদ নয়। তুমি আমার সঙ্গে এস।

সেই দেওয়ানা তাঁহার সহিত নিকটের কক্ষে গেল। সেই কক্ষে আরও দুই জন লোক বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন,—"ব্যাপার কি খাঁ সাহেব"?

আমীরউদ্দৌলা গিয়াসবেগ সাহেব—যে সমস্ত কথা সেই রমণীর মুখে শুনিয়াছিলেন—তাহারাই পুনরাবৃত্তি করিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে সৈনিকবেশী যে ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বলিলেন,—"খাঁ সাহেব—উহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইবার পূর্ব্বে, একবার আমাদের হাতটা দেখাইয়া লউন না!"

খাঁ সাহেব—অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে, সেই রমণীর দিকে চাহিলেন। যুবতী—প্রশান্ত ভাবে বলিল—"আপনি আমায় আশ্রয় দিয়াছেন—আমার

আবরু রক্ষা করিয়াছেন, আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ। কিন্তু হাত দেখিতে গেলে, অনেক অপ্রিয় রূঢ় সত্য বলিতে হয়। যদি উঁহারা আমার কথায় রুষ্ট না হন—সত্য কথা শুনিতে কষ্ট বোধ না করেন, তাহা হইলে আমি কিছু পরিশ্রম করিতে পারি।"

সেই সৈনিকবেশী পুরুষ, গম্ভীর হাস্য সহকারে বলিলেন—"না—না বিবি! আমরা তোমার সব কথাই শুনিতে প্রস্তুত। তুমি এখানে আইস।"

রমণী—অতি সংকোচে—সেই বহুমূল্য বনোবাত কার্পেট মণ্ডিত বিস্তৃত বিছানার এক পার্শ্বে বসিল; আর সেই সৈনিক পুরুষ—আগ্রহের সহিত তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন।

সেই নীলবসনমণ্ডিতা রমণী, অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই হাত খানি লইয়া নাড়াচাড়া করিল; তাহার পর গম্ভীর মুখে বলিল—"সাহেব! আপনার পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি সৈনিক পুরুষ বীর-ধর্ম্মাশ্রয়ী। আপনার সুগঠিত দেহ ও তীব্র-নয়ন-জ্যোতি দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, আপনি অতি বলবান কিন্তু যাহা শুনিবেন তাহাতে আপনি ভীত হইবেন না ত?"

সেই প্রশান্তমূর্ত্তি, বিশাল দেহ—সৈনিক পুরুষ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "না—না আমরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। মৃত্যু হইতেছে আমাদের খেলার জিনিস। আর বিবি—মৃত্যুর অপেক্ষা ভয়ানক এ জগতে ত আর কিছুই নাই। কিন্তু—সে মৃত্যুকে আমরা গ্রাহ্যই করিনা।"

সেই রমণী সেই সৈনিক পুরুষের অবিচলিত, ভাবগম্ভীর মুখের দিকে একবার কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"হইতে পারে সাহেব! রণক্ষেত্রে মৃত্যু গৌরবের কথা, বীরের তাহাই প্রার্থনা। কিন্তু গৃহ-কক্ষে রক্তাপ্লুত অবস্থায় শোচনীয় মৃত্যু বোধ হয়, মহাসাহসী সৈনিকেরও ইপ্সিত নহে!"

এই তেজদৃপ্ত বাক্যে সেই সৈনিক-পুরুষ যেন একটু বিচলিত হইলেন। তাঁহার উৎসুক্য বাড়িয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"যে প্রকার মৃত্যুই হউক, তাহাতে বীর-হৃদয় কিছুতেই কম্পিত হয় না। তুমি বিনা সংকোচে অপর সব কথা বলিতে পার।"

সেই রমণী বলিল—"আপনার অদৃষ্টাকাশে প্রথমে যথেষ্ট সুখ। পরে মেঘ উঠিবে কিন্তু সে মেঘের পরিণাম—ভীমঝঞ্ঝা ও তীব্র বজ্রাঘাত।

সৈনিক-পুরুষ হাসিয়া বলিলেন—"তাহাতেও আমি ভীত ও চঞ্চল নহি।

সেই রমণী ভীষণ ভ্রুকুটী করিয়া বলিল—"তা—নয়—সাহেব; তা নয়; অতি নৃশংস হত্যায়—আপনার মৃত্যু হইবে—সে ভীষণ মৃত্যু দেখিয়া অতি নির্ম্মম পাষাণও শিহরিয়া উঠিবে।

এই কথা শুনিয়া সৈনিক পুরুষ তাহার হাত খানি টানিয়া লইলেন। তাঁহার সদা-প্রশান্ত মুখ প্রথমতঃ একটু গম্ভীর হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত উজ্জ্বল।

যে প্রশান্তমূর্ত্তি প্রবীণ ব্যক্তি এই রমণীকে—সঙ্গে লইয়া উপরে আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "কেমন কুলী খাঁ! এই বার হইয়াছে ত? আর হাত দেখাইবে?"

কুলী খাঁ—হাস্য করিয়া বলিলেন—"না—আমার সখ মিটিয়াছে, এখন আপনার না হয় একটু প্রাণের সখ মেটান।—"

সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি ওমরাহ বলিলেন—"তা মিটাইব বইকি! যখন এই বিবি এ বাটীতে রহিলেন, তখন এক দিন না এক দিন আমাদের সুযোগ ঘটিবে।" এই বলিয়া তিনি এক জন বাঁদীকে ডাকিয়া সেই রমণীকে অন্তঃপুরে তাহার পত্নীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

ইনিই গৃহস্বামী। ইহঁার নাম—গায়েসউদ্দৌলা মহম্মদ গয়াসবেগ, আকবর বাদসাহের প্রধান কোষাধ্যক্ষ ও প্রাসাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা। যিনি হাত দেখাইয়াছিলেন, তাহার নাম আলিকুলী খাঁ—তিনি বাদসাহের অধীনস্থ একজন এক হাজারী মন্সবদার। আর তৃতীয় প্রবীণ ব্যক্তি—যিনি এই সব ঘটনায় না-রাম,-না গঙ্গা, বলিয়া চুপ করিয়া মুখ বুজিয়া বসিয়া রহস্য দেখিতেছিলেন, তাঁহার নাম মালেক মাসুদ। তিনি আকবর বাদসাহের অনুগৃহীত মুকিম বা রত্ন-ব্যবসায়ী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গণনার ফলাফল।

গিয়াসবেগ—অতি দুঃখের অবস্থা হইতে, এই উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়াছেন। এক মুষ্টি অন্নের প্রত্যাশায়—ছিন্নবস্ত্রমাত্র সম্বল করিয়া, তিনি স্ত্রী কন্যা লইয়া সুদূর পারস্য হইতে রত্নগর্ভা হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রাণের চিরসঞ্চিত আশা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি ছিলেন আশ্রয়হীন, সম্বলহীন, অন্নহীন, সহায়হীন দরিদ্র মুসাফের আর এখন তিনি—দিল্লীশ্বর আকবর সাহের একজন উচ্চপদস্থ মন্ত্রী।

গিয়াসবেগের এতাদৃশ অসম্ভব পদগৌরব ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইলেও কোন অহঙ্কার নাই। এজন্য রাজসভায়—সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট। তিনি নিজে—দুঃখের জ্বালাময় অবস্থা হইতে, অপরিমেয় সুখের অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন, কাজেই দরিদ্রের প্রতি তাঁহার অসীম যত্ন।

আর তিনিও যেমন—তাঁহার শান্ত, সুশীলা পত্নীও সেইরূপ। যদিও তিনি একজন মহা সম্ভ্রান্ত ওমরাহের গৃহিণী—কিন্তু তাঁহার চাল-চলন সামান্য গৃহস্থ মহিলার মত। কে বলিবে—যে তিনি ওমরাহপত্নী! অসংখ্য দাস দাসী সত্ত্বেও, তিনি সংসারের অনেক কাজ নিজের হাতে

করিয়া থাকেন। অতিথি-সেবায় তাঁহার বড় আনন্দ। আবার তাহার উপর অতিথি যদি দরিদ্র হয়—তাহা হইলে তাঁহার যত্নের আর ইয়ত্তা থাকে না।

গিয়াসবেগ—কোন কিছু বিশেষ ভাবে বলিয়া না পাঠাইলেও তাঁহার পত্নী, আমিনা-বিবি, স্বামীর মনোভাব সবই বুঝিয়া লইলেন। তিনি সহাস্য মুখে, স্বভাবসুলভ প্রসন্নতার সহিত সেই অনাথিনী যুবতীকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—"এস মা! এখানে কোনরূপ লজ্জা সংকোচ করিও না। এটী তোমার নিজের বাড়ী বলিয়াই মনে করিও।—"

সেই অনাথিনী বুঝিল—সে এক দেবীমূর্ত্তির কাছে আসিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে, অনাথার জন্য কত স্নেহ, কত যত্ন, কত মমতা, থরে থরে সজ্জিত। এই স্বার্থপর দুনিয়ায় যে এত নিস্বার্থ পরপ্রীতি ও ভালবাসা থাকিতে পারে, ইহা দেখিয়া সে অতিশয় আশ্চর্য্য হইল।

দেওয়ানা সংকোচ ত্যাগ করিয়া বলিল—"মা! যিনি আমায় আজ দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি যেমন দেবতা, আর তুমিও তাঁর সেইরূপ উপযুক্ত পত্নী। বিবি! চিরদিন আমার এ দুঃখের অবস্থা ছিল না। কিন্তু সেই সুখের দিনেও এত নিস্বার্থ প্রীতি, যত্ন, স্নেহ ত আর কোথাও পাইনি মা।—"

সেই রমণী বলিলেন—"ও সব কথা এখন থাক্। আগে তুমি স্নান করিয়া আসিয়া কিছু খাও। তোমার মুখ শুষ্ক।"

তিনি—বাঁদীদের অপেক্ষা না করিয়া, স্বহস্তে সেই অনাথিনীকে মহা-সুগন্ধি তৈলাসিক্ত করিয়া স্নানাগারে লইয়া গেলেন। আগরার প্রত্যেক ওমরাহের গৃহে হামাম বা স্নানাগার আছে। সেই হামামে, উষ্ণ, নাতি উষ্ণ, শীতল—নাতি শীতল, অতি শীতল সকল প্রকারের স্নানবারি সঞ্চিত থাকে। সেই স্নেহময়ী রমণী বাঁদীদের অপেক্ষা না

করিয়া, নিজেই তাহাকে স্নান করাইলেন। তারপর নানাবিধ সুগন্ধি-দ্রব্যে তাহার সেই সুন্দর দেহ সুমার্জ্জিত করিয়া, তাহাকে অন্য কক্ষে আনিয়া বিচিত্র বসন পরাইলেন। সেই মলিন সৌন্দর্য্য—এখন যেন মার্জ্জিত, পরিধৌত, পরিস্নাত হইয়া—রাজরাণীর সৌন্দর্য্যে দাঁড়াইল। তাঁহারও এক সুন্দরী কন্যা ছিল, কিন্তু এই—আগন্তুক অনাথিনীর বিশুদ্ধ সলিল পারস্নাত সুবিমল সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "আমার কন্যাকে সবাই অলোকসামান্যা সুন্দরী বলে—কিন্তু ইহার সহিত তুলনায় সে গৌরব যেন—একটু শিথিল হইয়া পড়িতেছে।"

নানাবিধ মুখরোচক—সুরসাল খাদ্য-সমূহ থরে থরে সম্মুখে সাজাইয়া দিয়া—তিনি সেই অনাথিনীকে সাদরে আসনে বসাইলেন; বলিলেন—"মা! আমার স্বামীর আদেশ—প্রত্যেক দিন একটী করিয়া অতিথি না খাওয়াইয়া আমরা জল গ্রহণ করিব না। তুমি যে কেবল আমাদের অতিথি, তা নও—আমার কন্যা। কোন সংকোচ করিও না—আহার কর।"

যত্নে—আদরে, বনের প্রমত্ত পশু শান্ত হয় তা মানুষ কোন ছার! সেই অনাথিনী ইচ্ছামত নানাবিধ সুপাচ্য চর্ব্য-চোষ্যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিল।

সেই গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী—স্নেহময় স্বরে বলিলেন—"মা! তোমার নামটী কি?"

সেই—অনাথিনী বিনাসঙ্কোচে উত্তর দিল—আমার নাম জুলিয়া।

উভয়ের মধ্যে নানা কথা চলিতেছে, এমন সময়ে এক অলোক সামান্যা সুন্দরী, সেই কক্ষে আসিয়া দেখা দিল। বোধ হইল—গৃহমধ্যে আবদ্ধ চাঁদিমার সহিত বিজলী নির্জ্জন আলাপ করিতে আসিয়াছে।

সেই অনাথিনীও সেইরূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া, মনে মনে

বলিল—"হাঁ দেখিবার মত রূপ বটে। আমি ত স্ত্রীলোক, কিন্তু এরূপ আমাকেই দুদণ্ড চাহিয়া দেখিতে হয়।"

হাস্য-প্রফুল্লমুখে—সেই বরবর্ণিনী তাঁহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা! ইনি কে!"

যেমন মেয়ে—তেমনি মা। মা—বলিলেন—ইনি একটু আগে আমাদের অতিথি ছিলেন, এখন আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা। মেহের! তা বলিয়া তুই যেন অভিমান করিস্‌নি! দ্যাখ দেখি এর কেমন সুন্দর রূপ।"

মেহেরও সাশ্চর্যে দেখিল—সত্যই সেই সুমার্জ্জিত রূপজ্যোতিঃ দেখিবার জিনিস্। আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু—আলুলায়িত কুঞ্চিত, সুকৃষ্ণ কেশদাম, উজ্জ্বল কৃষ্ণতারকাময় চক্ষু, সরল-হাস্য মুখরিত—রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধর। দেখিবার মত রূপই—বটে।

আজ আমিনা ভাবিল—যদি বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া কোন রমণীর মূর্ত্তি গড়িয়া থাকেন ত—সে এই মেহের-উন্নিসা। জগতকে তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ দেখাইবার জন্য বিধাতা যদি কোন রূপের উন্নত আদর্শ কল্পনা করিয়া থাকেন ত তাহা এই মেহের। বিধাতার নিজের তুলিকার সযত্নে চিত্রিত যে অফুরন্ত সৌন্দর্য্য—তাহা সামান্য মানুষে বর্ণনা করিতে পারে না।

মেহেরের জননী বলিলেন—"তুই তোর নূতন বহিনের সহিত আলাপ কর—আমি একটু সংসারের কাজ দেখি গে।" মেহের-জননী এই কথা বলিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মেহের আসিয়া জুলিয়ার পার্শ্বে বসিল। বোধ হইল—যেন বিজলী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া—আসিয়া, বাসন্তী পূর্ণিমার সুবিমল জ্যোৎস্নার সহিত মিলিত হইয়াছে। যেন সুবাসিত, বেলা—সেফালি—চামেলি—চম্পক—নাগকেশর প্রভৃতির মিশ্র পরিমল আসিয়া পারিজাতের

গন্ধের সহিত মিশিয়াছে। যেন ভৈরবীর প্রাণোন্মাদিনী মধুর কাকলীর সহিত—বেহাগের করুণ ও মৃদুগম্ভীর প্রতিধ্বনি আসিয়া মিলিয়াছে।

এইজন্য আমাদের দুর্ব্বল লেখনী, এরূপের যথাযথ চিত্র করিতে পারিবে না। সুনিপুণ চিত্রকর যদি কখনও উপযুক্ত উজ্জল বর্ণ-সমাবেশে এ শ্রেষ্ঠ রূপের সুচারু চিত্র, প্রকৃতভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহার আদর্শ দেখান কতক সম্ভব।

মেহের—স্নেহময় স্বরে বলিল—"হাঁ বোন্! তুমিই না ঐ মস্‌জিদের রোয়াকে বসিয়াছিলে।"

জুলিয়া—বলিল—"হাঁ। তা না হলে হয়ত তোমাদের পেতুম না!"

মেহের বলিল—আমি জানালার মধ্য হইতে সবই দেখিয়াছি। কিন্তু শত জনতার কারণ—কি তোমার এই রূপ!!"

জামিনা বলিল—"পোড়া রূপের মুখে ছাই! রূপ নয় বহিন্! আমি হাত গণিতে গিয়া, এক বিভ্রাট ঘটাইয়াছি!"

মেহের সবিস্ময়ে বলিল—"তুমি হাত গণিতেও পার নাকি?"

জুলিয়া! কতক কতক পারি। আমি এক পর্ব্বতবাসী সাধুর নিকট কিছু শিখিয়াছিলাম।

মেহের। তোমার দেশ কোথায় বহিন্।

জুলিয়া। সে সব কথায় আর কাজ কি দিদি!

মেহের। যদি তা বলতে তোমার কষ্ট হয়, আমি শুনতে চাইনে। তোমার বাপ মা নেই—না?

জুলিয়া। না—তাঁরা স্বর্গে গিয়াছেন—

মেহের। স্বামীও নেই

জুলিয়া। আমি অবিবাহিত।

মেহের। ভালই হইল। আমি একজন মনোমত সখী খুঁজিতে

ছিলাম। তোমার মত ভগ্নি পাইলাম। তা তুমি বলিতেছিলে হাত গুণিতে পার। আমার হাতটা একবার দেখনা ভাই।"

জুলিয়া। না বোন! আমায় মার্জ্জনা কর।

মেহের। কেন?

জুলিয়া। তোমাদের এত যত্ন এত স্নেহ! এ কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়।

মেহের। হাত দেখার সঙ্গে কৃতজ্ঞতার ঋণের কি সম্বন্ধ?

জুলিয়া। ইহাতে অনেক অপ্রিয় সত্য বলিতে হয়। সে সত্য অনেক সময়ে মনের কষ্ট আনে।

মেহের। হলেই বা—তাতে ক্ষতি কি? সত্য কথায় কোন দোষ নাই। তোমাকে আমার হাত দেখ্‌তেই হবে।

মেহের কোন মতেই জেদ্ ছাড়িল না। শেষে আমিনা অন্য উপায় না দেখিয়া, তাহার সেই চম্পক নিন্দিত হেনা-রঞ্জিত, সুকোমল অঙ্গুলি গুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সহাস্য মুখে বলিল—"বহিন্! তুমি রাজরাজেশ্বরী হইবে।"

মেহের অবজ্ঞার সহিত বলিয়া উঠিল,—"ইহা তোমার খোসামোদ করা কথা!"

জুলিয়া। একথায় একটু অপ্রতিভ হইল। একটু ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুণ্ণমনে বলিল—কেন? তুমি কি আমার কথায় অবিশ্বাস করিলে।"

মেহের। করিলাম বই, কি!

জুলিয়া। কেন?

মেহের। রাজা বল, আর সম্রাটই বল, এ হিন্দুস্থানের মালিক সেই আকবর-সাহ। রাজ-রাজেশ্বরী হইতে গেলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধু হইতে হইবে?

জুলিয়া। খোদার ইচ্ছা হইলে তাহাও কি অসম্ভব! আমি যদি

চ্চ কুলে জন্মিয়া আজ এ হীনাবস্থায় আসিতে পারি, তাহাহইলে তুমিও ক বিপরীত পথে গিয়া—রাজরাণী হইতে পার না!

মেহের। আকবর-সাহ যে প্রৌঢ় বয়সে—আবার মহিষী গ্রহণ করিবেন—ইহা অসম্ভব। তবে, আমায় যদি রাজরাজেশ্বরী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারীর সহিত আমার বিবাহ হওয়া চাই—তা সে পথে কাঁটা। এইজন্ত তোমার কথায় আমি হাসিয়াছি।

জুলিয়া। কেন?

মেহের। সাহাজাদা সেলিম—বিবাহিত। আমার মত, সামান্ত ওমরাহের কন্তার সঙ্গে. দিল্লীশ্বরের পুত্রের, হিন্দুস্থানের ভাবী—সম্রাটের বিবাহ হইতে পারে না।

জুলিয়া। খোদার ইচ্ছা হইলে সবই সম্ভব: সম্রাট ও খোদার সৃষ্টি—তুমিও তাই।

মেহের। না—না—বহিন্! যাহা অতি অসম্ভব, তাহাকে সম্ভব করিলে চলিবে কেন—ভাই? তুমি আবার আমার হাত দেখ।"

জুলিয়া এত কথা কাটা-কাটিতে যেন একটু বিরক্ত হইল। তাহার গননার গর্ব্বাভিমান যেন একটু অবনত হইয়া পড়িল। তবুও সে পুনরায় মেহেরের কুসুম-কোমল হাতখানি সযত্নে তুলিয়া লইয়া কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে মনোযোগে পর্য্যবেক্ষণের পর, গম্ভীরমুখে বলিল—"তোমায় বহিন্ বলিয়াছি। তুমি স্নেহের পাত্রী, কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি গণনা সম্বন্ধে জেদ্ করিয়া বড়ই অন্তায় করিলে—তোমায় এবার অপ্রিয় কথা শুনিতে হইবে। যে ভয় আমি করিতে-ছিলাম—তাহাই হইল।"

মেহের আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কেন কেন, একথা বলিতেছ কেন?"

জুলিয়া—একটু দৃঢ়স্বরে বলিল—"যদি আমি সৎগুরুর নিকট এ

শাস্ত্র সামান্যরূপও শিক্ষা করিয়া থাকে—যদি হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্র সত্য হয়, তাহা হইলে—যাহা দেখিলাম, তাহাতে তোমার রাজরাজেশ্বরী হওয়ার প্রথমে মহা অশুভ।

মেহের। কি অশুভ দেখিলে?

জুলিয়া। তোমার অকাল বৈধব্য—অনিবার্য্য।

মেহের। তবুও বলিতেছ আমি রাজরাজেশ্বরী হইব! দীনা-হীনা বিধবা—দিল্লীর তক্তে বসিবে!

জুলিয়া। হঁ।—আগে মহাযন্ত্রণা। নিরাশা মনকষ্ট—তার পর তোমার মহা সুখ।

মেহের। তোমার গণনাশাস্ত্র জাহান্নমে যাউক। তোমার জ্যোতিষ বিদ্যা অতল জলে নিমজ্জিত হউক। আমি কিছুতেই তোমার কথা বিশ্বাস করিব না—

জুলিয়া। ভাল তাহাই হউক। আমি যেরূপ যোগিনী! তাহাতে আমার শীঘ্র মৃত্যু হইবে না। কিন্তু ভগিনী! যদি কখনও কর্ম্ম ফলে আবদ্ধ হইয়া এই সব মহা দুঃখ ভোগ কর—একবার আমায় স্মরণ করিও। আমি যেখানে থাকি—তোমায় দেখা দিব।

মেহের উল নিসা—বিষণ্নমুখে বলিল—"ভাল।—তাহাই হইবে।—কিন্তু তুমি আমার জননীকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না। তুমি আল্লার নামে শপথ করিয়া আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর।"

জুলিয়া। "শপথ করিতে হইবে কেন? জানিয়ো বহিন্ আমার নীচ কুলে জন্ম নয়। যাহা তুমি নিষেধ করিতেছ—তাহা কখনই আমার মুখ হইতে ব্যক্ত হইবে না।"

মেহের সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া, বিষণ্নমনে অন্যত্রে গমন করিল। আর সেই দরিদ্র দেওয়ানা—বালিকা, একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সেই বিচিত্র কৌষেয় বসন সেইখানে সোফার উপর খুলিয়া

রাখিয়া, নিজের সেই মলিন বসন পরিধান করিল তারপর সে দেখিল, যে একটী কুলঙ্গীর মধ্যে লিখিবার উপকরণ রহিয়াছে। সে এক টুকরা কাগজে ক্ষিপ্র গতিতে লিখিল।—

"স্নেহময়ী মা! খোদা এ সুখের সংসারে আমার অদৃষ্টে অবিচ্ছিন্ন দুঃখই লিখিয়াছেন। যে দুঃখ আমার নিজের কর্ম্মফলার্জ্জিত, সাধ্য কি তোমাদের—যে তাহা হইতে আমায় রক্ষা কর। মাগো! তোমার এ স্নেহময় কক্ষে আমার স্থান নাই। আমায় অকৃতজ্ঞ ভাবিও না। বিদায় কালে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না, এজন্য আমার মহাপাপ হইল। জানিও—যদি একদিনও তোমাদের কোন সামান্য কার্য্যে লাগিতে পারি, বুঝিব—এ দেওয়ানা হতভাগিনীর জীবন সার্থক হইয়াছে।—"জুলিয়া"

পত্র খানি সহজে চখে পড়ে এই ভাবে শয্যার উপর রাখিয়া সেই বহুমূল্য বস্ত্রগুলি সযত্নে ভাঁজ করিয়া যথা স্থানে রাখিয়া, অভাগিনী জুলিয়া নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

আমিনা বিবি, সংসারের কাজ শেষ করিয়া আসিয়া দেখিলেন—কক্ষ শূন্য। মেহেরও নাই জুলিয়াও নাই। সহসা সেই পত্রের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পত্র পাঠে তিনি প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন। মেহেরকেও এসম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিলেন কিন্তু তাহার একটীরও সদুত্তর পাইলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মিনাবাজার।

সেকালে বাদসাহের রঙ্গ মহালের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে, প্রায়ই "মিনাবাজার" বলিয়া একটা আনন্দময় মহোৎসবের অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইত। আজকাল যাহাকে আমরা "ফান্সি ফেয়ার" বলিয়া জানি ইহা তাহারই পূর্ব্ব আদর্শ। তবে আজ কাল কারমিনাবাজারে

বিক্রেতা ও বিক্রয়িত্রী আমাদের বাজার জাত না তাহাদের অগণ্যস্থ জাতি আর সেকালের মিনাবাজারে ক্রেতা একমাত্র দিল্লীশ্বর ও তাঁহার সিংহাসনাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র। আর বিক্রয়িত্রী হইতেছেন আপনার মত আমীর ওমরাহ বর্গের সম্ভ্রান্ত ঘরণী আর সমগ্র রঙ্গমহালের রূপসী অধিবাসিনীগণ।

বাদসা-বেগম হইতে সামান্য বাঁদী পর্য্যন্ত এ বাজারে দোকান সাজাইয়া বসেন। তবে এ কথাটা ভালরূপে স্মরণ রাখা উচিত, এটা রূপের "সখের বাজার"। রাণীই হউন আর বাঁদীই হউক যাঁহার রূপ নাই এ বাজারে তাঁহার কোন পসারই নাই।

পাঠক পাঠিকা যেন এই বাজারকে "খোসরোজ" ও "নওরোজ" মহামেলার সঙ্গে যেন এক বলিয়া না ভাবেন। এ বাজারটা রঙ্গমহালের প্রহরীবেষ্টিত প্রাঙ্গণ মধ্যেই প্রায়ই হইত। বাদসাহের বা বাদসা-বেগমের ইচ্ছায় এই মহামেলার অনুষ্ঠান।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা যে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া গিয়াছি, তাহার ঠিক এক সপ্তাহ পরে, এই "মীনাবাজারের" অনুষ্ঠান হইয়াছে। ক্রয় বিক্রয়ের সময়—মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত।

রূপসী রমণীগণ, রূপ লইয়া আর স্বহস্ত নির্ম্মিত সুন্দর শিল্পকলা লইয়া, সেই রূপের হাটে শোভার ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখেই তাঁহাদের স্বহস্ত প্রস্তুত শিল্প সম্ভূত দ্রব্য-সম্ভার, মার্জ্জিত বহুমূল্য আস্তরণের উপর সেই সমস্ত পণ্যদ্রব্য থরে থরে সজ্জিত।

ভীমকায় তাতারীগণ পরিবেষ্টিত রঙ্গমহালের শোভা প্রাঙ্গণের শোভা বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। তবে যখন আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছি, তখন ভালই হউক আর মন্দই হউক, কিছু বলিতে হইবে।

লোহিত-কঙ্করাবৃত নাতি প্রশস্ত, নাতি দীর্ঘ পথ, প্রাঙ্গণের

চারিদিকেই চলিয়া গিয়াছে। সেই পথের দুইধারে নধর শ্যামল তৃণ-পূর্ণ সুন্দর ক্ষেত্র। ইহার উপর সুন্দরীগণের মেলা। সেই সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যদেশ দিয়া স্বর্ণময় স্ব কারুকার্য্য খচিত, সুদীর্ঘ সুশোভিত পথে মখমল বিছান হইয়াছে। এই পাদবস্ত্র কেবল বাদসা সাহজাদা বাদসাবেগম, ও রাজকুলমহিলাগণের বিচরণের জন্য। শ্যামলতৃণ সম্পাদময়ী ক্ষেত্রের আশে পাশে মর্ম্মরবেদী। আর তিন চারটী প্রস্তরবেদীর উপর কৃত্রিম প্রস্রবণ সেই সমস্ত প্রস্রবণ হইতে রৌপ্যময়-মুখ নল মধ্যদিয়া সহস্রধারে সুবাসিত গোলাপ-জলের স্নিগ্ধ উৎস নিঃসারিত হইতেছে।

চারিদিকেই ফল-ভারাবনত সুন্দর দর্শন আঙ্গুর বৃক্ষ! বেদানা বৃক্ষ। মধ্যে মধ্যে নিম্নক্ষেত্রে জাতি, যূথী, চম্পক, বেলা, গন্ধরাজ নাগকেশর, পুষ্পরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষরাজি। একদিকে যেমন গোলাপের মনোহর সুগন্ধ, আবার অন্যদিকে সেইরূপ সদ্য-প্রস্ফুটিত বিভিন্ন কুসুমরাশির মনোহর মিশ্র সুবাস সেই প্রশস্ত পথবীথিময় চত্বরে নাই বা কি! নানা স্থানে রৌপ্য-পিঞ্জরে স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ, শুক শারী ময়না কোথাও বা রজত-ময় দাঁড়ে হীরক শৃঙ্খলে আবদ্ধ সুশিক্ষিত ভীমরাজ, কাকাতুয়া, শ্যামকেশর, নীলকণ্ঠ, প্রভৃতি পক্ষী-সকল তাহাদের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর কাকলী, গোলাপের ফোয়ারা—সুগন্ধ নিশ্বাস প্রস্ফুটিত প্রসুনরাজির সুগন্ধ রমণীয় দ্রুতগতি সঞ্জাত মৃদু গম্ভীর ভূষণ সিঞ্জন আর বড়জ খাবজ, পঞ্চমে পুরিত পক্ষী কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত একত্রে মিশিয়া সেই স্থানকে বেহস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

নাট্য-মন্দির

[বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।]

দ্বিতীয় বর্ষ। } ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১৮। } ২য়, ৩য় সংখ্যা।
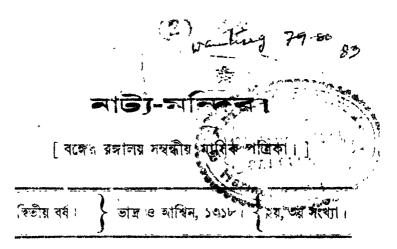
শান্তি-নিকেতন।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

চাহিনা নূতন কিছু যা আছে আমার ওগো,
তাই যেন রয়।
নির্জ্জন কুটীর খানি প্রাসাদ বলিয়ে মানি,
সুখ শান্তিময়।
নাহি দুঃখ নাহি ব্যথা বিমল আনন্দ হেথা,
মিছে আশা, ভালবাসা নাহি তার ঠাঁই!
পিপাসা জীবননাশা, নাহি প্রেম মৃগ-তৃষা,
তুমি কি জানিবে আমি কত সুখ পাই?
জীর্ণ পুরাতন তবু অমর নিবাস সম
এ পর্ণ-আশ্রয়।
প্রকৃতি-প্রণয়-ক্ষেত্রে, হেরি সেথা অহোরাত্র
প্রেম-অভিনয়।

নিকুঞ্জকানন মরি মনোমোহন ছবি ধরি,

কি আমোদ সুধারাশি করে বরিষণ।

মুকুলিতা কুঞ্জলতা, হেলে দুলে কহে কথা,

বসন্ত পবনে নাচে সোহাগে কেমন!!

কুহরে কপোত সুখে তরুশাখে বসি ওই

কপোতীর সনে।

পিকরাণী প্রাণপতি জাগায়ে মদনরতি

গায় ফুল্লমনে।

গুঞ্জরে ভ্রমর দল চাহে বুঝি পরিমল,

[illegible] তোষে কত প্রেম আলাপনে।

নির্মল গগনে শশী হাসে সুধাময় হাসি,

জগতে কে দোষে? তার মোহিত কিরণে॥

[illegible] সুখে আছি বিভোর আপনভাবে

এই শান্তিধামে।

সংসারের কোলাহলে রাখিয়া সুদূরে ফেলে

রয়েছি আরামে।

চারু সাজসজ্জা করি মোহন ভূষণ পরি,

কি [illegible] করিছ নারি! সম্মুখে আমার?

[illegible] নাহি কো সাধ, ব্যর্থ তব রূপ ফাঁদ,

[illegible] কুহক জাল করেছ বিস্তার!!

ক্ষ[illegible] সাগর মাঝ ধনরত্নরাশি কত

এনেছ প্রচুর!

শান্তি-সুখ [illegible]লয়ে কিবা ফল বল লয়ে

কোটী কোহিনুর?

ল পারিত না,—ইহার দরুণ প্রথমতঃ দুর্ব্বাক্য—তার পর ঠোনাটা সুটাও চলিল। একজন মেয়ে রাঁধুনী ছিল, বিবাহের মাস ছয় পরে বাড়ী যায়,—শরতের মা ভাবিলেন, আর রাঁধুনি রাখা প্রয়োজন ই, বউকে হাঁড়ী ঠেলিতে দিলেন। দাসীর কাজ; রাঁধুনীর কাজ— জয়ই এখন বউএর উপর। তারপর দুপুরের সময় শরতের মা শুইয়া ধন একটু আলিস্যি রাখিতেন, সকাল হইতে বকিয়া বকিয়া চারিটা াত খাইয়া, যখন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেন, তখন বউকে াকাচুল বাছতে হইত, পা টিপিতে হইত। একে তো বউএর রান্নার দৌরাত্মিতে অরুচি হইয়াছিল. ভাল খেতে পারেন না, তার উপর ভাল া টিপিতেও বউ পারে না—এ সমস্ত বজ্জাতি মাত্র। বুড়ো হাতা মেয়ে —পা টিপিতে পারিবে না কেন? তবে বজ্জাতির তো ওষুদ আছে। পা টিপিবার সময় আর বকা ঝকি বড় করিতেন না;—এক আধটা লাথি টাথি দিতেন। বউএর ভাত খাওয়ার সময় বিশেষ তদন্ত করিতেন,—পাছে বেশী খাইয়া পেটের অসুখ হয়। পাড়াশুদ্ধ লোক জানে বউটা হাঁড়ী থাকি। এ অবস্থায় বালিকা দিন দিন শীর্ণা হইতে লাগিল। অবশ্য সেও তার বজ্জাতি। তেমন তেমন খাশুড়ি হইলে মুখটা উনোনের মধ্যে গুঁজড়িয়া ধরিয়া বজ্জাতি ভাঙ্গিতে পারিত, তিনি কেবল দয়াগুণে সেরূপ ব্যাবহার করেন না। শরৎ দিবারাত্র শুনিতেন যে, পৃথিবীর যত দোষ আছে—সে সমস্ত দোষের আধার— এই বৌ। মরেও না—যে শরতের এবার বে দিয়ে মনের মত বউ ঘরে আনেন। শরতের ও বউয়ের উপর বড় ঘেন্না। মলিনবসন, শীর্ণ মলিন কান্তি!—চুলে কখনও চিরুণী পড়ে না। শরতের কাজেই স্ত্রীপ্রতি বিশেষ বীতরাগ জন্মিল। এক বিছানায় তাহার সহিত শুইতে ঘৃণা জন্মিত। এইরূপে এক বৎসর গত হইল।

শরতের মার বিশেষ খেদ যে, পোড়া যম অন্ধ হইয়া এ বউএর ঘাড়

ডাকে না। যমের এই জ্বালাতনে বিরক্ত হইয়া একদিন পুরোন হাঁড়ি ভাঙ্গার উপলক্ষে বউকে ধাক্কা মারেন. একখানা শীলের উপর পড়িয়া গিয়া বধূর বুকে আঘাত লাগে ;—পূর্ব্বদিনে একটু জ্বরও হইয়াছিল, তাহার দরুণ উপবাস গিয়াছে,—বউটী পড়িয়া মূর্চ্ছা গেল। বউটী ওঠেনা,—পা দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া দেখেন,—"ওমা মলো নাকি ? শেষটা কি হাতে হাত-কড়ি দেবে। এমন পোড়া বউও ঘরে এনে ছিলুম।" চীৎকারে পাড়ার লোক জড় হইয়া গেল। হাতে মুখে একটু জল দেওয়াতে,—বউটীর চেতন হইল বটে, কিন্তু ভারি জ্বর আসিল।

লোকমুখে বউএর বাপ সমস্ত কথা শুনিলেন ; এতদিন ভাবিতেন যে, জোর করিয়া মেয়েটীকে বাড়ীতে আনিলে মেয়েটী স্বামী সুখে বঞ্চিতা হইতে পারে। কিন্তু অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার পর মারের কথায় আর ধৈর্য্য রহিল না, ভাবিলেন— বিধবাও তো হয়। স্বয়ং মেয়ে আনিবার জন্য জামাই বাড়ী গেলেন। বেয়ানঠাকুরুণ যথোচিত তিরস্কার করিলেন, কিন্তু বউএর বাপ দু'একটী কথার যেরূপ উত্তর করিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদ্‌কম্প হইল। বউএর বাপ বলিল যে, তুমি লাথি মারিয়া মেয়ের এই দশা করিয়াছ। আমি পুলিশে জানাইয়া রাখিতেছি। যদি মারা যায়,—খুনের দাবি আনিব। বেয়ানঠাকুরুণের বাক্‌রোধ হইল। ভাবিলেন—বউ বিদেয় করাই বিধেয়। বেয়াই ও বউ বিদায় হইলে পর, শরতের মার ঝঙ্কার উঠিল। কাঁদিয়া গালে মুখে চড়াইয়া শরৎকে বলিল,—"এ বউকে তুই মা বলিয়া ত্যাগ কর্।" কিন্তু শরৎ তাহা করিল না। ক্রমে শরৎও বুঝিয়াছিল যে, বউএর কোন দোষ নাই। প্রতিবেশী সমবয়স্কের দ্বারা শরৎ তিরস্কৃত হইত। কিন্তু যদিও স্ত্রীকে দেখিতে পারিত না, তথাপি স্ত্রীকে ওরূপ কঠিন ও কুৎসিৎ সম্বোধন করিতে স্বীকার পাইল না।

শরতের মা আবার শরতের বিবাহ দিলেন। এবার সুন্দরী মেয়ে। কেবল মেয়েটী দেখিয়াই বউ ঘরে আনিয়াছে। মেয়েরও বয়স হইয়াছিল—প্রায় বার; অর্থাভাবে তাহার বাপ বিবাহ দিতে পারে নাই। ভাবিয়াছিল দোজ পক্ষে কোনও বুড়ো বরের সহিত বিবাহ দিবে। শরৎ ভাল ছেলে, কম বয়স,—এই নিমিত্ত সতীনের উপর তবু বিবাহ দিলেন। বউএর নাম কুমুদিনী। এদিকে শরতের মা আহ্লাদ করিয়া পাড়া প্রতিবেশীকে বলিতে লাগিলেন,—"আমার যেমন শরৎ, তেমনি কুমুদিনি।—ওমা,—এতদিন বাছাকে যেন পেত্নিতে পেয়েছিল।

কুমুদিনী যখন ঘর করিতে আসিল, শাশুড়ী দু একটা গৃহকর্ম্ম করিতে বলিতেন কিন্তু কুমুদিনী সে পাত্রী নয়। বাসন ত মাজিবেই না, কর্ম্মের মধ্যে আপনার পান সাজা ও স্বামীর পান সাজা, তাহা ছাড়া কোন কর্ম্ম করিতে বলিলে কামড়াইতে আসিত। সতীনটী যেমন ছিল, না—সেমন্ত, তাহাকে খাবার সময় জায়গা করিয়া দিত—দু'একটা পানও তাহার অদৃষ্টে যুটিত। একটু কড়া কথা বলিলেই সাত গুণ তর্জ্জন করিয়া বলিত "যে মাগী আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দে,—তোর বাড়ী বাঁদী-গিরী করতে এসেছি ?" এ কথা শরৎকে বলিলে—শরৎ বলিত,—"তা আমি কি করিব—দাও বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

কুমুদিনীর বাপ কামাখ্যানাথ মাঝে মাঝে মেয়েটিকে দেখিতে আসিত। যদি শরতের মা কিছু বলিত যে কুমুদিনী অবাধ্য,—কামাখ্যানাথ উত্তর করিত,—"পাগলী—চিরদিনই পাগলি।" বেন-ঠাকরুণ বেশী বলিতে পারিতেন না। তিনি নিন্দা করিয়াছেন, এ কথা যদি কুমুদিনী শোনে, তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা নাই। বউটিও বড় চঞ্চল; শরৎ স্কুল ছাড়িয়া পাটের কলের দালালি করে, তাহাতে কিছু অর্থ পাইয়া, নিজে পাটের কাজ করিয়া কাজ খুব

ফলাও করিয়াছে। দাস দাসীর অভাব নাই। এখন আর খাশুড়ী বউ একরকম দেখা সাক্ষাৎ নাই, বলিলেই হয়। খাশুড়ীও ভয়ে ভয়ে বউএর মন যোগাইয়া চলেন।

শরৎ তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীকে ভোলেন নাই। প্রথম প্রথম যাকে লুকাইয়া কিশোরীর কাছে যাইতেন। ক্রমে তিনি যে পূর্ব্ব শ্বশুর বাড়ীতে গমনাগমন করেন, তাহা প্রকাশ হইল। দিন কতক কুমুদিনী ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝি করিয়াছিলেন, কিন্তু শরৎ দৃঢ় বাক্যে বলিয়াছিলেন যে, তুমি যদি কিশোরীর কাছে যাইতে নিষেধ কর, তাহা হইলে আমি তোমার ঘরে আসিব না। কুমুদিনীকে এ কথায় নিরস্ত হইতে হয়।

কিশোরীর একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। নাম বিহারী লাল,—বিহারীলাল স্কুলের একটী রত্ন। বিহারী যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সেইরূপ সচ্চরিত্র। মাতৃ শিক্ষায় অতি দয়াবান হৃদয়। শরতের ছোট ভাই বসন্তর একান্ত ইচ্ছা যে, ভাইপোটীকে বাড়ীতে রাখে,—কিন্তু শরৎ তাহাতে কোনও প্রকারে সম্মত নন। বসন্ত দাদার সহিত পাটের কাজ করেন এতদ্ব্যতীত রেলওয়ের কণ্ট্রাক্‌টারীতেও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে; কারবার দাদার নামেই আছে। বসন্ত খুব যোগ্য, কিন্তু দাদা যা বলেন তাই।

এই সময়ে নাগপুরে একটা রেলওয়ে হইবার কথা উঠে। সেই রেলওয়ে রাস্তা নির্ম্মাণের কণ্ট্রাক্ট বসন্তকুমার [illegible] করেন। নাগপুরে যাইবার সময় কুমুদিনীর গর্ভে একটী সন্ত[illegible] নাম করণ হয় নাই, কুমুদিনী পিতৃগৃহে প্রসব হন. [illegible] শরৎচন্দ্রের। পিতৃ গৃহে প্রসব হইবার কারণ [illegible] করিতেন না, খাশুড়ী যদিও বউএর খোসাম[illegible] গ্রাহ্য করিত না; বসন্তের পরিবারও তেমন বয়স্থ, [illegible] তাই প্রথম

পোয়াতি যার কাছে প্রসব হইতে যান। অধিক বয়সে সন্তান হইলে প্রায়ই পোয়াতির একটা দারুণ পীড়া হয়। পিতৃগৃহেও কুমুদিনীর বিশেষ পীড়া হইল। শরৎচন্দ্রের অর্থের অভাব নাই। চিকিৎসা প্রভাবে আরোগ্য লাভ করিলেন, তথনও সম্পূর্ণ সারে নাই।

তাহার আরোগ্যলাভের পরেই শরতের বড় পীড়া জন্মিল, তারে বসন্তর নিকট খবর গেল। বসন্ত আসিয়া দেখিলেন,—দাদার সাঙ্ঘাতিক অবস্থা; সকলে দাদার নিকট হইতে একটা উইল করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু বসন্ত সম্মত হইল না। বসন্ত বলেন, উইল না করিয়া দাদা যদি দু'দিন বাঁচেন, উইল করিয়া আর দু'দিন বাঁচিবেন না। যে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন, তিনি একজন শরতের বন্ধু। তিনি কিন্তু উইলের পরামর্শ দেন। তিনি নিজেই উইলের কথা বলেন, তাঁহার কথা শুনিয়া শরৎ বলিল,—"আগে বল নাই, আমার এখন আর সময় নাই। কিন্তু যে যে সব আছে তাহাদের সকলকে ডাক।" আমরা বন্ধু বান্ধব অনেকেই ছিল। মৃদুস্বরে সকলকে ডাকাইয়া বলিলেন,—আমার বিষয় আশয় কারবারে বসন্ত অর্দ্ধেক অংশী, এ তোমরা সকলেই জান,—তাঁহার প্রধান আমলাদের বলিলেন, এই দুই ছত্র শীল-লেখ, লেখা হইল, শরৎ সই করিল, কিন্তু সাক্ষীদের সই করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইল। সাক্ষীদের আর সই হইল না।

কুমুদিনীর পিতা কামাখ্যানাথ এ অবস্থায় কন্যার পীড়া বাড়িতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া শরতের রোগের সংবাদ কুমুদিনীকে দেন নাই। সুতরাং কুমুদিনী স্বামীকে দেখিতে যান নাই, কিন্তু ক্রমে মৃত্যু সংবাদ দিতে হইল। ঘাটকামানের দিন যদিও একত্রে ঘাটকামান করিতে হয়, তথাপি কামাখ্যানাথ কন্যাকে পাঠাইলেন না। বসন্ত আসিয়া বিস্তর সাধাসাধি করিয়াছিল, একত্রে ঘাট কামান না হইলে বসন্তের মার ধারণা

অকল্যাণ হয়। তথায় কোনরূপ ক্লেশ হইবে না; যত দূর যত্ন করা সম্ভব তাহা হইবে। কিন্তু কন্যা-বৎসল কামাখ্যানাথ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কোন রকমে তিল-কাঞ্চনে শ্রাদ্ধ করাইয়া কন্যাকে শুদ্ধ করাইলেন।

জামাতার শোক কামাখ্যানাথের বড় লাগিল। তিনি মৎস্য ত্যাগ করিলেন, পরিবারের সহিত আহারের সময় বা দেখা, একত্রে শয়ন নাই। দিবা রাত্রি চিন্তায় মগ্ন। কুমুদিনী মনে করিলেন,—পিতা বা বুঝি ভাবিয়া পাগল হন। কখনও কখনও পিতাকে বুঝান যে আমার অদৃষ্টে যা ছিল, হইয়াছে। বাবা, তুমি কি ভাবিয়া সংসার ভাসাইয়া দিবে? পাওনাদারেরা (কামাখ্যানাথের বিস্তর পাওনাদার ছিল), তাহার শোকাচ্ছন্ন অবস্থা দেখিয়াই হউক বা অপর কিছু বুঝিয়াই হউক, দিনকতক তাগাদায় নিরস্ত ছিল। শোকাচ্ছন্ন পিতা যদিচ অপর কোনও বিষয়কর্ম্ম করিতেন না, কিন্তু কন্যার জন্য বসন্তর কাছে যাইতে বাধা হইতেন। উইলে সহি করিয়া শরৎ মরিয়াছে, মৃত্যুর আগে সাক্ষীদের সহি হয় নাই, লোকপরম্পরায় এই কথা শুনিতে পাইলেন। কারবার শরতের নামেই, বসন্তর নামে নহে—তাহাও শুনিতে পাইলেন। বন্ধুদের পরামর্শে বুঝিলেন যে উইল জাল। সকলকেই "ঐ উইল জাল—ঐ উইল জাল" বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু বসন্তর সম্পত্তি না হইলেও কুমুদিনীর সন্তানপোষ তো অর্দ্ধেক বটে। তাই বা কেন? কুমুদিনীর সন্তানকে তো শরৎ বহুদিন ত্যাগ করিয়াছিল। ছেলে—তা কিরূপ ছেলে তা কে জানে! এরূপ পরামর্শদাতা উকীলের অভাব নাই ও এষ্টেটের মোকর্দ্দমা বিনা খরচে চালাইবারও উকীল বিস্তর; উইল আপত্তি করিয়া মোকর্দ্দমা উঠিল। অবশ্য কুমুদিনীর গহনাগুলি মোকর্দ্দমায় ব্যয় হইল। কিন্তু শরতের সম্পত্তির অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকাংশ ব্যতীত কুমুদিনীর ভাগে বিচারে আর

কিছু ধার্য্য হইল না। এক মেয়ে হইতেই তা'র সর্ব্বনাশ হইল। তবে মেয়ে ত্যাগ করিবার নয়, তিনি সজ্জন,—তাই মেয়ে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যদিচ এখন আর তাঁর দেনা নাই, পাওনাদার আর আনাগোনা করে না, বন্ধকী বাড়ীখানি খালাস করিয়াছেন,—আর কিছু কিছু সম্পত্তিও খরিদ করিয়াছেন, তথাপি কুমুদিনী ও কুমুদিনীর পুত্রের ভরণপোষণ দিনদিন তাহার বড়ই ভার বোধ হইতে লাগিল। যদিও দুর্জ্জনেরা বলিত বটে যে, তাঁহার সমস্তই মেয়ের সম্পত্তিতে হইয়াছে। কিন্তু বলিলে কি হয়,—মোকর্দ্দমার ব্যয়ে তাহার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে!

এদিকে বসন্তের দিন দিন বোল বোলাও বাড়িতে লাগিল। ভ্রাতুষ্পুত্র বিহারীও যোগ্য। বিহারী ও বিহারীর মা বসন্তের সংসারেই আছে। বিষয় ভাগ করিয়া দেয় নাই। বিহারী মাঝে মাঝে খুড়াকে বলে, "কাকাবাবু,—শুন্‌তে পাই, হরিদাস (বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম হরিদাস) বড় অযত্নে আছে ও মানুষ হইতেছে না। ছোটমাকে বাড়ীতে আনিলে হয় না?" সে কথায় বসন্ত বিরক্ত হন। বসন্তর মাও বলেন, "ভাখ বসন্ত! তুই যদি ছোট বৌকে ঘরে আনিস্, তাহলে তোর হাতে পিণ্ড নেব না।" বুড়ার এখন বড়বৌ অন্ত প্রাণ। বড়বৌও এখন পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করেন।

এদিকে দিন দিন কুমুদিনীর বড়ই দুরবস্থা হইতে লাগিল। ছেলেটী স্কুলে যায় না। বদ্‌সঙ্গে মিশিয়া দুশ্চরিত্র হইতে লাগিল। পেটের জ্বালায় এটা ওটা চুরি করিয়া খায়। দিদিমা একটু যত্ন আত্তি করিত, তাহারও পরলোক হইয়াছে। একদিন সে মামার বাক্স হইতে দুইটা টাকা চুরী করায় যথেষ্ট মার খায়। আর ঠাকুরদাদার হুকুম হয় যে, উহাকে আর বাড়ীতে আসিতে দেওয়া নয়। তিনদিন বালক রাস্তায়

রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। কুমুদিনী কাঁদাকাটী করাতে পিতা কর্ত্তৃক এরূপ তিরস্কৃত হইলেন যে, পিত্রালয়ে থাকা আর সম্ভববোধ হইল না। কিন্তু কোথায় যাবে? আগের দিন ছেলেটীর আহার জোটে নাই, কুমুদিনী রান্না ঘরে আহারে বসিয়াছেন এমন সময় রাস্তা হইতে ছেলেটী বলিল যে, মা কাল হইতে আমি কিছু খাইতে পাই নাই, - খিড়কি দোর হতে পুত্রকে আপনার ভাত দিলেন। এ সংবাদ কুমুদিনীর পিতা পাইল। আর রক্ষা কি?—বেরো বেরো আমার বাড়ী থেকে বেরো। কুমুদিনার অসহ্য হওয়ায়, ভিক্ষা করিয়া খাইব ভাবিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল। পিতা তর্জ্জন করুন—কন্যাসন্তান অপেক্ষা বিপদ নাই বলিয়া বক্তৃতা করিতে থাকুন, এদিকে নিরাশ্রয়া কুমুদিনী ছেলেটীকে লইয়া রাজপথে চলিল। একটী বাড়ী দেখিয়া মনে পড়িল, এটী তাহার মাতুলালয়। মামা নাই, মামাতো ভাই নাই, মামাতো ভায়ের একটী ছেলে আছে যাই হউক, এখানে একদিনের নিমিত্ত আশ্রয় এই। মামাতো ভায়ের স্ত্রীর নিকট পরিচয় দিয়া বসিল, তাহারা দুঃখী, দিন আনে দিন খায়। সপুত্র কুমুদিনীকে তাহারা আশ্রয় দিতে পারে না। বউটী আপনার অবস্থার কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। সে বাড়ীতে কুমুদিনীর স্থান নাই,---কুমুদিনী বুঝিল। তবে আর একজন পড়সির রাঁধুণীর দরকার—যদি রাঁধুণীবৃত্তি স্বীকার করে, তবে তথায় স্থান পাইলে পাইতে পারে। তবে ছেলের উপায়? যদি ছেলেটা ফাই ফরমাস খাটে, আর মা-বেটায় পেটভাতায় থাকে, তাহা হইলে অন্নের সংস্থান হইতে পারে। কুমুদিনী তাহাই [illegible] করিল।

একমাস এইরূপে যায়। বাড়ীর কর্ত্রী সেকেলে [illegible] কুমুদিনীর অবস্থার সমস্ত পরিচয় পাইল। পরিচয় পা[illegible] করিল,—"হ্যাঁমা, তোমার শ্বশুরবাড়ীর কি কেউ কোথাও নাই?"

কুমুদিনী বলিল,—"না, আমি তাহাদের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে তাহারা আর স্থান দিবে কি? থাকিবে না কেন—আমার দেবর আছে, সতীন, সতীনপো আছে, খাশুড়ী আছেন, কিন্তু কোন-মুখে আর সেখানে যাইব।" গিন্নি উত্তর করিল—"যেরূপ ব্যবহারই করিয়া থাক, তোমার দেবর ও সতীনপো তোমায় কখনই ত্যাগ করিতে পারিবে না। এখানে রাঁধুণীবৃত্তি করিতে আসিয়াছ, না হয় সেইখানেই রাঁধুণীবৃত্তি করিবে। যে অবস্থায় আছ অন্ততঃ ইহা অপেক্ষা তোমার মন্দ অবস্থা হইবে না।"

এদিকে বিহারীলাল ও বসন্তকুমার কুমুদিনীকে যে তার বাপ তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা শুনিল। কিন্তু কোথায় তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহার সন্ধান জানে না। লোক নিযুক্ত করিয়া অনুসন্ধান করেন,— কোন সংবাদ নাই। লোকের নিকট মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারেন না। বড়ভাজ যতদূর পরের পরামর্শে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, সকলই ভুলিয়া গিয়াছে কিরূপে আপনার ঘরে আনিবেন এই জন্য ব্যতিব্যস্ত। একদিন বাড়ী আসিয়া বিহারীলাল দেখিল যে একটী স্ত্রীলোক ও একটী বালক বাটীর ভিতর বসিয়া আছে ও তাহার ঠাকুরমা যা মুখে আসে বলিতেছেন। বিহারীলালের মাও সেখানে আছে বিহারী যাইবামাত্র বিহারীর মা বলিল, "এই তোর ছোটমা প্রণাম কর। আর এই তোর ভাই।" বিহারীলাল প্রণাম করিল। তখন ঠাকুমা বুড়ী তিরস্কার করিতেছে। বিহারী বলিল,—"ঠাকুমা যদি তুমি ছোটমাকে আদর করিয়া না ঘরে লও, তাহা হইলে আমি দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া যাইব।" বুড়ি বিহারীকে স্নেহ করিত— নিরস্ত হইল। এমন সময় বসন্ত বাড়ী আসিল। ব্যগ্রভাবে বিহারী বলিল,—"কাকাবাবু! কাকাবাবু! ছোটমা আসিয়াছেন আর এই হরে।" বসন্ত বড় ভাজকে নমস্কার করিয়া হরেকে কোলে করিয়া

তুলিয়া লইলেন। তখন কুমুদিনীর বাল্যকালের একটী কথা মনে পড়িল। কথাটী মা শিখাইয়াছিলেন, কুমুদিনী এখন তা বুঝিলেন,—

"দেইজীর ভাত হউক সতীনের পো হউক।"

দান।

(শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী লিখিত।)

শত গ্রন্থি বিশিষ্ট জীর্ণবস্ত্র পরিধানা এক ভিখারিণী, মলিনমুখে, যুক্ত করে, বিচিত্র বাবুকে জানাইল, যে তিন দিবস কাল তাহার উদরে অন্নের দানা প্রবেশ করে নাই। ভিখারিণীর মুখ হইতে আর কোনো কথা নিঃসৃত হইল না। কি জানি, কি মর্ম্মান্তিক দুঃখে তাহার নেত্র যুগল জলভারাক্রান্ত হইল। ভিখারিণী অশ্রু সংবরণের বিশেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার বিপরীত ফল ফলিল। নয়নজলে অনাথিনীর বসন ভিজিয়া গেল।

বিচিত্র বাবু একবার বেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলেন — দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। তিনি ভাবিলেন, এ' সময়ে দান করিয়া ফল কি? দানের কথা যদি কেহ না জানিল, না শুনিল, তবে দান করিয়া কোনো লাভ নাই। দুন্দুভি নিনাদ না হইলে দান করিয়া কি ফল!

সুতরাং তিনি গাম্ভীর্য্যটাকে বিশেষভাবে আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভিখারিণীকে বলিলেন, "খাটবি, খাবি, মাগি- —ভিক্ষা কিসের? অপাত্রে দান করিয়া আমি আলস্যের প্রশ্রয় দিতে পারিনা।" অভাগিনী গভীর মনোদুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেস্থান ত্যাগ করিল। ধন-কুবের বিচিত্র বাবু জুড়ী হাঁকাইয়া আপনার গন্তব্য স্থানে চলিয়া

কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া সমাজে পরিচিত হয়। অতীত কালে অতিথি, অতিথি-সৎকারে তুষ্ট হইলে, গৃহস্থের আর আনন্দ ধরিত না, গৌরবের আর সীমা থাকিত না; এখন তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষাজীবির দল"বাবুর" বাটীর "ভোজপুরিয়া" দ্বারবানের সর্ষপ তৈলসিক্ত বংশখণ্ডের অপরূপ আস্বাদ গ্রহণান্তর চীৎকার শব্দে মর্ম্মবেদনা বিঘোষিত করিলে, বাবুর দল সাতিশয় কৌতুক অনুভব করে। যুগধর্ম্মে কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন!

তবে দান যে এ কালে একবারেই নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। বিচিত্র বাবু ভিক্ষুকের প্রতি "নেকনজর" না হইতে পারেন —কিন্তু কোনো dinner উপলক্ষে অযাচিত ভাবে পাঁচশত টাকা দান করিয়া থাকেন। রামধন ভট্টাচার্য্য কন্যাদায়ে পড়িয়া, শ্যামধন সরকার মাতৃদায়ে পড়িয়া, হারাধন দাস পেটের দায়ে পড়িয়া বিচিত্র বাবুর নিকটে তিন সপ্তাহ কাল খোসামোদ করিয়াও একটী তাম্রখণ্ডও আদায় করিতে পারেন নাই, কিন্তু—স্মৃতি রক্ষার্থে এক কথায় তিনি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হন না। তারাপদ ঘোড়, সুতীবস্ত্র বিক্রয় বাবদ ১২।৶৴ এর জন্য, ১৩।৴৹ ট্রাম ভাড়া দিয়া, চৌবেজির তোষামোদ করিয়া, সরকার গোমস্তার পদলেহন করিয়া খানসামা বাবুর শ্রীচরণে সর্ষপতৈল মাখাইয়া পাওনা আদায় করিতে পারে নাই; আদালতে ছুটাছুটী করিয়া, ছেঁড়া উকীল মোক্তারের ল্যাজ ধরিয়া, টাকাটার "সুরাহা" করিতে হয়; কিন্তু উদারচেতা বিচিত্র বাবু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কল্পে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা অকাতরে ঢালিয়া-দিতে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত।

এইরূপ কেহ "নামকা ওয়াস্তে," কেহ "আপ্‌কা ওয়াস্তে," কেহবা "পেটকা ওয়াস্তে" যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনের মূল্য ব্যয় করিয়া থাকেন ও করিতে বাধ্য। অতএব দেখা যাইতেছে—দাতার দান এখনো ন্যূন হয় নাই। তবে তাহা পাত্র ভেদে

অধুনা আর এক প্রকার অভিনব দাতা বাবুর দলের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা মার্জ্জিত বলিয়া পরিচিত। কারণ, তাহারা ইংরেজী ভাষায় সুন্দর রূপে কথা কহিতে পারে, সুন্দর অঙ্গভঙ্গী করিতে পারে, সুন্দর ভাবে দন্ত বিকাশ করিতে সক্ষম। তাহারা noble profession দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে, কমিশনারী পদপ্রার্থী হয়, হাকিমী করিবার স্পর্দ্ধা রাখে; তাহারা changeএ যাইয়া delicate health অর্দ্ধাঙ্গিনীরজন্য বন্য কুক্কুটের "ষ্টু" প্রস্তুত করাইয়া—civilization, education, liberal views এর বড়াই করে; London cockneyর মত নাক সিঁটকাইয়া; তেড়া হ্যাট্ মাথায় দিয়া cigar মুখে দিয়া সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হয়, অবসর বুঝিয়া "বড়লোকের" গায়ে পড়িয়া friendship করে।

এই জাতীয় দাতা শিশুভ্রাতাদিগকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া, আপন "কোলেই" সমস্ত "ঝোলটুকু টানিয়া" বসিয়া আছেন; কিন্তু লোক সমাজে বলিয়া বেড়ান, তাঁহারই প্রাণপাত পরিশ্রমের অর্থে সংসারটা এখনো "বজায়" আছে; এমন কি দূর সম্পর্কীয় দুস্থ আত্মীয় কুটুম্বগণকে সাহায্য করিতে তাঁহার মাসিক সার্দ্ধ তিনশত টাকা ব্যয় হয়। এ দানের কথা অন্য কেহ অবগত না থাকিলেও তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্তা সহধর্ম্মিণী "হঠাৎসুন্দরী" পাড়ায় পাড়ায় গেজেট করিয়া বেড়ান এবং তাঁহার পিত্রালয়ের "ভাই ভ্রাদারের" দ্বারা দিক্ দিগন্তরে সালঙ্কারে বিজ্ঞাপিত করাইবার চেষ্টা করেন। যাঁহারা পত্নি ও পতির চরিত্র সম্যকরূপে অবগত, তাঁহারা পশ্চাৎ ফিরিয়া মৃদু হাস্য করেন; যাঁহারা অনবগত, তাঁহারা দম্পতির বদান্যতার প্রশংসা করেন। গজেন্দ্র দত্ত মুমূর্ষু পিতার শয্যাতল হইতে চাবি সংগ্রহ করিয়া তৈজস্‌পত্র অর্থাদি হজম্ করিয়া ফেলিয়াছেন—তাহার মধ্য হইতে পূজা পার্ব্বণে কখনো বা এক আধখানা গুরুদেবকে দান করিলেন—গজেন্দ্রের বন্ধু-

মহলে অমনি একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বন্ধুরা বলে—এমন দান কে কোথায় করিয়া থাকে। গজেন্দ্রের গাভীদুগ্ধে প্রবল অনুরাগ—পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া একটী "কপিলাও" সে গৃহে আনিয়াছে। যতদিন গাভীর দুগ্ধ, ততদিন তাহার যত্ন। তৎপরে গাভীকে চরিয়া খাইতে হয়—শেষে হয়ত চর্ম্মকারের স্নেহনেত্রে পড়িয়া গাভী গো জন্ম হইতে পরিত্রাণ পায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে গজেন্দ্র বাবু বলিয়া থাকেন যে গাভীটি তিনি গুরুদেবকে দান করিয়াছেন। এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে, কাহারো সন্দিগ্ধ হইবার কারণ নাই। কারণ গজেন্দ্রের কর্ত্তব্যপরায়ণা সহধর্ম্মিণী এবং অহিফেনসেবী অকর্ম্মণ্য ভৃত্য সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে প্রস্তুত।

রণেন্দ্র বটব্যাল স্নেহময়ী জননীর অতি কষ্টে সংগৃহীত অর্থগুলি আত্মসাৎ করিয়া, "ফেসান দুরন্ত" বিলাসিনী শ্বশুর নন্দিনীর খাতিরে বডি "বানাইয়া" ফোটো তুলিয়া "আবার খাবো" খাওয়াইয়া পত্নীর নিকট রাজসম্মান পাইলেন—করুণাবেশে মাতাঠাকুরাণীকেও হয়ত একটাকা দশ আনা মূল্যের এক জোড়া কলের কাপড় কিনিয়া দিলেন। বস্—পুত্ররত্নের দানের কথা অমনি বধূর পিত্রালয় পর্য্যন্ত পৌঁছিল। রামরাম দে দেশের নামে চাঁদা সাধিয়া, পত্নীর অলঙ্কার গড়ায়, মোটর চড়ে, ইমারত্ তোলে; গুঁড়ো গাঁড়া যাহা থাকে, তাহা হয়ত কোনো বিধবার বিবাহে দান করিয়া নিজ নামে পাচার করে,—সে দানের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হয়। কামদাস গড়গড়ি পিতার অতি কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থে বিদ্যালাভ করিয়া, পিতারই চেষ্টায় হয়ত সমাজে একটু স্থান পাইয়াছে, অর্থেরও মুখ দেখিয়াছে; পিতা ঋণজালে জড়িত হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে দেহত্যাগ করিলেন—পুত্র সে ঋণ পরিশোধ না করিয়া আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি করিল—মোটর, জুড়ী, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক

আলোক, পত্নীর জন্য স্যাকরার বাড়ী হইতে আনীত অলঙ্কার, শ্বশুরের সান্ধ্যবায়ু সেবনের জন্য গাড়ীর স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত সমস্তই আয়োজন করিল—কেবল স্বর্গগত পিতার ঋণ পরিশোধের কথা কেহ উত্থাপিত করিলে উপযুক্ত পুত্র হস্তপদ নাড়িয়া বলিয়া থাকে, পিতা মূর্খতা বশে অর্থের সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই, আমিও পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকারী হই নাই—অথচ তিনি ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন; শাস্ত্রানুসারে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে আমি বাধ্য নহি। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে হয়ত দেখিতে পাওয়া যায় যে পুত্রবর পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়া দূরে থাকুক—উত্তমর্ণকে ফাঁকি দিয়া তাহা অবাধে ভোগ দখল করিতেছেন। কামদান একটা "ফণ্ডে" এক টাকা দান করেন—প্রতিষ্ঠার জন্য, কালিন্দী বৈষ্ণবীকে দেন মাসিক দুই আনা—পত্নী কুসুম কুমারীকে গীত শুনাইবার জন্য; আর একজন অকর্ম্মাকে দেন পাঁচ টাকা—মোসাহেবীর জন্য। কামদাসের মত দাতা, দাতাকর্ণও হইতে পারিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

হরিহর গুরুলঘু বিচার করে না—সকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। কিন্তু তাহাতে কি হয়—সে লোক দেখাইয়া গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চারিখানি করিয়া বাতাসা দান দরিদ্রকে দান করে, "দাদাঠাকুরকে মাসিক সাড়ে চারিগণ্ডা পয়সা দিয়া রামায়ণ শুনিয়া থাকে, দৈনিক অর্দ্ধ পয়সা ব্যয় করিয়া "শ্যামা নয় সামান্য মেয়ে" শ্রবণ করে। অতএব তাহার উপর কথা কহিতে পারে, এমন শক্তি কে ধারণ করিতে পারে?

এইরূপ দান ও দাতায়, ধর্ম্মের ও সমাজের যে কি ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা প্রকাশের ভাষা নাই। এই মেষ চর্ম্মাবৃত শার্দ্দূলগণ যদি একবার চক্ষুরুন্মিলিত করিয়া দেখে, যদি একবার ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করে, তবে দেখিবে, তবে বুঝিবে, যে কুশিক্ষায়

বীজ তাহারা বপন করিয়া যাইতেছে, তাহা এককালে ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া তাহাদেরই বংশধরগণের আদরণীয় হইবে। সে ফল যে খাইবে, তাহার বুদ্ধিনাশ, মর্য্যাদানষ্ট, বংশধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। আপনি উৎসন্ন গিয়াছ—যাও; সমাজ ছাড়িয়াছ—ছাড়; আত্মীয়তা ভুলিয়াছ—ভুল; ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছ—কর, কিন্তু তোমার পাপে বংশধরকে মজাইও না, তাহাদের কোমল হৃদয়ে তোমার ও স্বার্থপরতায়, হীনতার ছায়া চিত্রিত হইবার অবসর দিও না। ভাণ করা ত তোমাদের স্বভাব। একবার ভাণ করিয়াও তোমাদের বংশধরগণকে শিখাও না তাই—দান স্বার্থপরতায় নহে, দান স্বার্থ ত্যাগে। এরূপ নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়া থাকে, এমন দুই দশজন লোকও এখনো সংসারে আছে। এ দানে দাতাও সুখী, গ্রহীতাও সুখী; দাতাও ধন্য, গ্রহীতাও ধন্য; দাতারও আনন্দ, গ্রহীতারও আনন্দ!

দান খেয়ালের জিনিস নহে, দান তোমার কর্ত্তব্য; দান সুলভ সুনামের জন্য নহে, দান দেবত্ব লাভের উপায়; দান অহঙ্কারের রূপ নহে, দান প্রেম ও করুণার প্রতিমূর্ত্তি। বিকৃত দানে তোমার মহা পাপ—কারণ তাহা তোমার স্রষ্টার নীতিতে নাই; অবিকৃত দানে তোমার মহাপুণ্য—কারণ সে দানে তোমার স্রষ্টা তুষ্ট। এ কথা তোমার শাস্ত্রকারও বলিয়াছেন, তোমার নীতিকারও বলিয়াছেন, তোমার মনও বলিয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম—দান স্বার্থপরতায় নহে, দান স্বার্থত্যাগে!!"

মেহের-উল্-নিসা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

(শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(কথক্ষেত্র)

মিনা বাজারের স্থানে স্থানে, মর্ম্মর মণ্ডিত গোলাকার ক্ষুদ্র চত্বরের উপর, রেশমের সুন্দর পটমণ্ডপ। স্বর্ণ ও রৌপ্যময় দণ্ড সমূহ-দ্বারা এ মণ্ডপ-গুলি পরিবৃত। মণ্ডপাচ্ছাদনার চারিদিকে মুক্তার ঝালর। সে ঝালরগুলি কুসুমপরাগ মিশ্রিত বায়ুভরে, মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

সূর্য্যের কিরণ আর তত প্রখর নাই। নীলসলিলা শ্যামাঙ্গী যমুনার বুকে, তাহার রক্তরাগময় দেহ খানি নিমজ্জিত করিবার এখনও অনেক বিলম্ব। কিন্তু তা হইলে কি হয়, সূর্য্যের কিরণের প্রখরতা যেন সেই মীনাবাজারের উন্মুক্ত ক্ষেত্র-বিচারিণী সুন্দরীদের গণ্ডস্থল রক্তিমাভ করিয়া ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

তারকা মধ্যবর্ত্তী ষোলকলা পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়,সমুজ্জ্বল রূপশালিনী রত্নাভরণ ভূষিতা সুস্মিতা, সম্রাট মহিষী যোধবাই, হাস্যমুখী ষোড়শী সঙ্গিনীগণ পরিবৃতা হইয়া এক স্বর্ণ-দণ্ডময়, ক্ষুদ্র নীল মখমলের তাঁবুর মধ্যে বসিয়া আছেন। সেলিম জননী, আকবর-সাহের পাটরাণী ভারতেশ্বরী মহারাণী যোধবাই—প্রসন্নমুখে তাঁহার সঙ্গিনীদের সহিত নানারূপ সরস রহস্যালাপ করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে সতৃষ্ণ নয়নে এক একবার রঙ্গমহালের দ্বারের দিকে দৃষ্টি পাত করিতেছেন। এ আশাপূর্ণ দৃষ্টির গূঢ় অর্থ তিনিই জানেন, আর তাহা যে তাঁহার বিশ্বস্ত

সঙ্গিনীদের মধ্যেও কেহ জানিতে পারে নাই—এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

সহসা এক সুগঠিত দেহ, সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ—রঙ্গমহালের রক্তপ্রস্তরময় দ্বার-পথে দেখা দিলেন। মহিষী যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে সেই মুক্ত দ্বার অতি নিকটে। সঙ্গিনীগণ—তাঁহার অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে—মুহূর্ত্ত মধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিল। বোধ হইল, যেন কোন মায়াকানন হইতে একদল অপ্সরী নিভৃতে লুকাইল।

সেই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ, সহাস্য-মুখে মহারাণীর অধিকৃত সেই ক্ষুদ্র পট মণ্ডপের দিকে ধীর পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার গতিতেও যেন একটা আবেগ, উৎকণ্ঠা, ও আসঙ্গলিপ্সার দৃঢ়তান প্রকটিত।

সম্রাট মহিষী, আনন্দিত মুখে অগ্রসর হইয়া, দুই হস্তে কুর্ণীস করিয়া বলিলেন—"সালাম্ সাব জয় হউক।"

সেই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ আর কেহই নহেন—স্বয়ং দিল্লীশ্বর আকবর সাহ। সম্রাট হাস্যময় মুখে বলিলেন—"তাই ত! আজ যে ভুবন মোহিনীরূপ ধরিয়া মীনাবাজারের সকল সুন্দরীর জ্যোতি মলিন করিয়া দিয়াছ। ব্যাপার কি—যোধবাই।"

যোধবাই, সম্রাটের হাত ধরিয়া এক স্বর্ণময় ক্ষুদ্র সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইয়া হাস্যমুখে বলিলেন "ভয় হয়—পাছে রূপের জ্যোতি মলিন হইয়া গেলে জাঁহাপনার মন হইতে সরিয়া যাই। তাই এ বয়সেও বসিয়া মাজিয়া—রূপটাকে উজ্জ্বল করিতে হইয়াছে।"

আকবর সাহ—মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন—"তা নয় মহিষী! ও কথাটা আমাকেই শ্লেষ করিয়া ঘুরাইয়া বলা হইল। আমি ক্রমশঃ জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছি—রূপ, যৌবন, হারাইতেছি। আমারই মনে ভয় হয়, পাছে রাজরাজেশ্বরী যোধবাই কোন্ দিন বা আমায় রঙ্গমহলের বাহির করিয়া দেন।"

সম্রাট, মহিষীর সঙ্গে এইরূপ রহস্যালাপ করিতেছেন—এমন সময়ে রাজ্ঞীর ইঙ্গিতে, এক সঙ্গিনী গোলাপ-বাসিত তুষারসিক্ত, আনারের সুশীতল সরবৎ আনিয়া এক স্বর্ণ-পাত্রের—উপর রক্ষা করিল। সম্রাট-মহিষী, স্বহস্তে সেই পানাধার তুলিয়া লইয়া বাদসাহকে দিলেন।

আকবর সেই পাত্র শেষ করিয়া বলিলেন—আজ তোমার সেলিম কোথায় মহিষী! সে এ মীনা-বাজারে আসিবে না।"

আকবর সেই পাত্র শেষ করিয়া বলিলেন—আজ তোমার সেলিম

স্নেহময়ী মাতার হৃদয়ে, স্নেহ উৎস সহস্র ধারায় ফুটিয়া উঠিল! মহিষী—বলিলেন—সে আসিবে বই কি? এই বারের মীনাবাজারের যে এত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে কেবল—তাহারই সুবন্দোবস্তে।"

অন্যান্য সুন্দরীদের—অবাধ গমনাগমনের বা কথাবার্ত্তার যাহাতে কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত না হয়, সেইজন্য সাম্রাজ্ঞী এই দূরবর্ত্তী স্থানেই তাঁহার অবস্থান ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা এদিক ওদিক ঘুরিতে, ঘুরিতে সেই বাদসাহী তাবুটীর সন্নিহিত হইতে সসম্ভ্রমে কুর্ণীস করিয়া কলের পুতুলের মত নিঃশব্দে সেস্থান হইতে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

এক, দুই, তিন, চারি, করিয়া অনেক রূপসীই এইরূপে সেই স্থানের নিকট দিয়া যাইতে লাগিলেন। সম্রাট ও সম্রাট মহিষীকে দেখিবার ইচ্ছা কার নাই? তাহার পর আরও দুইজন আসিল। ইহাদের একজনের মুখ—অবগুণ্ঠনাবৃত এবং অপরার মুখ—অনাবৃত। একজন প্রৌঢ় অপরা কিশোরী। সেই—কিশোরির মুখেই অবগুণ্ঠন নাই। প্রচলিত প্রথামত এই দুইজনও বাদসাহের সম্মুখে আসিয়া কুর্ণীস করিল। সেই অনাবৃত-বদনা কিশোরীকে দেখিয়া—আকবর সাহ তাহারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। অত ভুবনভরা মাধুরিময়ী রূপজ্যোতিঃ আর কখনও তিনি দেখেন নাই।

বাদসাহ একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন দেখিয়া, সেই কিশোরীর রক্তরাগময় গণ্ডদেশ, আরও রক্তিমাভা ধারণ করিল। এতক্ষণ সে অবগুণ্ঠন দেয় নাই। কিন্তু সহসা লজ্জার বিকাশে সে তৎক্ষণাৎ ত্বরিত গতিতে ওড়না খানা—সেই কুঞ্চিত কেশদাম রচিত, মণিমুক্তা সুশোভিত, এলায়িত বেণীর উপর টানিয়া দিয়া সেই প্রৌঢ়ার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। আকবর সাহও সেই সুন্দরীর লজ্জাসংকোচময় এই ত্বরিতগমনে যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন।

রাজমহিষী যোধবাই সম্রাটের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"জাহাপনা কি ঐ যুবতীকে—আর কখনও দেখেন নাই ?"

আকবর। বোধ হয় না!

যোধবাই। ঐটি আমাদের গিয়াসবেগের কন্যা। নাম—মেহের-উন্নিসা!

আকবর। উহার রূপের সুখ্যাতি শুনিয়াছি বটে. কিন্তু—এতরূপ যে খোদা উহাকে দিয়াছেন—তাহা জানিতাম না।

যোধবাই। জাঁহাপনা। আমারও ঐ রূপ দেখিয়া মনে মনে একটা অভিলাষ হইয়াছে

আকবরসাহ একথায় ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন! তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত ভাব ধারণ করিল। তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মহিষীর মুখের দিকে চাহিলেন। সম্রাট মহিষী যোধবাই যে সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন না—তাহা নয়। আকবরসাহ মুহূর্ত্তমধ্যে শ্লেষামিশ্রিতস্বরে বলিলেন—"কেন মহিষি! উহাকে পুত্রবধূ করিবার অভিলাষ করিয়াছ নাকি ?"

যোধবাই। জাঁহাপনার কাছে—কোন কথা কখনও গোপন করি নাই—আজও করিবনা—সত্যই তাই! নারীর এতরূপ আমিও কখন দেখি নাই।

আকবর। মহিষি! তোমার মনের এ সংকল্প ত্যাগ কর। বাসনার অঙ্কুরেই তাহাকে সমূলে বিনাশ কর।

যোধবাই। কেন জাঁহাপনা। এরূপ আদেশ করিতেছেন কেন?

আকবর। ওইরূপ—বাদসার রং-মহালের শোভাবর্দ্ধন করিতে পারে, কিন্তু দিল্লীর সিংহাসনে ওইরূপজ্যোতিতে কলঙ্ক স্পর্শিবে! রূপের মূল্যে হিন্দুস্থানের তক্ত বিক্রয় হয় না।”

যোধবাই। জানিনা—সম্রাট্! কি দোষে—মেহের সিংহাসনের অনুপযুক্ত!

আকবর। রাজকন্যা—না হইলে যে দিল্লীর সম্রাটের পাটরাণী হইতে পারেনা—একথা কি ভুলিয়া গিয়াছ মহিষি! আমার ত ইরাণী, তুরাণী, ইহুদী, খ্রীষ্টান—অনেক রাণী আছে—কিন্তু অম্বর রাজকুমারী যোধবাই ভিন্ন—সম্রাটের পার্শ্বে বসিবার অধিকার আর কাহারও আছে কি?

যোধবাই। সে সাহানসার অনুগ্রহ! এ জন্য এ বাঁদী চিরকৃতজ্ঞা।

আকবর। অনুগ্রহ নয় মহিষী! কর্ত্তব্য। আমি তোমায় অনুগ্রহ করি নাই—বরঞ্চ তুমি আমায় অনুগ্রহ করিয়াছ। যে গিয়াস-বেগের কুলশীল আমার অপরিচিত, তাহার কন্যার সহিত আমি—আমার সিংহাসনাধিকারী জ্যেষ্ঠ-পুত্রের বিবাহ দিতে পারিব না।

যোধবাই সম্রাটের এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক কথায় যেন একটু বিমর্ষ ও অপ্রতিভ হইলেন। তিনি আকবরকে যতদূর চিনিয়াছিলেন, এত আর কেহই নয়। কাজেই সে সময়ে ও প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, অন্য কথার অবতারণা করাই তিনি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ করিলেন।

আর আকবর! তিনিও যে যোধবাইকে উত্তমরূপে না চিনিতেন এমন নয়! সেই মহীয়সী রাজপুতকন্যার দর্প, তেজ, অভিমান, নির্ব্বন্ধ সবই তিনি জানিতেন। এজন্য তিনিও যখন দেখিলেন, যে মহিষী তাঁহার

রূঢ় উত্তরে অপ্রতিভ হইয়া অন্তকথায় অবতারণা করিয়াছেন—তখন অগত্যা মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সেই প্রসঙ্গেই যোগ দিলেন।

ভবিষ্যৎ-গর্ভ-নিহিত কর্ম্মের বীজ, কিন্তু তাঁহাদের উভয়েরই অজ্ঞাতসারে—এই শুভ বা অশুভ মুহূর্ত্তে রোপিত হইল। এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া সমগ্র ভারতে একদিন মহা প্রলয় উপস্থিত করিয়াছিল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

("নীল-কমল।")

"কেহ কি আমায় ঐ সুন্দর পদ্মটী তুলিয়া দিতে পারে না?"

পূর্ব্বকথিত মীনাবাজারের এক সুদূর প্রান্তে মর্ম্মরমণ্ডিত এক কৃত্রিম সরোবর ছিল। তাহাতে কয়েকটী রক্তপদ্ম ফুটিয়াছে। সেই ফুটন্ত নলিনীগুলি, মৃদু বায়ুভরে ধীরে কাঁপিতেছে। সে কম্পনের প্রত্যেক বিকাশে, অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়িতেছে। শোভার জন্যই সেখানে এই উৎপল-সরোবরের সৃষ্টি।

সেই ক্ষুদ্র সরোবরেরতীরে দাঁড়াইয়া, এক অলোকসামান্যা সুন্দরী একদৃষ্টে সেই মৃদু-মলয়-চালিত মৃণালগুলি আর তদুপরিস্থ, চির-সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব-গরীয়সী সুলোহিত পদ্মগুলির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া সহসা হৃদয়ের আবেগভরে বলিয়া উঠিল—"কেহ কি আমায় ঐ সুন্দর পদ্মটী তুলিয়া দিতে পারে না?"

সহসা সেই মুহূর্ত্তে, কে যেন তাহার পশ্চাৎ হইতে অতি কোমলকণ্ঠে, স্নেহময় ভাষায়, আগ্রহস্বরে বলিল—"যদি তোমার আপত্তি না থাকে সুন্দরী! তাহা হইলে বোধ হয় আমিই তোমার এই সামান্য অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি।"

কণ্ঠস্বর পুরুষের। এ রঙ্গমহালের, রমণীমেলার মধ্যে, অন্য পুরুষের ত আসিবার উপায় নাই। স্বয়ং বাদসাহ আর তার সিংহাসনাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহজাদা সেলিম ভিন্ন আর কেহইত এখানে আসিতে সক্ষম নয়। ভয়চকিতা হরিণীর মত, সেই বরবর্ণিনী পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিয়াই মুহূর্ত্তমধ্যে সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনে তাহার লজ্জারাগরঞ্জিত বদনমণ্ডল অদ্ধাবৃত করিল। সেই সুন্দর নলিনাভ সুকোমল গণ্ডস্থল আকস্মিক উত্তেজনা স্থগিত, প্রচুর শোণিত সমাবেশে, আরও গোলাপরাগ লাঞ্ছিত হইল। কিন্তু মুখমণ্ডল নীল ওড়নায় অদ্ধাবৃত বলিয়া সেই লজ্জা-প্রসূত রক্তরাগের মধুর-সৌন্দর্য্য কেহই দেখিতে পাইল না। সুন্দরী সলাজবদনে, সংকোচের সহিত বলিল,—"সাহজাদা! আমায় মার্জ্জনা করুন! আমি জানিতাম না, যে আপনি ঘটনাবশে আমার এত নিকটে আছেন।"

যিনি আসিয়াছিলেন, সত্যই তিনি সাহজাদা সেলিম। সেলিম সেই অপূর্ব্বদৃষ্টা, অপরিচিতা, অলোকসামান্যা সুন্দরীর কথার ভঙ্গীতেই বুঝিলেন—সে ভয়চকিতা। তাহার এ ভয়, এ সংকোচ, দূর করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল।

তিনি সপ্রতিভভাবে সহাস্যমুখে বলিলেন, "পিয়ারে! জানিনা কোন বেহেস্তে—তোমার বাস। কিন্তু একথা স্থির জানিও—যে আকবর সাহের পুত্র এত সংকীর্ণ-হৃদয় নয়—যে সে এক সুন্দরী রমণীর নিকট সামান্য প্রতিশ্রুতি পালনেও অক্ষম হইবে। তুমি আমার এই "নীল-কবুতরটী" কিছুক্ষণের জন্য হাতে করিয়া রাখ। খালি এই শৃঙ্খলটী ধরিলেই হইবে। আমি তোমার প্রস্তাবিত পদ্মটী এখনিই আনিয়া দিতেছি। আমি দেখিতে চাই—অই কণ্টকিত-মৃণালসংস্থিতা নলিনীর সৌন্দর্য্য, তোমার অই সুন্দর মুখের শোভার নিকট পরাজিত হয় কি না!

আর কিছু না বলিয়া কোনও উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সেলিম তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। সেই হস্তে অতি সূক্ষ্ম স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ এক নীল-পারাবত। তাহার বর্ণ ঠিক যেন শরতের নীল আকাশের মত। সুদূর পারস্থান হইতে সেলিম অনেকগুলি আসরফির বিনিময়ে তাঁহার এই সখের, সাধের পারাবতটী, আনাইয়াছেন। এটী তাঁহার বড়ই আদরের জিনিস।

সেলিম হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন দেখিয়া, সেই সুন্দরী কোন কিছু না বলিয়া, মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই নীল-পারাবতটী তাহার হাতে লইলেন। পারাবতটাও এক অপরিচিতার হস্তে গিয়া প্রথমটা একটু চাঞ্চল্যভাব দেখাইল, তারপর স্থির হইল। সেও একদৃষ্টে যেন সেই সুরসুন্দরীর কমনীয় কান্তি দেখিতে লাগিল।

সেলিম একেবারে সেই সরোবর তীরে উপস্থিত হইলেন। সরোবর মধ্যে যাইবার এক ক্ষুদ্র সেতু ছিল, সামান্য চেষ্টাতেই দুইটি পদ্ম তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি অমূল্য রত্নজ্ঞানে, সেই মৃণালিনীদ্বয়কে মৃণাল বন্ধ বিচ্যুত করিয়া, ধীরপদে, প্রসন্নহৃদয়ে সেই সুন্দরীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু আসিয়াই দেখিলেন, যে সেই বরবর্ণিনীর হাতে তাঁহার সেই বিশ্বাসন্যস্ত স্বর্ণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ নীল কবুতরটী নাই।

সেলিম পদ্ম দুইটী তাহার হাতে দিয়া একটু বিরক্তভাবে বলিলেন—

"আমার নীল-কবুতর কোথায়?"

সেই রূপসী বলিল—"আমি তাহাকে উড়াইয়া দিয়াছি।"

"কেন—এ অন্যায় কাজ করিলে সুন্দরী?

"যে জীব মুক্ত-গগনের কোলে সরস বায়ুতে আজীবন পালিত, তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা—মহাপাপ যে "সাহাজাদা।"

"এত দয়া যদি তোমার প্রাণে, তাহা হইলে—"

"তাহা হইলে—কি? আদেশ করুন।

"আমার প্রতি সদয় হও। তোমার অই চম্পক-অঙ্গুলি-মণ্ডিত কুসুম কোমল সুন্দর হাতখানি আমায় একবার স্পর্শ করিতে দাও।"

"ছি! ছি। একথা—দিল্লীশ্বরের পুত্রের উপযুক্ত নয়। ভবিষ্যৎ সম্রাটের গৌরবের পরিচায়ক নয়!

"তুমি অতি নিষ্ঠুর! বিদ্যুতে জ্বালা আছে, পুষ্পে কীট আছে। তোমার প্রাণে একটুও দয়া নাই! তুমি বড় নিষ্ঠুর!

"আমি না আপনি? যে পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া, অমন সুন্দর পাখিটার স্বাধীনতা লোপ করিতে পারে, সামান্য সুখের জন্য—সখের জন্য তাহাকে স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে—সে বেশী নিষ্ঠুর না—আমি?"

"তোমার সহিত এত কথা কহিলাম—কিন্তু তোমার পরিচয় ত এখনও পাই নাই যে সুন্দরী।

"এ বাঁদীর নাম মেহেরউন্নিসা।"

"আতমাদ্‌উদ্দৌলার কন্যা।"

"জনাবের অনুমান ঠিক।"

"মেহের! মেহের! তুমি এত সুন্দরী। যা শুনিয়াছি—তা আজ চোখে দেখিলাম।"

"বাদসার রংমহালে সুন্দরীর অভাব নাই ত জনাব! আমি হয়ত তাহাদের বাঁদীরও যোগ্য নই।"

"তুমি যদি বাঁদী হও তাহা হইলে রাজরাজেশ্বরী কে মেহেরউন্নিসা? তুমি—তুমি মেহের! অত সুন্দর! আমার এ সুখবিলাসপ্লাবিত প্রেমহীন পাষাণ-হৃদয়ে কেহই যে এ পর্য্যন্ত দাগ কাটিতে পারে নাই। কিন্তু তুমি আজ তাহা করিলে। এ দাগ আমার মর্ম্মের মধ্যে গিয়া পশিয়াছে। কেন এ নিষ্ঠুরতা দেখাইলে মেহেরউন্নিসা?"

"জনাব! আজ আমরা আপনার গৌরবান্বিত পিতার আমন্ত্রিত

অতিথি! আমার সঙ্গে এরূপ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বাক্যালাপ হয় ত সাহজাদার উজ্জ্বল নামে কলঙ্ক আনিতে পারে।”

সেই রূপসী শ্রেষ্ঠা মেহেরউন্নিসা. সেলিমের বুকে—সত্য সত্যই এক গভীর দাগ কাটিয়া, আর কোন কিছু না বলিয়া, বিদ্যুৎগতিতে উদ্যানের অপর দিকে চলিয়া গেল।

আর সেলিম! সেলিম উন্মাদের মত এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে রূপজ্যোতি তাঁহার নেত্র ঝলসিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যতক্ষণ দৃষ্টি চলে—ততক্ষণ তিনি নির্নিমেষ-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে যত দূরে যাইতে লাগিল, তাঁহার প্রাণের সেই দাগটী যেন ততই শক্তি সঞ্চয় করিয়া যন্ত্রণা দিতে লাগিল।

সেলিম—বিফল মনোরথ হইয়া, একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি উদ্ভ্রান্ত, বিমুগ্ধ আত্মবোধ-বিহীন। যাহাকে তিনি তখনও এক দৃষ্টে সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছেন, সে তাহার লোচনান্তরাল হইতে কতদূরে চলিয়া গেল—তবুও তাঁহার স্থির দৃষ্টি সেই দিকে আবদ্ধ। তিনি মম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন-সেই বিশ্ব-বিমোহিনী সৌন্দর্য্যপ্রতিমা তাহার প্রেম শূন্য হৃদয়কে যেন প্রেম পূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে।

সেলিম—হৃদয় মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ের অতি গম্ভীরতম প্রদেশেও সে মনোমোহিনী স্মৃতির উজ্জলতা, আধিপত্য বিকাশ করিয়াছে। তাঁহার অন্ধকারময় হৃদয়, পৌর্ণমাসীর উজ্জল আলোকে উজ্জলিত। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই লজ্জাপূর্ণ অবনত দৃষ্টি—সেই আয়ত, আকর্ণ-বিশ্রান্ত সুকৃষ্ণতারকা যুক্ত অব্যক্ত ভাষাময় লোচন, সেই কৌশলরচিত—পৃষ্ঠ-বিলম্বিত সূক্ষ্ম ওড়না আচ্ছাদিত এলায়িত সুকৃষ্ণ বেণী! কি রূপ! কি রূপ! আর সেই রূপের কত দর্প—কত তেজ!

সেলিম রূপ মুগ্ধ রূপোদ্‌ভ্রান্ত, রূপে আত্মহারা। কেন তাহার এমন হইল! তিনি—প্রাণের আবেগে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আমার আশা কি পূর্ণ হইবে না ?" তাঁহার মুখের শেষ কথা বায়ুস্তরে বিলীন না হইতে হইতে, কে যেন পশ্চাৎ দিক হইতে বলিয়া উঠিল, "সাহাজাদা ! আপনার আশা অপূর্ণ থাকিবে না। কিন্তু—কিন্তু !"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(নূতন প্রহেলিকা।)

সেলিম তখনই মুখ ফিরাইয়া পশ্চাৎদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—নীল-বসনাবৃতা এক যুবতী, সেইখানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই সে অবনত হইয়া কুর্ণীস করিল। সেলিম দেখিলেন, সেও সুন্দরী। তবে যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। মেহের আর এর সৌন্দর্য্যে অনেক প্রভেদ। দুয়েরই উন্মাদিনী শক্তি আছে। কিন্তু তাহাদের একের শক্তিতে সামান্য ঝড় বহে—আর অপরের শক্তিতে ভীষণ প্রলয় উপস্থিত করিতে পারে। সাহজাদা তাহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র, সে লজ্জায় বদন অবনত করিল।

সেলিম, সোৎসুকে মনে মনে বলিলেন,—"কে তুমি ! তুমি ত মেহের নও ! তবে তোমার কণ্ঠস্বর—যেন তারই মত মধুর ! তোমার গতি যেন তারই মত সংযত—তোমার দৃষ্টি যেন তারই মত লজ্জারাগরঞ্জিত।

সেলিম আবার ভাবিলেন—হয়তঃ সে কোন মধ্য অবস্থার ওমরাহ কন্যা। তাহার বেশভূষায় ততটা পারিপাট্য না থাকিলেও তাহা রুচিসঙ্গত। হীরামতি মুক্তায় তাহার বর-বপুর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি না হইলেও সেই সুনীল ওড়না খানিতে যেন সে সুন্দর সংযত-সৌন্দর্য্য, পবিত্র ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেলিম সাগ্রহে বলিলেন,—"কে, তুমি ?"

সেই সুন্দরী—ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল “সাহজাদা—আমার পরিচয় না হয় নাই লইলেন! এই মীনাবাজারে সমবেত—অসংখ্য সুন্দরীর পরিচয় লইতে গেলে—হয়তঃ সাহজাদার বহুমূল্য সময় নষ্ট হইতে পারে!”

সেলিম এ উত্তরে বড় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি একটু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—“তুমি এই মাত্র যাহা বলিলে—তাহার অর্থ কি?” তুমি “কিন্তু” পর্য্যন্ত বলিয়া থামিয়া গেলে কেন? জান—এ সময়ে আমার চিত্তের অবস্থা ভাল নয়—”

সেই রমণী বলিল, “তা জানি। সাহাজাদা যদি অভয় দেন—তাহা হইলে—এ “কিন্তুর” শেষ পর্য্যন্ত বলিতে পারি।

“স্বচ্ছন্দে বল।”

“যে মেহেরের চিন্তায় আপনি উদ্ভ্রান্ত সে আপনার হইবে। কিন্তু—”

“আবার কিন্তু! আবার প্রহেলিকা!”

“জনাব! এ বাঁদীর গোস্তাখি মাফ হয়। কথাটা বড় শক্ত। হয়তঃ সাহজাদা সে কথা শুনিয়া আমার উপর বিরক্ত হইতে পারেন।”

“না—তোমার কোন ভয় নাই! স্বচ্ছন্দে বল।

“এই সুন্দরীর দ্বিতীয় আর এ হিন্দুস্থানে নাই। সে আপনার হইবে। কিন্তু অনেক কষ্টে! নিরাশা, নিরানন্দ, মনকষ্ট, প্রচুর শোণিত-পাত—অনাদর, উপেক্ষা এতগুলির বিনিময়ে—তাহাকে কিনিতে হইবে।”

“তুমি উন্মাদিনী! “তোমার কথার কোন মূল্য নাই।”

“না—সাহজাদা! না যুবরাজ! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আপনি হিন্দুদের জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন?”

“রাজপুতমহিষীর গর্ভে জন্মিয়াছি, হিন্দু-জ্যোতিষে আমার পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু জ্যোতিষের সহিত তোমার সম্পর্ক কি?”

"সম্পর্ক না থাকিলে একথা বলিব কেন—জাঁহাপনা!

"তোমার পরিচয় দাও।"

"আমার কোন পরিচয়ই নাই। আমি অনাথা।"

"কিন্তু বেশ দেখিয়া ত তা বোধ হয় না!"

আজ ঘটনাবশে—দারিদ্রের বেশ ভূষা ত্যাগ করিয়া ধার করিয়া আমায় এ বেশ পরিতে হইয়াছে।

"কেন?"

"মীনাবাজার দেখিবার সখ হইয়াছিল বলিয়া।"

"তোমার আশ্রয় নাই বলিতেছ! তুমি আমার কাছে থাক। আমি তোমায় খাস বাঁদী করিব। আমি তোমার মত একটী সুন্দর চেহারার বাঁদী খুঁজিতেছিলাম।"

আকবর সার পুত্রের এবং হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাটের, অনুরোধ লঙ্ঘন করার শক্তি আমার নাই। আজ হইতে আমি আপনার গোলামী স্বীকার করিলাম।"

"আমার সঙ্গে এস।"

"মীনাবাজারে ক্রয় বিক্রয় করিবেন না?"

"না—আমার কেনা বেচার আশা আজ মিটিয়াছে। আজকার এ রূপের বাজারে সামান্য পণ্য রূপে, আমি অপরের কাছে আত্মবিক্রয় করিয়াছি।

"সে ক্রেতা মেহেরউন্নিসা?"

"ঠিক বলিয়াছ।"

"কেন—বেচায় হার জিত আছে। কেউ ঠকে, কেউ জেতে। কিন্তু ঠকা—জেতা একাধারে দুটাই কেহ পায় না। আপনার কিন্তু তাহা হইয়াছে।"

"কিসে জানিলে?"

"জ্যোতিষ বলে !"

"তোমার জ্যোতিষ জাহান্নমে যাক ! তুমি আর আমায় যন্ত্রণা দিও না। তোমার স্পষ্টকথায়—বুদ্ধিমত্তায়, সাহসে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

"যো—হুকুম জাঁহাপনা ! এই কথা বলিয়া সেই রমণী—সেলিমের অনুগমন করিল। প্রাঙ্গণ পার হইয়া সেলিম—কিছুক্ষণ পরে রঙ্গমহলের এক নিভৃতস্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহাই মহলের গুপ্ত প্রবেশ দ্বার। দুইজন ভীমকায়া তাতারী. উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে পদচারণা করিয়া সেস্থানে পাহারা দিতেছে। তাহারা সাহাজাদাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিল। এক অপরিচিতা যুবতীকে সঙ্গে লইয়া, তিনি তাঁহার নির্জ্জন বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন, দেখিয়াও তাহারা বিস্মিত হইল না।

সেলিম—বিনাবাক্যব্যয়ে সেই রমণীকে লইয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাতারীরা রঙ্গমহলের ভিতরের ব্যাপারে—একবারে ঔৎসুক্য বিহীন। বিশেষতঃ সাহজাদা—সেলিমের বিষয়ে। কাজেই এই সায়াহ্ন সময়ে এক অপরিচিতা সুন্দরীকে সেলিমের পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে দেখিয়া তাহারা একটুও বিস্মিত হইল না। তাহারা দুইজনে কেবল মাত্র অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

(কূটসমস্যার মীমাংসা।)

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। রঙ্গমহলের স্বর্ণ-রেখারঞ্জিত বিচিত্র কক্ষগুলি, সুগন্ধি দীপোজ্জ্বলিত। চারিদিকে প্রজ্জ্বলিত দীপের মনোমদ সুগন্ধ, অগুরুর সুগন্ধ—পুষ্পমালিকার সুগন্ধ। প্রত্যেক কক্ষেই বৈজয়ন্তের শোভা।

সেলিম নিজের খাসকামরায় প্রবেশ করিয়া, তার সন্নিকটে স্বর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ একটী রৌপ্যনির্ম্মিত ঘণ্টা আকর্ষণ করিলেন। পরমুহূর্ত্তেই এক খোজা আসিয়া তাঁহাকে তস্লীম করিল।

সেলিম গম্ভীরমুখে বলিলেন—"সাবধান বান্দা! যেন এদিকে কেহ না আসে! আমার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে। তুষার সিক্ত সেরাজী আনিয়া দে। আর এই বিবির জন্য কিছু খানা লইয়া আয়।"

খোজার নাম—আখতার। ইহারপর—মধ্যে মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ লাভ সম্ভাবনা, এজন্য পাঠককে অনুরোধ—যেন তিনি এ নামটী মনে করিয়া রাখেন।

আখতার যো হুকুম বলিয়া—সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। আর অল্প সময়ের মধ্যে—স্বর্ণ পাত্রে করিয়া সুবাসিত সেরাজী, ও কিছু পিষ্টক এবং ফল লইয়া আসিল। পিষ্টকগুলি নিকটস্থ রৌপ্য পাত্রে রক্ষা করিয়া—সেই স্বর্ণময় আধারে সঞ্চিত সুবাসিত সেরাজী ঢালিয়া সাহাজাদার হাতে দিল।

সেলিমের প্রাণে সত্যসত্যই জ্বালাময়ী দারুণ তৃষ্ণা! কিসের তৃষ্ণা—কে বলিবে! রূপ তৃষ্ণা, যদি মনজ ব্যাধি হয়, তবে—তাহার সহিত দৈহিক-তৃষ্ণার কিছু সম্পর্ক আছে কি! যাহারা এ ব্যাধিতে ভুগিয়াছেন—তাহারাই এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন।

সেলিম—এক নিশ্বাস, সেই তুষার-সিক্ত গোলাপ-বাসিত সুস্নিগ্ধ সেরাজী পাত্র শেষ করিয়া কক্ষান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—"সুন্দরী! তুমি শ্রান্ত ও ক্লান্ত—সাহাজাদা তোমাকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিতেছেন।"

সেই রমণী বলিল সাহজাদা! আমায় মার্জ্জনা করুন। যখন আপনার বাঁদী হইলাম—তখন—চিরদিনইত আপনার অন্নে পুষ্ট হইতে হইবে।"

সেলিম অগত্যা সেইখানে বসিয়া—প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কে?

"আমি এখন সাহাজাদার বাঁদী!"

"এখন না হয় বাঁদী। কিন্তু এর আগে ত তোমার একটা পরিচয় ছিল।"

"তাহা জানিয়াই বা সাহাজাদার কি উদ্দেশ্য সফল হইবে? সে পরিচয় দানে আমার একটু আপত্তি আছে। আমার গোস্তাখি মাফ্ হোক।"

আচ্ছা—আমি আর তোমায় এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিব না। কিন্তু তুমি যাহা বলিয়াছ—তাহা কি সত্য?"

"যদি হিন্দুর জ্যোতিষ শাস্ত্র সত্য হয়—তাহা হইলে আমার কথাও কখন মিথ্যা হইবে না।"

"তুমি রমণী হইয়াও—পাষাণী—পিশাচী—রাক্ষসী।"

"বটে! দুনিয়ার বিচারই এই। যে আপনার শান্তিময় হৃদয়ে অশান্তির তরঙ্গ তুলিল—মনটা না বলিয়া কহিয়া—চুরি করিয়া লইয়া গেল, সে দেবী! আর আমি সেই চুরি ধরাইয়া দিলাম বলিয়া, আমি রাক্ষসী।"

সেলিম—এই সাহসময় রহস্য গর্ভ উত্তরে একটু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি—বুঝিলেন—এই ষোড়শী অতি বুদ্ধিমতী। মনের কথা সে যেন টানিয়া বলিতে পারে। তাঁহার খাস-বাঁদীদের মধ্যে কেহই বুদ্ধিতে এর সমকক্ষ নহে।

সেলিম—স্নেহময় স্বরে বলিলেন—"তোমায় বাঁদী বলিতে ইচ্ছা হয় না। এ শূন্য প্রাণ, এ বিশাল বিলাস পুষ্ট—প্রাণে আলাময় আশা লইয়া আমি আর জীবনভার বহিতে পারি না। বাদসাহের গৃহে লালিত পালিত ও পুষ্ট হইয়া আর আমি এত কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। আমার পত্নী আছে, ভবিষ্যতের সাম্রাজ্ঞী আছে, তাহার স্নেহ আছে, ভক্তি আছে

তবুও আমি অসুখী। ততরূপ কাহারই নাই—তবু আমি সেরূপের ঠিক বিচার করিতে পারিনা। ততপ্রেম কাহারই নাই—তবু আমি ভালবাসার গভীরতা বুঝিতে পারিনা—ততস্নেহ—ততমায়া ততপতিপ্রেম—আর কাহারই নাই—তবু যেন আমার বিশ্বাস—সে পাষাণী, নির্ম্মমহৃদয়! জানিনা—কেন আমার এ মতিভ্রম ঘটিল। জানিনা—কি কুগ্রহফলে কি বুদ্ধি দোষে, আমি নিজের জন্য নিত্য নূতন জ্বালা সৃষ্টি করিতেছি।"

এই কথা বলিয়া সেলিম—কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে কি চিন্তা করিলেন। তার পর আর এক পাত্র সেরাজী সুরা গলাধঃকরণ করিয়া প্রাণের অন্তর্জ্বালা নিভাইলেন। মাদকতার পূর্ণতায় তখন উঁহার প্রাণ তখন অতি সরল অতি সংকোচ বিহীন। সেলিম—আনন্দিত প্রাণে সেই রমণীকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলেন—বাঁদী!

সেই রমণী—উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"জনাব।"

সেলিম বলিলেন "না—না তোমায় বাঁদী বলিতে সাহস হয় না। তোমার নাম কি! কি বলিয়া তোমায় ডাকিব?"

সেই বাঁদী বলিল—"আমার নাম জুলিয়া। আমি আপনার বাঁদীর বাঁদী" সেই সঙ্গে সে মনে মনে বলিল—"নিষ্ঠুর। হৃদয়-হীন পাষাণ! তুমি যেমন আমার চক্ষে অশ্রুধারা বহাইয়াছ—আমি যদি কখন সেরূপ পারি জানিও আমার প্রতিহিংসার আশা কতক চরিতার্থ হইবে। আজ আমার আশার একাংশ পূর্ণ হইয়াছে।

সেলিম তখন মদিরা মোহে উন্মত্ত। তাঁহার প্রাণ—সম্পূর্ণরূপে সংকোচশূন্য। তিনি সাদরে আবেগ ভরে সেই নূতন বাঁদী জুলিয়ার কোমল কর ধারণ করিয়া তাহা চুম্বন করিতে গেলেন। জুলিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, তখনই তাহার হাত সরাইয়া লইল। সেলিম বুঝিলেন—সে প্রত্যাখ্যানে—ঘৃণা উপেক্ষা ও বিরাগ।

বিলাতি রঙ্গিণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিয়া মেরিয়াস দেখিল যে সে একটী বিছানায় শায়িতা রহিয়াছে, পার্শ্বে রোসিনী উপবেশন করিয়া তাহার মুখে চোখে জল দিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে।

"এখন একটু সুস্থ হয়েছ কি বাছা?" রোসিনী স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল।

"হাঁ, মা—ভাল আছি। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে কি অপরাধ করেছি যে আপনারা আমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কচ্ছেন?"

"নিষ্ঠুর ব্যবহার! বোকা মেয়ে! আমি যদি এ রকম না কর্ত্তেম— তোমাকে যদি আমরা না চুপ করাতেম, তাহ'লে আমাদের সকলের কি সর্ব্বনাশ হ'ত—তা' জান কি? বেশ যা হোক! স্নেহ ভালবাসার খুব তুমি প্রতিদান দিলে বটে! রাস্তার লোকের কাছে তোমার উপকারী—প্রাণদাত্রীকে অপমান করে, অপ্রস্তুত করে খুবই কাজ কল্লে যাহোক!"

"তোমার পায়ে পড়ি মা—আমাকে বিদায় দাও—আমাকে এ বাড়ী থেকে যেতে দাও! আর আমি এখানে থাকব না!

"আচ্ছা— কেন বল দিকি? তোমার এখানে কি কষ্ট—কি অভাব—হ'চ্চে? তুমি যা চাইছ—তাই পাচ্ছ? ব'লতে হয় না—

চাইতে হয় না'—পোষাক দিচ্ছি— খেতে দিচ্ছি—টাকা কড়ি দিচ্ছি— তোমাকে রাজরাণী করে আদরে রেখেছি—তবু তোমার মন পাচ্ছি না? আর তুমি কি চাও—বল! এত সুখ ঐশ্বর্য্য পেয়েও তবু তুমি সুখী হ'চ্ছ না? তা হলে কেন? সুখভোগের একটা বরাৎ চাই কি না! তোমার অদৃষ্টে বিধাতা রাস্তায় রাস্তায় অনাহারে নিরাশ্রয়ে ভিখারিণীর মতন ঘুরে বেড়ানো লিখেছেন, কাজেই তোমার এত সুখ সহ্য হ'চ্ছে না!"

"মা! আমি জন্ম জন্ম পথে পথে ঘুরে বেড়াই—অনাহারে মরে পড়ে থাকি—দুর্দ্দশার ভীষণ পেষণে দেহপাত হোক্—সে আমার লক্ষগুণে ভাল! কিন্তু এমন হীন সংসর্গে—জঘন্য উপায়ে—পৈশাচিক ব্যবসায়ে সুখ ঐশ্বর্য্যলাভ কর্ত্তে চাই না। ধর্ম্মপথে—নিষ্পাপ শরীরে গাছের পাতা খেয়েও জীবনধারণ করে স্বর্গের সুখশান্তি অনুভব কর্ত্তে পারা যায়, কিন্তু এমন মহাপাপ করে—মহাপাপীর হৃদয় নিয়ে দুনিয়ার আধিপত্যলাভ ক'রেও নরকযন্ত্রণার অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণা।

"দেখ বাছা। ছোট মুখে বড় বড় কথা সাজে না! তুমি বড্ড বেশী ফাজিল হয়েছ দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ সমস্ত রঙ্গমঞ্চের গুণ। নাটক অভিনয় করে এই সমস্ত বাচালতা শিখেছ—বটে? তোমার ও সমস্ত বক্তৃতা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কর্ব্বার সময় শোনাবে ভাল—বুঝেছ? আমি তোমার চেয়ে সংসারের ঢের বেশী জানি শুনি;—ঘরে শুয়ে শুয়ে আমাকে ও সমস্ত উপদেশ বাক্য বোলো না ব'লছি! তুমি যেটাকে "ধর্ম্ম—ধর্ম্ম" ব'লছ—সেটা তোমার আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নয়! খালি পেটে—ছেঁড়া পোষাকে কেবল "ধর্ম্ম—ধর্ম্ম" করে—জীবন রক্ষা হয় না। সেটা যেন মনে থাকে বাছা!"

"আমার জীবনের চেয়ে ধর্ম্মই বেশী মূল্যবান ব'লে আমি মনে করি। জগদীশ্বরের কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—

আমার প্রাণ যাক্—কিন্তু ধর্ম্মরক্ষা হোক্! আমায় গালি দাও তিরস্কার কর—আমায় মার, কিন্তু দোহাই মা,—আমাকে এখান থেকে চলে যেতে দাও!"

"বটে? চলে যেতে দোবো বইকি! কি রসের কথাই বল্লে গো! মিঃ স্মিথ আজ আবার এখানে আস্‌বেন; শোনো বলি,—এবার অমন ছেলেমানুষি ক'রো না। তিনি যা বলেন শুনো—তোমার খুব ভাল হবে।"

"না-আমি আর তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্ব্ব না।" মেরিয়ান খুব জোর করিয়া কথাগুলি বলিল। রোসিনী চক্ষু লাল করিয়া মেরিয়ানকে ধমক দিয়া বলিল "তোমার ঘাড় যে সে দেখা কর্ব্বে! তুমি কি মনে করেছ—একরত্তি মেয়ে—তুমি আমাকে তেজ দেখিয়ে নরম কর্ব্বে? আমাকে ভয় পাওয়াবে? তোমার মতন কত শত মেয়েকে এখানে এনে আমি পোষ মানিয়েছি—বশ করিছি—তুমি তো অতি তুচ্ছ!"

রোসিনীর ধমকে মেরিয়ান এবার ভয় না পাইয়া বরং খুব উত্তেজিত হইল এবং সবলে শয্যাত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, —"তোমার সাধ্য কি পিশাচিনী! তুমি আমাকে ধরে রাখ! তোমার মতন মহাপাপিনীকে আমি হেয় জ্ঞান করি,—আমি ভয় করি না! তুমি আমার কি কর্ব্বে?"

রোসিনী উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল,—"হা-হা-হা—বড় আস্ফালন দেখছি যে! বা লো ময়না! লোহার পিঁজরেতে বদ্ধ হয়ে—খুব তো জোর দেখাচ্ছিস্! মতিচ্ছন্ন ধরেছে কিনা—তাই এই সব বুদ্ধি হ'চ্ছে! আচ্ছা—থাক এইখেনে আটক! বেশ করে মনে মনে বিবেচনা কর! যা বলুম—তোমারি ভালোর জন্যে কিনা—সেটা ঠাণ্ডা হয়ে বসে বসে ভেবো দিকি! আমি এখন এখান থেকে চলে যাই! যদি ভাল চাও— আর গণ্ডগোল না করে—যা বলি তাই কর! সব দিকেই দেখ্‌তে

উঠিতে ভাল! এই বলিয়া রোসিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বহির্দিক হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মেরিয়াস শেষ গৃহে বন্দিনী হইয়া রহিল।

আহা! অভাগিনীর কি যন্ত্রণা! বিধাতা তাহার অদৃষ্টে না জানি কত কষ্টই লিখিয়াছেন! একটার পর একটা—তাহার পর আর একটা—এইরূপে দিন দিন নূতন যন্ত্রণা তাহাকে উৎপীড়িত করিতেছে! যাহা হোক। এক্ষণে উপায় কি? এই পাপস্থান তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু কি উপায়ে? ভাবিতে ভাবিতে মেরিয়াস হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া একবার দ্বারের নিকট গমন করিল,—দেখিল বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। শুধু তাহাই নয়—রীতিমত তালাচাবি আঁটিয়া রাখিয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছে। দ্বারে হতাশ হইয়া মেরিয়াস জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। তখন উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে মেদিনী হাসিতেছিল,—মৃদুমন্দ পবন-সংস্পর্শে বৃক্ষপল্লব এবং মুকুলিত ও অর্দ্ধমুকুলিত পুষ্পরাজি সে স্নিগ্ধ কিরণস্নাত হইয়া আপন মনে হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছিল। মেরিয়াস দেখিল যে সে দ্বিতল কক্ষে আবদ্ধা রহিয়াছে। দ্বিতলের উচ্চতা নিম্নতল হইতে প্রায় পঞ্চবিংশ হস্তেরও অধিক। মেরিয়াস ভাবিল—এই জানালা ভিন্ন পলায়নের আর দ্বিতীয় পথ নাই। যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়—তাহা হইলে এই পথ অবলম্বন করাই যুক্তিসিদ্ধ।

এই স্থির করিয়া মেরিয়াস মনে মনে একটা মতলব আঁটিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি অধিক না হইলে,—সকলে নিদ্রামগ্ন না হইলে—চতুর্দিক নীরব নিথর না হইলে কোনও কার্য্যের সুবিধা হইবে না। অতএব আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য্যধারণের আবশ্যক। তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া চাদর এবং কম্বলের সাহায্যে জানালা হইতে ধীরে ধীরে নীচে

নামিতে হইবে। মেরিয়াসের এই বিষয়ে—এইরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে কোনরূপ ভয় হইতে পারে না—কারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে কোনও নাটকে অপ্সরী কিম্বা কোনও দেবকন্যার অংশ অভিনয় করিতে গিয়া তাহাকে এইরূপ অবস্থায় শূন্যমার্গ হইতে ধীরে ধীরে নিম্নে অবতরণ করিতে হইত। যথাসময়ে মেরিয়াস বিছানা হইতে চাদর এবং কম্বল তুলিয়া লইল। তাহার নিকট কাঁচি ছিল; তাহার সাহায্যে সেই চাদর আর কম্বলকে ফালি করিয়া কাটিল এবং সেগুলিকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া একটা লম্বা দড়ী প্রস্তুত করিল। তাহার পর সেই দড়ীর একধার একটা লোহের সিন্দুকের চারিদিকে খুব দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল এবং অপরধার জানালার ভিতর দিয়া নিম্নে ঝুলাইয়া দিল। এইরূপে সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিয়া মেরিয়াস একবার ভাল করিয়া পথের চারিদিক দেখিয়া লইয়া সেই দড়ী ধরিয়া ধীরে ধীরে নিম্নে অবতরণ করিল। ধন্য জগদীশ্বর! মেরিয়াস নির্ব্বিঘ্নে শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে! মেরিয়াস প্রাণপণে দ্রুত চলিতে লাগিল। কিছুদূরে আসিয়া তাহার ভাবনা হইল,—কোথায় যাই—কোথায় গিয়া আশ্রয় পাই! সেই রাত্রের ঘটনায়—মেরিয়াস অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দেহে যেন কিছুমাত্র শক্তি নাই—পা যেন আর চলে না? কিন্তু তবু অভাগিনী প্রাণের দায়ে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শেষে একটা বৃহৎ পার্কের ধারে আসিয়া পড়িল। ভাবিল—এই সাধারণের বিশ্রামস্থল বৃহৎ পার্কের একটা বেদীতে শুইয়া রাত্রিযাপন করি।

বাস্তবিক ইহা ভিন্ন আর উপায় কি? মেরিয়াস দেখিল আশ্রয়হীন—অনাথ—দীন দরিদ্র শত শত ব্যক্তি এই উন্মুক্ত উদ্যানে—নিরুপায়ে আশ্রয় লইয়াছে! মেরিয়াস ভাবিল—ইহাদেরও যেরূপ অবস্থা—আমারও তো সেইরূপ! তবে আর ইতস্ততঃ কিসের জন্য?

এই ভাবিয়া পার্কে প্রবেশ করিয়া একটা খালি বেঞ্চীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল! কিন্তু হায়—এত বড় পার্কে—এত বেঞ্চীর মধ্যে একটাও তো খালি আছে বলিয়া মনে হয় না! সমস্তগুলিই তো হতভাগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারায় অধিকৃত! মেরিয়াস ভাবিল—"সংসারে দরিদ্রের সংখ্যাই কি সকলের অপেক্ষা অধিক? এমন সহরে কি তবে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি নাই? ইহারাই কি তবে বড়লোক—যতক্ষণ হাতে অর্থ থাকে—ততক্ষণ বড়মানুষি করে এবং অর্থ শেষ হইলে এই অবস্থায় পার্কে আসিয়া রাত্রে শয়ন করিয়া গত সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়?"

খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে মেরিয়াস একটী বেঞ্চী দেখিতে পাইল—যাহাতে কেবলমাত্র একজন শয়ন করিয়া আছে! মেরিয়াস তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল!—দেখিল স্ত্রীলোক! একখানি ছিন্ন শালে অভাগিনী যথাসম্ভব আপাদমস্তক আবৃত করিয়াছে। মেরিয়াস ভাল করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়াও স্ত্রীলোকটীকে চিনিতে পারিল না। যাহা হৌক্—তাহাকে কোনও রকমে বিরক্ত না করিয়া মেরিয়াস ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে সেই বেঞ্চীতে বসিল—এবং কিছুক্ষণ পরেই শ্রমাধিক্যবশতঃ অবসন্ন হইয়া সেই খানে যেন ঢলিয়া পড়িল। যেমন শয়ন—সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় নিদ্রা। এমন অবস্থাতেও মেরিয়াস স্বপ্নের হাত হইতে নিস্তার পাইল না। কিন্তু সে সকল স্বপ্ন অসংলগ্ন অর্থহীন—অথচ বিভীষিকাময়!

মেরিয়াস শুনিল—কে যেন তাহাকে বলিতেছে—"তুমি এখানে এ অবস্থায় শুয়ে কেন?" চক্ষু চাহিয়া দেখিল—একজন পাহারাওয়ালা কঠিন হস্তে তাহার স্কন্ধদেশ নাড়িয়া তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। "যাও—এখান থেকে বেরিয়ে চলে যাও!" এই বলিয়া সেই পাহারাওয়ালা মেরিয়াসকে জোর করিয়া দাঁড় করাইল। মেরিয়াস একটী কথাও বলিতে পারিল না—বলিবার শক্তিও ছিল না।

হতভাগিনী ধীরে ধীরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। যাইতে যাইতে একবার পশ্চাৎ ভাগে ফিরিয়া দেখিল—পাহারাওয়ালা তাহারই পার্শ্বশায়িত সেই রমণীর গাত্রাবরণ ছিন্ন করিয়া জোর করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিতেছে। অভাগিনী চমকিতা হইয়া উঠিয়া বসিয়া—পাহারাওয়ালার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

রমণীর মুখ দেখিয়া—মেরিয়াস সেই স্থানে একটু দাঁড়াইল। আপাদমস্তক শালে আবৃত থাকায় মেরিয়াস তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। এইবার তাহাকে দেখিয়া যেন পরিচিতা মনে হইল। মেরিয়াস পুনরায় সেই বেদীর নিকট ফিরিয়া গিয়া রমণীকে সম্বোধন করিয়া এবং মহানন্দে তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"এ কি? ফ্যানি? তুমি এখানে?"

"এঁ্যা—মেরিয়াস? তুমি?" রমণী বিস্ময়ে মেরিয়াসের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আশ্চর্য্য সংঘটন! দুই জনেই দুই জনের পরিচিত—দুই জনেই পাশাপাশি কতক্ষণ একত্রে শয়ন করিয়াছিল—কিন্তু কেহই কাহাকে চিনিতে পারে নাই!

ফ্যানি মেরিয়াসের প্রাণের সঙ্গিনী। দুই জনে একত্রে এক রঙ্গমঞ্চে কতকাল অভিনয় করিয়াছে! সুন্দর চাকচিক্যময় পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া একত্রে সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দের সম্মুখে কতরাত্রি নৃত্যগীত করিয়াছে! তাহাদের দুই জনের সাজসজ্জা রূপগুণ দেখিয়া মহানন্দে সমগ্র দর্শকবৃন্দ করতালি দিয়া—তাহাদের কত প্রশংসা করিয়াছে! কিন্তু হায়—আজ তাহাদের এ কি অবস্থা! কি ভয়ঙ্কর অধঃপতন! অভিনেতা অভিনেত্রীর কি সকলেরই এই পরিণাম?

পাহারাওয়ালা তাহাদের ভাব দেখিয়া বলিল, "তোমরা দুজনেই দুজনকে চেনো দেখ ছি! বাঃ—বিবি জোড়াটি মিলেছে! বাঃ—ভারি

চমৎকার ! তা—আর এখানে তো থাকা তোমাদের চ'লবে না—এই বার দুজনে সরে পড় - নয়তো থানায় নিয়ে যাই চল।" পাহারাওয়ালার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া মেরিয়াস এবং ফানি উভয়েই তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিল এবং কিছু দূরে গিয়া মেরিয়াস জিজ্ঞাসা করিল "ফ্যান ! তুমি এখানে কেন ?"

ফানি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল এবং বলিল,—"আমিও ভাই তোমাকে ঠিক ঐ কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে যাচ্ছিলুম, তাল আমার কথাই না হয় আগে বলি,—শোন। থিয়েটার ছেড়ে আমি সেণ্ট মার্টিনের গলিতে,—ফ্রেড রেক নামে একজন (ফটোগ্রাফার) চেহারা-চিত্রকারের কাছে গিয়ে রইলুম। অবশ্য কাযটা আমার খুব অন্যায় বটে ! কিন্তু কি করি ভাই থিয়েটার করে—এত কষ্ট করে—রাত জেগে—এ রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে টাকা রোজগারের চেয়ে আমি এই পথ অবলম্বন করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা কল্লুম। ফ্রেড আমাকে পেয়ে যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পেলে। সত্য কথা ব'লতে কি—সে আমায় প্রাণের চেয়েও ভাল বাস্‌তো আমিও তাকে খুব ভালবাস্‌তুম। দুজনে খুব সুখে ছিলুম। খুব বড় মানুষি চালে চল্‌তুম। ক্রমে টাকার বড় টানাটানি হ'ল ;—এত অভাব হ'তে লাগ্‌ল যে ফ্রেড অগত্যা একখান দশহাজার টাকার নোট জাল করে ফেল্লে। কিন্তু শীঘ্রই ধরা পোড়লো। আজ প্রায় এক মাস হ'ল বেচারীর দশ বৎসর জেল হয়েছে। এখন তাকে হারিয়ে আমি এই অবস্থায় পড়েছি—

এই বলিয়া ফানি খুব কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিল,—"আর এখন মিছে কেঁদেই বা কি কর্ব্ব ? এখন বুঝছি—কোন রকমে দিন ক'টা হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে হবে। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করাই উচিৎ ! ফ্রেড জেলে যাবার পর দেখ্‌লুম—আমার আর কোনও উপায় নেই ! অনাহারে তো মর্ত্তে পারি না। থিয়েটারে

ভর্তি হতে গেলুম—কিন্তু কোনও দল আমাকে নিতে চাহিল না। সকলেই বল্লে—তাদের এখন অভিনেত্রী যথেষ্টই আছে—আর দরকার নেই। কাষেই অর্থ উপায়ের সোজা পথ অবলম্বন কল্লুম। কি করি —পেটের দায়ে লোকে সবই করে—" এই বলিয়া আবার ফানি খুব উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগল। মেরিয়াস বলিল,—"দোহাই ফানি—তুমি অমন বিকট হাসি হেসো না—আমার ভয় করে!"

ফানি বলিল,—"তুমি দেখছি এখনও সেই রকম ছেলে মানুষটী আছ। তা যাক্—এখন তোমার ব্যাপার কি বল দেখি!" অল্প কথায় মেরিয়াস ফানির নিকট আত্মকাহিনী বিবৃত করিল। শেষে বলিল,—"এখন আমি কি করি বল দেখি!"

"কি কর্ব্বে? আচ্ছা—তোমার কাছে টাকাকড়ী কিছু আছে?"

মেরিয়াস বলিল—"আছে। খুব অল্প সল্প।"

"কত।"

"পাঁচ ছয় টাকা।"

"এঁ্যা—বল কি? তোমার কাছে পাঁচ ছয় টাকা রয়েছে—আর তুমি এই পার্কে শুয়েছিলে?" অতি আশ্চর্য্য হইয়া ফানি এই কথাগুলি বলিল।

"তা কি করি বল! আমি একা—সহায়হীনা—অবলা!—কোথায় গিয়ে আশ্রয় পাব—কার কাছে গিয়ে দাঁড়াই বল?"

"তুমি যথার্থই অতি ছেলেমানুষ! এখনও সংসারের কিছুই শেখনি দেখ্ছি। আচ্ছা—আমার সঙ্গে চল। আমি তোমার ঐ পাঁচ টাকা থেকে তোমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা রোজগার করিয়ে দেবো।"

"তুমি আমাকে যা বল্বে আমি তাই ক'র্ব্ব—আমি তোমার ছোট বোন—তোমার দাসী! আমার আর কেউ নেই—আমাকে তুমি রক্ষা কর।

"দেখ মেরিয়াস্‌—তোমার কাছে তবে সত্য কথা বলি শোন! আমি যে ভাবে এখন জীবন যাপন কচ্ছি—বাস্তবিক তাতে আমার বড় ঘৃণা হয়েছে। আর আমার সে কাযে প্রবৃত্তি নেই। যদি আমার কোন রকম সৎ উপায়ে টাকা রোজগারের পন্থা হয়, তাহ'লে আমি এখুনি এ পাপ কায ছেড়ে তাই করি। তুমি খুব ভাল ছুঁচের কায জান, আমিও কিছু কম জানি না। তোমার হাতে যে টাকা আছে, তাতে দুজনে একটা বাসা ভাড়া করে নিতে পার্ব্ব। চল এখন—একটা ঘর খোঁজা যাক,—তারপর দুজনে চেষ্টা পোষাক তৈরি কর্ব্বার কাযকর্ম্মের জোগাড় কর্ত্তে আরম্ভ কর্ব্ব। আমাদের হাতে যা সামান্য টাকা আছে, তা নিয়ে ব্যবসা করা খুবই অসম্ভব বটে। কিন্তু খুব বুঝে চল্লে—টেনে চল্লে—বোধ হয়, কায চালাতে পার্ব্ব। এখন এস—তার বন্দোবস্ত করা যাক্।"

এই স্থির করিয়া—উৎসাহপূর্ণ অন্তরে বালিকাদ্বয় ষ্ট্র্যাণ্ড রাস্তার দিকে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানবাবুর দুর্গা পূজা।

(পঞ্চানন্দ লিখিত।)

বড়বাজারের বিজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশুদ্ধ পূজার আয়োজন করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা, পূজার কোন অঙ্গেই ক্রটি হইতে দিবেন না। সংকল্প সিদ্ধির জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাসেই অজ্ঞান পাঠকও বুঝিতে পারিবেন, বাঁড়ুয্যেদের বিজ্ঞান বাবু কিরূপ ভক্ত সাধক, কিরূপ সাত্ত্বিক হিন্দু।

প্রতিমা।

বিজ্ঞান বাবু বিজ্ঞানের অবতার। অথচ সর্ব্বশাস্ত্রেই তাঁহার দৃষ্টি আছে. শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি একপ্রকার অদ্বিতীয়। শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য বুঝিয়া শাস্ত্রের মর্ম্মভেদ করিয়া থাকেন। একই আইনের ব্যাখ্যায় দশ ব্যবহারজীবের দশ মত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলের মত সমান গ্রাহ্য নহে। কোক, কোবরণ, কেন্ট, কোলব্রুক, কুপার, কেলি, অষ্টীন, ষ্টীফেন, ষ্টোক, আরস্কিন, পাষার, শীকক প্রভৃতির ব্যাখ্যা যেরূপ গ্রাহ্য, সামান্য জন, জেক, কর্ডান, জেমসন্ প্রভৃতির ব্যাখ্যা সেরূপ গ্রাহ্য নহে। বিজ্ঞানে হক্সলি, টিণ্ডল, রসকো, কেলভিন, লিষ্টার প্রভৃতির মত যেরূপ মাননীয়; সাধারণ হেগ্‌লার পেগ্‌লার প্রভৃতির মত সেরূপ মাননীয় হইতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যাদি বিংশতি সংহিতাকার মহর্ষির বাক্য যেরূপ শিরোধার্য্য, জয়দেব পশুপতি জীমূতবাহন রঘুনন্দনাদির বাক্য কি সেরূপ শিরোধার্য্য হইতে পারে? বিজ্ঞান বাবু শাস্ত্রের শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বিশ্বাস, সকল শাস্ত্রই বিজ্ঞানের অনুমোদিত। তাই শাস্ত্রব্যাখ্যায় বিজ্ঞানচন্দ্র বিজ্ঞানকেই আধিপত্য দিয়া থাকেন। তাঁহার দুর্গোৎসবেও বিজ্ঞানের আধিপত্য, প্রতিমায় বিজ্ঞানেরই লীলা খেলা।

বৈজ্ঞানিক আয়োজন।

বিজ্ঞান বাবুর প্রতিমায় বিজ্ঞানের আধিপত্য। সাজসজ্জায় বিজ্ঞান, গৃহসজ্জায় বিজ্ঞান, আমোদ আহ্লাদে বিজ্ঞান, অশন ভোজনে বিজ্ঞান, পূজায়ও সকল অঙ্গে বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি। বিজ্ঞান বাবুর বাড়ীর ব্রাহ্মণ-ভোজনেও বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব।

বিজ্ঞানের নানা অঙ্গ। তাড়িত বিজ্ঞান, রাসায়ন বিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, পরিচ্ছদবিজ্ঞান, আমোদবিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই মহাবিজ্ঞানের অন্তর্গত। বিজ্ঞানাসক্ত, বিজ্ঞানশক্ত বিজ্ঞান বাবুর দৃষ্টি সকল বিজ্ঞানে। কিন্তু সকল কথার আলোচনা এক প্রবন্ধে অসাধ্য। আমাদিগকে দুই এক কথায় ইঙ্গিত মাত্র করিতে হইবে।

প্রতিমার গঠনাদি।

মূর্ত্তি গঠনে বিজ্ঞান বাবু বিজ্ঞানবিদ্যার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। মা দশভূজা মহাশক্তি, তাই তাঁহার দুই হস্তে গ্যাল্‌ভেনিক বেটারির পজিটিব নিগেটিব—সাধক-বাধক—দুই রজ্জু। এক হস্তে সোডা অন্য হস্তে এসিড, আর এক হস্তে জলের গেলাস, সোডা এসিডে জল ফুটিয়া রসায়ন-বল দেখাইতেছে। এক হস্তে রেলের এঞ্জিন, অন্য হস্তে রমকর্ফের কয়েল। এক হস্তে অনুবীক্ষণ, অন্য হস্তে দূরবীক্ষণ। অবশিষ্ট হাতটীতে মাইক্রোব বা কীটাণুর শিশি। বিজ্ঞান বাবুর ইচ্ছা ছিল, আরও কয়েকটা হাত মাব অঙ্গে বসাইয়া দেন। শাস্ত্রেও প্রমাণ আছে। যখন সহস্রবাহু অর্জ্জুন ভক্ত রাবণচন্দ্রকে পরাস্ত করেন, সেই সময়ে দশভূজা রাবণকে রক্ষা করিবার জন্য সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যকে নির্ব্বীর্য্য করিবার তরে, অযুতভুজা হইয়াছিলেন। আবশ্যক মত মা যে, হাত কমাইয়া বাড়াইয়া থাকেন, তাহা বিজ্ঞান বাবুর বিদিত। বিজ্ঞানের জন্য তাই বিজ্ঞান বাবু মাকে আর পাঁচ সাতটা ভুজ অনায়াসেই দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি পৈতৃক প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত নহেন। পুরুষানুক্রমে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে উন্নতি করিতে পারেন, তাহার একেবারে পরিবর্ত্তন ব্যতিক্রম ঘটাইতে বিজ্ঞান বাবু একান্তই অশক্ত।

সাজ সজ্জা।

প্রতিমার বস্ত্রাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞান বাবুর মত সমীচীন। এ পক্ষে তিনি পুরাতন প্রথারই পক্ষপাতী। বলেন, "এখনকার পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ-প্রথা স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নর নারীর বরং সময়ে সময়ে উলঙ্গ বিবস্ত্র হইয়া থাকা উচিত, তথাপি কতকগুলা জামাযোড়া পরা উচিত নহে।" হিন্দুর প্রাচীন পরিচ্ছদই বিজ্ঞান বাবুর অনুমোদিত। দেব দেবীর পরিচ্ছদে তিনি নূতনত্ব করিতে নারাজ। উলঙ্গ মহাদেবকেই তিনি অধিক ভক্তি করিয়া থাকেন। পূজার প্রতিমার পরিচ্ছদকল্পে নূতনত্ব নাই।

কিন্তু সরস্বতীর হস্তে বেদ। বিজ্ঞান বাবু বৈদিক হিন্দু। লক্ষ্মীর হস্তে এক থলো চাবী; জগৎপালক পতি বিষ্ণুচন্দ্রের ত আর ধনের অভাব নাই। গণপতি ঠাকুরের শুঁড়টী—বিজ্ঞান বাবুর বড়ই পছন্দ-সই। তিনি বলেন,—"নাকের রন্ধ্র মুখ হইতে যত দূরে থাকিবে, জীবের পক্ষে ততই শুভ। কেননা নাসাগ্র দূরে থাকিলে, মাইক্রোব-গুলা হঠাৎ আসিয়া শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্যই হস্তী নীরোগ, হস্তীরই পরমায়ু অধিক। আর শুঁড় থাকায় গণেশের সিক্নী ফেলিবারও কত সুবিধা! মা দুর্গা শিশু গণেশের শুঁড়টী যখন চুঁচিয়া দিতেন, তখন সমস্ত কফই নিঃশেষ হইয়া পড়িয়া যাইত।"

বেদ ও গীতা।

বিজ্ঞান বাবু ধর্ম্মে বৈদিক বটেন; কিন্তু তাঁহার বৈদিক ধর্ম্মে গৈতভাবের আধিপত্য। তাই সরস্বতীর হাতে বেদ দিয়া বিজ্ঞান বাবু গণেশের হাতে দিয়াছেন গীতা। গণেশচন্দ্র গীতাবাগীশ, গীতার বিজ্ঞানসঙ্গত ব্যাখ্যা লিখিতেছেন। সম্মুখে একটা টাইপ রাইটার।

হাতে কাগজ। টাইপ-রাইটারে লেখা হইতেছে, অক্ষর স্পষ্ট স্পষ্ট। নন্দীর লিনোটাইপ প্রেসে ছাপা সুন্দর হইবে। এমপিন প্রেসের গুণেন্দ্রকুমার নন্দীর অপেক্ষাও ভাল ছাপিতে পারেন। কার্ত্তিকচন্দ্র ময়ূরকে বিদায় দিয়া নূতন ব্যোমযানে বসিয়াছেন। পাঠক স্পেন্সার, রামচন্দ্র প্রভৃতিকে যে বেলুনে চড়িতে দেখিয়াছ, এ সে বেলুন নহে। এ ব্যোমযানে কল আছে। কলের তেজে দীর্ঘযান আকাশপথে যাতায়াত করে। কার্ত্তিক বর্ম্মা যে দিকে ইচ্ছা যাওয়া আসা করিতে পারেন।

সবদিকে সুব্যবস্থা।

বিজ্ঞান বাবু শান্তির পক্ষপাতী। যুদ্ধ বিগ্রহাদিকে সংসার হইতে বিলুপ্ত করিতে চাহেন। সিংহ হইয়াছে মা দুর্গার ল্যাম্প-ডগ। অসুরই সিংহের রক্ষক পালক। চালচিত্রাদিও বিজ্ঞানময়। সমস্ত প্রতিমা তাড়িতময়ী। বিজ্ঞান বাবু সমস্ত পুত্তলাদি ইচ্ছামত খুলিতে বসাইতে পারেন। পূজা-ভবন যে, তাড়িতালোকে আলোকিত; চামর পাখা যে, তাড়িতে চলিতেছে; পূজার নৈবেদ্যাদি যে, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে; কলায়ের . ভোজনের ব্যবস্থায় যে, কার্ব্বনাদি পক্ষে কুণ্ঠিত হইয়া, মোদক পাচকাদিকে অক্সিজেনের দিকেই মুক্তহস্ত হইতে হইয়াছে; বাড়ীর সর্ব্বত্রই যে, কার্ব্বলিক ও পারামাঙ্গানেটের প্রবাহ ছুটিতেছে; ময়দা-মাখা, লুচি-বেলা, সন্দেশ-গড়া, তরকারি কোটা, তরকারি নাড়া প্রভৃতি কোন কার্য্যেই যে, হস্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, সকল দিকেই যে নানাবিধ যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক জলেই যে, দ্রব্য সামগ্রী ধৌত বিধৌত হইতেছে; তাহা পাঠক বুঝিতেই পারিতেছেন। বিজ্ঞান বাবুর পূজায় ব্যতিক্রম হইবার যো নাই।

পূজার ব্যবস্থা।

পূজার ব্যবস্থা বিশুদ্ধ রাখা বড় শক্ত। বিশুদ্ধ রক্ষার জন্য বিজ্ঞান বাবুকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। যত্নেরও সীমা নাই— ধনবল জ্ঞানবল, জনবল, মানবল, সকল বলেই বিজ্ঞানচন্দ্র বলীয়ান্। আর সকল দিকেই তিনি মুক্তহস্ত।

পুরোহিত সভা।

এশিয়াটিক সোসাইটীর প্রধান সভ্য বিজ্ঞান বাবু সোসাইটীর সভা-গৃহে পুরোহিতসভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যে সকল মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রের বিজ্ঞান মতে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যার অধিকারী, তাঁহারাই এই সভার সভ্য হইয়াছেন। তারযোগে জর্ম্মনী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য-রাজ্যের পণ্ডিতগণের সহিতও পরামর্শ হইয়াছে। শেষে দুর্গোৎসবের যে সকল মন্ত্র বীজ প্রভৃতি সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গ্রাহ্য হইয়াছে, সেই সকল মন্ত্রাদিই সোসাইটীর টাইপ-রাইটারে লিখিত হইয়া টেলিফোনে আবৃত্ত হইতেছে। আর বিজ্ঞান বাবুর দালানে গ্রামোফোন বসান আছে, তাহাতেই প্রত্যুচ্চারিত হইয়া পবিত্র পূজাগৃহকে প্রতিধ্বনিত করিয়া আরও পবিত্র করিতেছে। মন্ত্রাদির বিশুদ্ধতাপক্ষে বৃহস্পতিরও দোষ দিবার সামর্থ্য নাই। বিজ্ঞান বাবুর স্বহস্ত-নির্ম্মিত পুরোহিত-কলে পুষ্প বিল্বদলাদি গৃহীত হইয়া মার পদতলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। বরণ, আরত্রিকাদিও সেই কলেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। কলের দুই হাত। মার্কিণরাজ্যে তাড়িতবিশারদ এডিসনের শিষ্যেরা গুরুপত্নীর কষ্ট দূর করিবার জন্য একটী মা-কল গড়িয়া দিয়াছেন। এডিসনের শিশু সন্তান, ঐ মা-কলেই প্রতিপালিত হইতেছে। কোলে দোলা, চুমো খাওয়া, গায়ে হাত চাপড়া প্রভৃতি ত সামান্য কার্য্য,

কলের মা কোলের ছেলেকে স্তনদান করিতেও কুণ্ঠিত হন না। বিজ্ঞান বাবুর পুরুত-কলেও কোনরূপ ত্রুটী হয় না।

চণ্ডীপাঠ।

চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। দালানে উঠিতে না উঠিতেই সঙ্গীত শুনিতে পাইলাম। গায়ক নাই, গান! কিন্তু একটু পরেই রহস্য বুঝিতে পারিলাম, আমরাও ত পাঠক অবৈজ্ঞানিক নহি। দেখিলাম, এডিসনের উদ্ভাবিত ফনোগ্রাফ যন্ত্রে বিজ্ঞান বাবু সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য খানি ধরিয়া রাখিয়াছেন। ফনোগ্রাফেই চণ্ডীপাঠ হইতেছে। দুইটী ফনোগ্রাফ রাখিতে হইয়াছে। একটীতে পাঠ হইয়া যাইতেছে, অন্যটীতে আবার নূতন পাঠের জন্য চণ্ডী ধরা হইতেছে।

সুন্দর বিশুদ্ধ সুস্বর চণ্ডীপাঠ। পূজার যেমন ব্যবস্থা, চণ্ডীপাঠেরও সেইরূপ। তন্ত্রধারক রাখিতে হয় নাই। ভুল-চুক-নাই, তন্ত্রধারক মহাশয় বসিয়া করিবেন কি? দক্ষিণার জন্যও লেঠা নাই। পূজার দক্ষিণা এশিয়াটিক সোসাইটীর কমিটীতে পড়িবে, যথোচিত বিতরিত হইবে। আর চণ্ডীপাঠের দক্ষিণা আমেরিকায় এডিসন সাহেবের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, তাঁহারই ফনোগ্রাফে চণ্ডীপাঠ হইতেছে কি না?

বলিদান।

শুনিয়াছিলাম, বলিদান ভাড়িতে হইবে। মার্কিণরাজ্যে হত্যাপরাধীর প্রাণদণ্ড তাড়িতে হয়। প্রেসিডেণ্ট ম্যাকিন্‌লের হত্যাকারী জোলগর্জের তাড়িতেই প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু শুনিলাম, সে পক্ষে সন্দেহ আছে। বিজ্ঞান বাবু বিজ্ঞানের জন্ত জীবহিংসা করিয়া

থাকেন। তিনি পাশু রীদলের লোক। ডি-ডি-সেক্‌সনের অবিরোধী। কিন্তু পূজায় জীবহিংসা করা বিজ্ঞান বাবুর অনুমোদিত নহে। শুনিলাম, ফরাসিরাজ্য হইতে তাড়িত সংযুক্ত গিলোটাইন আসিয়াছে। তাহারই সাহায্যে কুমড়া ও ইক্ষুর বলিদান হইবে। আর দেড় মণ ক্ষীরের যে ঘোড়া মহিষ প্রস্তুত হইতেছে, তাহারও বলিদান হইবে।

বিসর্জ্জন।

সব্‌মেরীণ নৌকায় বিসর্জ্জন হইবে। বিজ্ঞান বাবু দুই একটী বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া, জলতলবাহিনী যন্ত্রনৌকায়, বিসর্জ্জনের বন্দোবস্ত করিবেন। মাকে সপরিবারে জলের ভিতর দিয়া কিছু দূর যাত্রা করিয়া, নিরঞ্জনকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। বিজ্ঞান বাবুর বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসবে বৈজ্ঞানিক বিসর্জ্জনেই উপসংহার হইবে।

পাশ্চাত্য থিয়েটার ও নাট্যকার।

(শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

বর্ত্তমানকালে ইংলণ্ডে থিয়েটারের বিশেষ প্রতিপত্তি। ইংরাজদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা রবিবার গীর্জ্জায় উপাসনা করিতে যাইতে যেরূপ অভ্যস্ত ছিলেন, আজকাল তাহাদের থিয়েটারে যাইবার অভ্যাসও সেইরূপ প্রবল। ইহার দ্বারা নিশ্চিত প্রমাণ হয় যে সেখানে দেখিবার শুনিবার ও শিখিবার বিশেষ কিছু আছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন অভিনয় অভিনয় মাত্র এবং ঐখানেই উহার শেষ। কিন্তু প্রকৃত তাহা নয়। অভিনয় একাধারে অভিনয় ও একটী অগ্রচালনী ক্ষমতা হইতে পারে। "টাইম্‌স" পত্রিকার খ্যাতনামা লেখক ডগলাস সাহেব একজন ক্রিটিক

লিখিত 'বর্ত্তমান নাটককারগণ' (Modern Dramatitss) নামক গ্রন্থের সমালোচনায় এই ভাবটী বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

আমরা ইবসেন ও শাকে অতিক্রম করিয়াছি। ধ্বংসকারীগণ আমাদের জন্য যে সকল দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়াছিল আমরা সে সকল নিমজ্জিত করিয়াছি ও নূতন মন্ত্রের জন্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। বিদ্রোহী ভাবের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আমরা তুষ্টিগ্রস্থ হইয়াছি। আধুনিক লেখকেরা আমাদিগকে আঘাত করে বা ভয় দেখায় বলিয়া নয়, সে সমস্ত আমরা কাটাইয়া উঠিয়াছি। আমরা তাহাদের খাদ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া সযত্নে রক্ষা করিব কিন্তু আরও কিছু চাই। কবিবর শা বলেন—

যে কোন মূর্খ দর্শকবৃন্দকে হাসাইতে পারে; কিন্তু আমি দেখিতে চাই তাহাদের মধ্যে কয়জন হাসুক বা কাঁদুক তন্ময় হইয়া যায়। ডিউক বলেন—

এই তন্ময় করিবার ক্ষমতাই নাটকের বিচারণা বা আদর্শ। আমাদেরও এই মত এবং এই আদর্শে বিচার করিলে শা ও আধুনিক নাট্যকারগণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান নাটককারগণ সেক্সপিয়ারের তুলনায় হাসির পাত্র। সেক্সপিয়ার এই তন্ময়করণ প্রণালীর সর্ব্বগুণালঙ্কৃত শিক্ষক। শা বলেন—তাঁহার নাটক সেক্সপিয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু যখন আমরা দেখি যে শার নাটকগুলি নাটকাকারে সজ্জিত সমালোচনা মাত্র তখনই এই অস্বাভাবিক আত্মাভিমান স্পষ্ট বুঝা যায়। এই কারণেই সেগুলির জীবন এত ক্ষণস্থায়ী। সেক্সপিয়ার মানবচরিত্রে তাহার চিরসত্যতার প্রদর্শন করেন।

আসল কথা এই যে ইবসেন, শা, বারকার ও গ্যাল্‌সওয়ার্দী অরণ্যে রোদন করিয়াছেন। তাহারা কাল্পনিক সত্যের ধুয়াজীবনের

পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। যাহারা অদ্ভুত পুরাতন কাল্পনিক বিষয়গুলি পুনরাবিষ্কৃত করিবেন তাহাদের তাঁহারা অগ্রগামী। ডিউক বলেন—হইতে পারে যে সূক্ষ্ম নিরীক্ষণকারীর দৃষ্টি ছিন্নবাসাচ্ছাদিত আধুনিক নাটকের দর্শনশাস্ত্রে দুএকটী মতভেদ বাহির করিবে। কিন্তু তাহাতে নকল কখনই আসল হইতে পারে না। রুবিয়ান নাটককার এলটন থেকভের মতে সভ্যতা, ধূর্ত্ততা, বুদ্ধি, এককথায় আধুনিক গুণ নাটকের অস্তিত্ব যথেষ্ট উন্নত করিতে পারে না। থেকভের নাটক সম্বন্ধে ডিউক বলেন—আমরা যে সভ্যতার মধ্যে বাস করি তাহা মাত্র কয়েক জনের আগ্রহের মধ্যে। তাহাদের শিক্ষা, পুস্তক নাটক, নাট্যশালা চালাকি এক ঘণ্টার জন্য। তাহারা অসন্তুষ্ট, অসুখী, ভগ্নমন। ইহার অর্থ কি? বর্ত্তমান অবস্থা কি? প্রাসঙ্গিক কথা। বুদ্ধিমান লোকের নিকট হইতে আমরা সাধারণ লোকের নিকট যাই; তর্কশাস্ত্রজ্ঞদিগের কাছ হইতে বিশ্বাসী ও কাল্পনিক দিগের নিকট; স্বভাবের ক্ষুদ্র নিয়মঝালাইকারীদিগের নিকট হইতে জীবনের নিভৃত উৎসগুলি উত্তেজিতকারীদিগের নিকট যাই। আমরা এক্ষণে ফরাসীনাট্যকার মনস্ ব্রিয়ের পুস্তকগুলির সমালোচনা করিব। উপযুক্ত নাটককারের সংখ্যা চিরকালই অত্যল্প। কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রচারকগণের সংখ্যা গণনাতীত। স্ত্রী স্বাধীনতা, শিথিল বৈবাহিক নিয়ম, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ সংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিনয় হইয়া থাকে। মিষ্টার ব্রিয়ের লোকসংখ্যা, অবিবাহিত মাতার প্রতি সমাজের অবিচার, সহবাস যোগের সম্বন্ধে কপটতা এবং অন্যান্য সামাজিক আচার ব্যবহার রীতি-নীতি সম্বন্ধে নাটক আছে। ন্যায় বা অন্যায় হউক আসল কথা এই যে এগুলি নাট্য কলায় পরিণত হয় নাই। এই কারণেই এই সকল কাল্পনিক নাটকগুলি নাটক পদ বাচ্য নহে।

কিন্তু কবি বারনার্ড শ'র এ মত নহে। তিনি বলেন—ইবসেনের

মৃত্যুর পর রুষিয়ার পশ্চিমে ব্রিক্সই ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইয়াছিলেন। ভোলেয়ারের পর ফ্রান্সে তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক জন্মিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে সমালোচনার ভার কোন শ্রেষ্ঠ সমালোচকের উপর অর্পিত রহিল। যৌবনাবস্থায় যাহারা মারক্স, জোলা, ইবসেন, ষ্ট্রিণ্ডবার্জ, টারজেনিয়ার টলস্টয় প্রভৃতিকে মানবজাতির ইতিহাসের কলঙ্কিত পৃষ্ঠায় মুখোস খুলিয়া যথার্থ অবস্থা প্রকাশ করিতে দেখিয়াছেন তাহারা স্মরণ করিতে পারেন যে অতীত অবস্থা কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে অন্ধকারাচ্ছাদিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর যৌবনোচিত প্রতারণায় মেকলে ও ডিকেন্স সমর্থক ছিলেন।

নীচতার বিরুদ্ধে থেকারের ও পরে কপটতার বিরুদ্ধে ডিকেন্সের বক্তৃতা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পাপকার্য্যের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছিল। মধ্যবিত্ত লোক চোর, দস্যু, মিষ্টভাষী, স্বার্থপর, লম্পট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল; তাহাদের বিবাহ শিথিল লাম্পট্যের আইনসঙ্গত অধিকার মাত্র ছিল।

নাট্যকার যেই দুর্ঘটনার বিপদ পরিত্যাগ করিয়া জীবনের ছুরিকাকে উপকরণরূপে গ্রহণ করেন সেই মুহূর্তেই তিনি দেখিতে পান যে নাটকের শেষ নাই। কোন বীর মৃত বা বিবাহিত হইলে কিম্বা যখন দর্শকবৃন্দের নীতিসংগ্রহ করিবার জন্য যথেষ্ট দেখান হইয়াছে তাবা হয় এবং থিয়েটার পরিত্যাগ না করিলে শেষগাড়ী খালি যেল হইবে, সেই সময়ে যবনিকা পতন হয়।

শাব মতে নাটকের কার্য্য ও নাট্যমন্দিরের দায়িত্ব পূর্ণ করিতে ফরাসী কবি ব্রিক্সই সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি জোলার ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ, বিবেচক ও অবিচলিত। ব্রিক্সের কোন নাটকাভিনয় দেখিয়া ঘটনাটী সম্পূর্ণ হইয়াছে বা নাট্যকার জটিল রহস্যটী সম্পূর্ণ মীমাংসা করিয়াছে? এ চিন্তা লইয়া কেহ গৃহে ফিরিতে পারে না। সভ্যতাকে নিজের জীতিভাবে সহ্য করিতে হইলে তাহাকে সেই ঘটনায় জড়িত

এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ নিজেকেই আবিষ্কার করিতে হইবে এই চিন্তা লইয়া ভগ্ন হৃদয়ে ফিরিতে হয়। ব্রিয় কালি বা ক্রোধ দৈবের প্রতি নিয়োগ করিয়া অপব্যয় করেন নাই। তাহার হস্তমুষ্টি শূন্যে লক্ষ করে না, মানবাত্মার মঙ্গলার্থে মনুষ্যের নাসিকার উপর পড়ে; তিনি মানবচরিত্রকে প্রকাশ করিয়া খোলা চোখের সহিত আবদ্ধ করিয়াছেন।

নাট্যকারের কার্য্য।

শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের নিজেকে ও দর্শকবৃন্দকে আমোদিত করা অপেক্ষা আরো কিছু উচ্চ কার্য্য আছে। তিনি জীবনের ব্যাখ্যাকার। দৈনিক অভিজ্ঞতায় যেরূপ প্রতীয়মান হয় তাহাতে জীবন ঘটনা-পরম্পরায় একটী অবোধ্য-গোলমেলে অবস্থা। পরস্পরের সম্পর্কের কোন সংবাদ না রাখিয়া আমরা ওথেলোকে এলেপো বাজারে, ইয়াগোকে শ্রাইপ্রসের জেটীতে এবং ডেক্‌ডেমোনিয়াকে সেণ্টমার্কের গীর্জ্জাভ্যন্তরে ফেলিয়া আসিয়াছি। কোন ব্যক্তিকে জীবহত্যা বা আত্মহত্যা করিবার মানসে দ্রব্য-ক্রয় করিবার জন্ত ঔষধবিক্রেতার দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমরা এইটুকু জানিতে পারি যে সে একটী লিভারের বড়ী বা দন্তমার্জ্জনার বুরুষ ব্যতীত অন্ত কিছু চাহে না, যে রাজনীতিবিশারদ নির্ব্বাচনের সময় অপরের ভোট সংগ্রহের জন্ত চেষ্টা করিতেছে তাহার হৃদয়ে যুদ্ধ বা বিদ্রোহের ভাব লুকায়িত থাকিতে পারে। পিতা কর্ত্তৃক সপরিবারের লোমহর্ষণ হত্যা ও অবশেষে তাহার আত্মহত্যা কিম্বা একটী যুবতীকে প্রকাশ্য রাস্তায় টানিয়া বাহির করা কিছু দিন পূর্ব্বে ক্রোধবশে একজন কর্ম্মচারীকে কার্য্যচ্যুত করা হেতু ঘটিতে পারে। বাহিরের সচরাচর ঘটনার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া জীবন বুঝিবার চেষ্টা করা সাধারণের

কার্য্য-কলাপের চিত্র দেখিয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের অবস্থা অনুশীলন করিবার চেষ্টার ন্যায় বৃথা। দৈনিক ঘটনার গোলযোগ হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় দৃশ্যগুলি বাছিয়া লইয়া পরস্পরের সম্পর্কগুলি যথাস্থানে সাজানই ব্রিয়ের কার্য্য এবং এইরূপে তিনি আমাদিগকে বিষম গোলমালের বিস্ময়াভিভূত দর্শক হইতে পৃথিবীও ইহার নিয়মাদির বিষয়ে অবগত করান। মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ইহাই সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা এবং এই কারণেই ইরিপাইডস্ ও এরিসস্টোফেন্স হইতে সেক্সপিয়ার, মোলেয়ার; ইবসেন ও ব্রিয় প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ ভবঘুরে অভিনেতা ও নাট্যকারের যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান সত্বেও এত উচ্চ ও গর্ব্বিত স্থান অধিকার করিয়াছেন।

অভিনয়ের দ্বারা সমাজের কলঙ্কের জলন্ত চিত্র সাধারণের সমক্ষে প্রতিফলিত হয় এবং প্রতিকারেরও বিশেষ সম্ভাবনা থাকে ও খাঁটি সভ্যতার প্রসার হয়, এক্ষণে বিচার্য্য এই যে রঙ্গমঞ্চে সর্ব্ববিধ যুদ্ধ করিতে দেওয়া উচিত কি না, কিন্তু ইহা তর্ক করা যায় না যে ইহার আতঙ্ক ও গৌরব উভয়ই সমভাবে প্রদর্শন করা উচিত, ধ্বংস ও মৃত্যু, মহামারি ও দুর্ভিক্ষ, অবনতি ও নিষ্ঠুরতা, জুয়াচুরি ও চালাকি সকলকেই রঙ্গমঞ্চের উপর যথার্থ যুদ্ধের ন্যায় স্বদেশহিতৈষিতা ও করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা না হইলে নাট্যশালার শিক্ষা স্বজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক করিতে পারে। আবার যেখানে অসাধুচিত্ত নাট্যকারেরা রঙ্গমঞ্চে সুরা ও অন্যান্য দূষণীয় দ্রব্যের প্রদর্শনী খোলেন সেখানে যুবক সম্প্রদায়কে মদ্যপান প্রভৃতি ঘৃণার্হ কার্য্য হইতে বিরত রাখিতে প্রয়াসী সাধুচিত্ত লেখকের অভিনয়েরও প্রয়োজন। যোদ্ধগণ উভয়দিক প্রদর্শন করিবার স্বাধীনতাসম্বন্ধে কেহ তর্ক করিতে পারেন না কারণ তাহা হইলে বুঝিবার ও নীতি সংগ্রহ করিবার সুযোগ ঘটিতে পারে না।

কিন্তু স্ত্রী জাতির সম্বন্ধে এ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে যাবতীয় প্রলোভন ও প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিতে হয় এবং ফল এই দাঁড়ায় যে লাম্পট্যের কল্পনাসাধ্য কলঙ্কগুলি রঙ্গমঞ্চে দেখান যাইতে পারে কিন্তু ইহার বিপদ ও শাস্তিগুলি লুক্কায়িত থাকে. রঙ্গভূমিতে পরস্ত্রী বাহির করা যেমন যায় কিন্তু অবৈধ গর্ভসঞ্চার বা দণ্ডনীয় গর্ভস্রাব কখনই দেখান যায় না, আমরা নাট্য মন্দিরে প্রবৃত্তি উদ্রেককারী নারীচরিত্র-হীনতা ও বারবনিতা সঙ্গ দেখাইতে পারি ও আড়ম্বরের সহিত দেখাইয়া থাকি, কিন্তু তাহার ফলে যে দুরারোগ্য রোগের উৎপত্তি হয় এবং অধোগামী তিন চার পুরুষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সে বিষয়ে কোন যুবককে কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না।

নির্জ্জন হোটেলবাসী বিলাতের দোকান ও অফিসের যুবক কর্ম্মচারীদিগের থিয়েটারই একমাত্র বিশ্রামস্থান। তথায় তাহাদের এরূপ কলাবিদ্যা দেখান হয় যে সে শান্তিহীন হোটেল বাস কারাবাস বলিয়া বোধ হয় এবং থিয়েটারের মোহের ঘোর আকর্ষণে জীবনধারণ অসহ্য হইয়া উঠে ও প্রাণ সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকে।

যখন কোন উন্নত হৃদয় গ্রন্থকার সেই বিপদ বুঝিতে পারিয়া সমানুভূতিতে বিগলিত হইয়া একখানি নাটকপ্রণয়ন করিয়া সেই হতভাগ্যদের রক্ষার্থে বিপদের জাল দেখাইয়া দিতে আসেন কর্ত্তৃপক্ষেরা স্বার্থহানির আশঙ্কায় কার্য্যাধ্যক্ষকে উহা অভিনয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং গ্রন্থকারীকে নীতিহীন বলিয়া দোষ দেন। বর্ত্তমান লোকপ্রিয় প্রহসনে পাপ একটী প্রকাণ্ড আমোদ, কাম পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রহস্য এবং যে দুর্বৃত্ত কদর্য্য লাম্পট্য প্রদর্শনে কন্যাসম্প্রদায় কার্য্য শেষ করে সেই সর্ব্বোত্তম স্বামী।

ব্রিক্স নীতি জিনিষ লিখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহার মতে নভেলের ন্যায় নাটকও যেখানে যেভাবে

ইচ্ছা চলিয়া যাইবে এবং কিছুতেই বাধা প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে তাহার কৃতকার্য্যতার সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। যাহাহউক দুঃখের বিষয় তাহার ন্যায় গুণবান কবি সম্যক সমাদর প্রাপ্ত হন নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে এ প্রবন্ধটী পাশ্চাত্য নাট্যশিল্প, অভিনয়, অভিনেতা ও নাটকারগণের বিষয়ে লিখিত যে চিন্তাশীল পাঠক দেখিতে পাইবেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অভিনয় ব্যাপারে অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে, বারান্তরে প্রাচ্য দেশের থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দক্ষযজ্ঞ।

(অভিনেতার আত্মকথা।)

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত।)

আমি একজন অভিনেতা। এই বিশাল বিশ্বনাট্যশালার সংসার-রঙ্গমঞ্চে বিশ্বপতিকর্ত্তৃক অভিনেতৃরূপে প্রেরিত হইয়াও আমি তৃপ্ত নই—আবার ক্ষুদ্রশক্তি মানবনির্ম্মিত কোন একটী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করি। অভিনয় করি নিজের প্রাণের সখে—কিন্তু রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট তাহার জন্য অর্থ লই—দারুণ অভাবে। অর্থ উপার্জ্জন করিব বলিয়াই যে অভিনেতৃদলে নাম লিখাইয়াছি এমন কথা বলিব না। নাট্যকলাচর্চ্চায় যে একটা আনন্দ—রঙ্গমঞ্চে কোন একটী ভূমিকা লইয়া স্বরূপে তাহা অভিনয় করিয়া সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দের নিকট সুখ্যাতি লাভ করিবার যে একটা আকাঙ্ক্ষা,—একজন সুদক্ষ অভিনেতা হইবার যে সখ—এই গুলির সমষ্টিই আমার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাম লিখাইবার মূল কারণ।

আমার নিবাস এই সহরে। কলিকাতায় আমাদের বহুদিনের বাস—লোকেও বলে "আমি বুনিয়াদি ঘরের ছেলে।" এখন "তাল-পুকুরের নাম আছে কিন্তু ঘটী ডোবে না।" আমাদের সংসার খুব বৃহৎ। একান্নভুক্ত নহে—সব "ভিন্ন হাঁড়ী"—যেন বিদেশের একটা পান্থনিবাস। ভায়ে ভায়ে, খুড়ো-ভাইপোয়ে, বাপ-বেটায় পরস্পর পৃথক, এক বাড়ীতে আটটা রন্ধনশালা। সবাই পরস্পরের শত্রু। বিশ বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন। আমারই জ্ঞানে দেখিয়াছি এই বৃহৎ বসুবংশ—যেন একটা ছোট খাটো রাজত্ব। আমার পিতামহ যখন বর্ত্তমান ছিলেন—সকলেই তাঁহার অধীনস্থ ছিল—এই পৃথক্ পৃথক্ আটটা বৃহৎ সংসারে এক সংসার ছিল। পিতামহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মা লক্ষ্মীও বসুবংশ পরিত্যাগ করিলেন। পিতা কিঞ্চিৎ কড়া-মেজাজী ছিলেন—খুল্লতাত জ্যেষ্ঠতাত ইত্যাদি অন্যান্য সকলে কিছু মেজাজে কম ছিলেন না;—কেহ কাহারও অন্নদাস নহে—সকলেই পৈতৃক সম্পত্তির অংশীদার। সংসারে কে কাহাকে গ্রাহ্য করে?

পিতামহের লক্ষ্মীশ্রী ছিল কিনা—তাই তিনি ক্রোড়পতি হইয়াও খুব মোটা চালে হিসাব করিয়া চলিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে সংসারে যেন একটা মহাস্রোত ফিরিয়া গেল। পিতা মহাশয় খুব বড়-মানুষী চালে চলিতে লাগিলেন। গাড়ী জুড়ী, চাকর খানসামা—হামেহাল হাজির থাকিত। বিস্তারিত বর্ণনা আর কি করিব? কলিকাতার সহরে যেমন চালে চলিলে একটা "খোরুচে বড়লোক বাবু" বলিয়া লোকের কাছে খুব নাম বাজিয়া উঠে—পিতা মহাশয় তাহাই করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার একটীমাত্র পুত্র—আদর যত্নের ব্যাপার তো বুঝিতেই পারিতেছেন। আমার বিবাহে তিনি প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ধুমধামে খরচ করিয়াছেন। আমি "বড় মানুষের

আদুরে ছেলে”—লেখাপড়া কি রকম করি, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। বই বগলে ফিটু বাবুটী সাজিয়া জুড়ী চড়িয়া ইস্কুল যাই। চাকর দারবান—সহপাঠীগণ তো খাতির করিবেই,—ইস্কুলের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত যেন আমাকে একটু সমিহ করিয়া চলেন দেখিতে পাই! ঘণ্টায় ঘণ্টায় জলখাবার ঘরে গিয়া সিগারেট টানি। বছর বছর ক্লাস প্রোমোশন পাই। কেন পাইব না? ক্লাসের অধিকাংশ শিক্ষক সকাল সন্ধ্যায় প্রায় বাবার বৈঠকখানায় আসিয়া বসেন—আমি একজামিনে ফেল্ হইব কেন?

ছেলে বেলায় আমিও ভাবিতাম “ঘরে বাপের এত পয়সা—সে এত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখিবে কেন? যাদের পয়সার অভাব, পয়সা রোজগার না করিলে হাঁড়ী চলে না, তারাই মাথা ঘামাইয়া মুখব্যথা করিয়া—প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া পড়া মুখস্থ করিবে। আমি কেন অত কষ্ট সহ্য করিব?” একবার আধবার বাড়ীর মাষ্টারকে কৃতার্থ করিবার জন্য এক আধঘণ্টা বইগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতাম। ইংরাজী বাঙ্গলা দু পাতা দশ পাতা পড়িতে বরং ইচ্ছা হইত—এবং পড়িতাম। কিন্তু জিওমেট্রি অ্যাল্‌জাব্রা?—বাপ্—যেন ব্যাঘ্র বিশেষ—আমি কখনো তাহাদের পাতা উল্টাইয়াও দেখি নাই!

পূজার সময় অথবা কোন ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে বাড়ীতে প্রায় থিয়েটার হইত! সখের এবং পেশাদারী দুই রকমই! নাটক অভিনয় দেখিয়া অতি শৈশবকাল হইতেই আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইতাম! নাটক অভিনয় দেখিতে আমার যে কি পর্য্যন্ত ভাল লাগিত তাহা আমি মুখে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। বাড়ীতে অভিনয় দেখা ছাড়া—পিতার সহিত প্রায়ই রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে যাইতাম। এক রাত্রি নাটক অভিনয় দেখিয়া আমি পাঁচ সাত রাত্রি [illegible]

দেখিতাম। বাড়ীতে ঠাকুরদালানে খবরের কাগজ জুড়িয়া তাহাতে কালী দিয়া আঁক কাটিয়া সিন তৈয়ারি করিতাম। বাখারিতে রূপালি কাগজ জুড়িয়া "হীর তরবারি" প্রস্তুত হইত,—জরী সাটিন মখমলের জামা—ভাল ভাল সাজ করা—টুপী লইয়া পরিচ্ছদাদির কার্য্যে লাগাইতাম—বাড়ীর অন্যান্য সমবয়সী ছেলেদের লইয়া দস্তুর মতন থিয়েটার করিতাম। বাড়ীর ছোট ছোট মেয়েদের খোসামোদ করিয়া ভুলাইয়া দর্শকরূপে রঙ্গমঞ্চের বাহিরে সারি সারি বসাইয়া দিতাম। ফলকথা অনুষ্ঠানের কিছুই ত্রুটী হইত না! শয়নে স্বপনে ধ্যানে জ্ঞানে নাটক আমার সঙ্গের সাথী হইয়াছিল। পড়িবার ঘরে পড়িতে বসিয়া ইস্কুলের বই ঠেলিয়া ফেলিয়া নাটকে মন নিবিষ্ট করিতাম। ইস্কুলে শিক্ষকদের লুকাইয়া এক কোণে বসিয়া নাটক পড়িতাম। বাবা দিন রাত্রি বন্ধু বান্ধব লইয়া আপনার আমোদে আপনিই উন্মত্ত থাকিতেন। আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিবার তাঁহার অবসর কোথায়?

ক্রমে বয়স হইতে লাগিল। বার কতক এণ্ট্রান্স একজামিনে ফেল্ হইয়া মা সরস্বতীকে বিদায় দিলাম। পাড়ায় একটী অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় ছিল। সে সম্প্রদায়ে সমস্ত পুরুষ—স্ত্রীলোকের অংশ পুরুষের দ্বারায় অভিনয় হইত। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে তাহারা অভিনয় করিত। দলস্থ সকলেই আমাকে ভালবাসিত—আমাকে দলভুক্ত করিবার জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিত। কিন্তু বাবা জানিতে পারিলে হয়ত রাগ করিবেন—তিরস্কার করিবেন—এই ভয়ে তাহাদের দলে যাইতাম না। মনের ষোলো আনা ইচ্ছা,—গিয়া যোগদান করি, কিন্তু পিতামাতার ভয়ে পারিতাম না। ক্রমে ইস্কুল ছাড়িয়া দিয়া—"প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে" হইয়া উপরন্ত বিবাহ করিয়া—হৃদয় হইতে তিরস্কারভয় যেন ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল।

তখন একটু স্বাধীনতাবাপন্ন হইয়া শেষ নাট্য সম্প্রদায়ে যোগদান করিলাম। ঈশ্বর ইচ্ছায় চেহারাখানা মন্দ নহে,—সাজিলে গুজিলে লোকেরা বলিত—"আহা—ঠিক যেন রাজপুত্র!" সকল নাটকে আমি নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিতাম। বেশী টাকা চাঁদা দিই বলিয়াও বটে,—সুন্দররূপে অভিনয় করিতে পারিতাম—এবং চেহারা ভাল হওয়াও তাহার প্রধান কারণ। যাঁহারা যাঁহারা আমার অভিনয় দেখিতেন সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেন "কালে বিনোদ-বিহারী বঙ্গদেশে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হইবে!" লোকের মুখে সুখ্যাতি শুনিয়া আমার বুকখানা যেন দশহাত হইত!

ক্রমে কথাটা পিতামাতার কাণে উঠিল। তাঁহারা একদিন আমাকে খুব তিরস্কার করিলেন;—আমি পিতার সম্মুখে কোনও উচ্চবাচ্য করিলাম না। আহারের সময়ে মাতার সহিত তর্ক আরম্ভ করিলাম। মাতাঠাকুরাণীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে—"ভদ্র সন্তান কয়জনে মিশিয়া নাট্যকলা-বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছি তাহাতে দোষ কি? মাতা আরও রাগ করিয়া বলিলেন—"আমিও কলা-পোড়ার বিদ্যের মুখে ছাই দিই! ভদ্রলোকের ছেলে লোকের বাড়ী বাড়ী নেচে নেচে বেড়াস্—এ কোন্ দিশি কথা? তোর জন্যে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না তা জানিস্! সবাই নিন্দে করে—সবাই বলে—"ছেলেটা একেবারে বোয়ে গেছে!" আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"তোমারই কাছে এসে কেবল নিন্দে করে কিন্তু আমার কাছে তো সবাই সুখ্যাতি করে!" মা বলিলেন "ছাই করে! সে দিন্ তোর শ্বশুরবাড়ী থেকে ঝি তত্ত্ব নিয়ে এসে বল্লে কিনা "হ্যাঁ মা—ছোট জামাই বাবু নাকি থিয়েটার করে বেড়ান, আমাদের বাড়ীশুদ্ধ্ মেয়ে-মদ্দ তোমার বেয়ানের কাছে কত [illegible] কল্লে—ছি—ছি—ছি! তুমি বারণ কর্ত্তে পার না, মা? [illegible]"

জন্যে এই সমস্ত নিন্দে আমার কাণে শুন্‌তে হচ্ছে! তুই এমন পোড়া সখ্‌ কেন ছেড়েই দেনা!" সে দিন এই পর্য্যন্ত হইয়া রহিয়া গেল। তাহার পর আর বিশেষ তর্ক হইত না—তাহার কারণ "বোবার শত্রু নেই!" মা বকিতে লাগিলেন—আমি চুপ করিয়া শুনিয়া গেলাম! ক্রমে পিতামাতারও যেন এক ব্যাপারটা গা-সওয়া হইয়া গেল। আমার তো বহুদিন পূর্ব্বেই হইয়াছে।

এইবার আমার শ্বশুরালয় সম্বন্ধে একটু আভাষ দিয়া রাখি। আমার শ্বশুরালয় এই কলিকাতা সহরেই। শ্বশুর মহাশয় "স্বনামপুরুষোধন্য" —একপুরুষে বড় লোক। তাঁহার পৈতৃক অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল; তিনি স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে হাইকোর্টের একজন বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার পাঁচটী পুত্র ও চারিটি কন্যা। পুত্রগুলি এক একটী রত্ন বলিলেই চলে;—জ্যেষ্ঠ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মধ্যম উকীল; তৃতীয় ডাক্তার; চতুর্থটী এম. এ পাশ করিয়া রায়চাঁদ প্রেম চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছেন। কনিষ্ঠ বি, এ, পড়িতেছেন। শুনিতে পাই বি, এ, পাশ করিয়া বিলাতে ব্যারিষ্টার হইতে যাইবেন। মোটকথা, শ্বশুর মহাশয়ের "ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ।" জামাতা তিনজন ধনী না হইলেও সকলেই বিদ্বান;—একজন মুন্সেফ, একজন ডাক্তার, একজন প্রোফেসার। কনিষ্ঠ আমি। আমার তো এই হাল।

আমি বড় একটা শ্বশুরবাড়ীর দিকে ঘেঁসিতাম না। সেখানে কাহারও সহিত আমার বড় বনিত না। আমোদ আহ্লাদ রঙ্গরস শ্বশুরের ভিটায় একেবারে বর্জ্জিত ছিল। সকলেই লেখাপড়ার কথা কহিতেই ব্যস্ত, কিম্বা বড় জোর দুটা চারিটা বৈষয়িক কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাইতাম। কদাচিৎ কার্য্য কর্ম্মোপলক্ষে যদি শ্বশুর বাড়ী যাইতাম—শ্বশুর, সম্বন্ধী শ্যালিকা ইত্যাদি সকলেই বলিতেন—"এত

অল্প বয়সে লেখাপড়াটা ছাড়লে বিনোদ!" ইহা ভিন্ন তাঁহারা অন্য কথা আর জানিতেন না। আমি সেখানে গেলে যেন কারাবন্দের যন্ত্রণা অনুভব করিতাম। তাড়াতাড়ী পলাইয়া আসিলেই যেন বাঁচি! শ্যালিকা সম্প্রদায় বিদ্বান পতিলাভ করিয়া সকলেই যেন মনে মনে একটু গর্ব্বিতা—সকলেরই গম্ভীর চালচলন—কথাবার্ত্তা—হাবভাব! অন্ততঃ আমার কাছে—এইরূপই আমার মনে হইত। কিন্তু আমি তাহা গ্রাহ্যও করিতাম না—কারণ আমি "বড়লোকের ছেলে!"

আমার পত্নী নলিনীবালা একটী "গো-বেচারী"। পৈতৃক-স্বভাব গাম্ভীর্য্যভাব তাহাতে পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান। প্রাণে কোন প্রকার সখের তিলমাত্র ছায়া পর্য্যন্ত নাই। লিখিতে পড়িতে বেশ জানে—কিন্তু কখনো একখানা নাটক নভেল পড়িতে দেখি নাই। থিয়েটার যাত্রা নাচ গান—এ সমস্ত আমোদপ্রমোদ তাহার একেবারেই ভাল লাগিত না। বিবাহের পর দুই এক বৎসর তাহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখিয়াছিলাম,—কিন্তু ইদানীং (বিশেষতঃ আমি লেখাপড়া ছাড়িবার পর)—তাহাকে যেন কেমন একটু বিষণ্ণ দেখি। কিন্তু আমাকে কিছু বলিত না—বা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না। এক দিন আমি কথাচ্ছলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা,—তুমি অমন দিনরাত গোমড়ামুখী হয়ে থাক কেন বল দিকি!" উত্তর পাইলাম, "বাড়ীর পাঁচজনে তোমার নিন্দে করে—আমার শুনে বড় কষ্ট হয়।" আমি বলিলাম, "কেন"। নলিনী বলিল,—"তুমি থিয়েটার কর,—রাত্রি ক'রে—বাড়ী আস, যত বদ্‌ছেলের সঙ্গে মিশেছ বলে!" আমি ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম—"নিন্দে করে তো বড় বয়েই গেল! তুমি কাণ দাও কেন?" নলিনী আর উত্তর করিল না।

এই ভাবেই দিন যায়। আমি সংসারের কোনও খবর রাখি না।

কেবলমাত্র খাবার সময় বাড়ী আসি—আর সমস্ত দিন থিয়েটারের কার্য্যেই—থিয়েটার প্রসঙ্গ লইয়াই—"আখড়া" বাড়ীতে অতিবাহিত করি। প্রত্যহ রাত্রে নাটকের রিহার্স্যাল (মহলা) চলে। রাত্রে বাড়ী ফিরিতে কোন দিন ১১টা বাজে কোন দিন ১২টা বাজে; আবার যে দিন কোন প্রকার ভোজের আয়োজন হয়— অথবা থিয়েটার দেখিতে যাই—সে দিন রাত্রি ২।৩টাও বাজে। চুপি চুপি বাড়ী যাই—কারণ অধিক রাত্রিতে বাড়ী আসিলে বাবা মা খুব তিরস্কার করেন। চাকরকে ঘুস্ খাওয়াইয়া চুপি চুপি সদর দ্বার খুলাইতাম; শয়ন কক্ষে গিয়া দেখিতাম—নলিনী অনিদ্রায় জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি লজ্জায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতাম না। এক এক দিন লজ্জার মাথা খাইয়া বলিতাম—"তুমি ছেলে মানুষ—কেন এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাক? ঘুমাইতে পার না?" নলিনী বলিত "দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে—তোমাকে দরজা খুলিয়া দিবে কে বল? ডাকাডাকি করে—বাড়ীর সকলে জানিতে পারিবেন—তুমি লাঞ্ছনা পাইবে। আর, দরজা খুলিয়া শুইতে আমার বড় ভয় করে!" নলিনীর কথা শুনিয়া মনে বড় আত্মগ্লানি হইত। সে সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতাম—"দূর হোক্—আর রাত্রি করিব না—এবার থেকে সকাল সকাল আসিব।" কিন্তু হায়—দলে পড়িয়া সমস্ত ভুলিয়া যাইতাম! আমোদ প্রমোদ—নাটক অভিনয়—যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। ফলে, "আমি আজকাল একজন বড়দরের অভিনেতা" —চতুর্দ্দিকে লোকের মুখে এইরূপে প্রচার হইতে লাগিল। ক্রমে সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। তাঁহাদের সহিত ক্রমে ক্রমে আমার আলাপ পরিচয় শেষে খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়া পড়িল। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। আমি শিহরিয়া বলিলাম—"বাপরে!

বেশ্যার সহিত অভিনয় করিব? তায় পাবলিক থিয়েটারে? প্রাণ গেলেও না!"

*   *   *   *   *

মনুষ্যের অবস্থা সুখ দুঃখ—চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল এবং চিরদিন কখনও সমান যায় না,—প্রবাদগুলি অতি পুরাতন হইলেও অতি সত্য! কিছুকাল পরে পিতৃদেবের মৃত্যু হইল। এতকাল সংসারের কিছুই দেখি নাই! যখন দেখিলাম—বুঝিলাম—জানিলাম—শুনিলাম, তখন চক্ষুঃস্থির হইয়া গেল। পৈতৃক সম্পত্তি আমাদের অংশে সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে—উপরন্তু পিতামহাশয় বিস্তর টাকা দেনা রাখিয়া গিয়াছেন! যথার্থ ই চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম! আর "বড় লোকের ছেলে" বলিয়া দম্ভ করিবার উপায় নাই! আর বড়-মানুষি করিয়া গাড়ীজুড়ি হাঁকাইয়া—গায়ে হাওয়া লাগাইয়া আমোদ করিবার সঙ্গতি নাই! এখন অন্নমুষ্টিসংস্থানশূন্য—ঋণগ্রস্ত—দীনহীন দরিদ্র! অলঙ্কারাদি জিনিষপত্র যাহা কিছু ছিল একে একে বিক্রয় করিয়া তখন ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলাম। পরিবারস্থ অন্যান্য আত্মীয়বর্গ মুখ টিপিয়া টিপিয়া আমাদের দুর্দ্দশায় হাসিতে লাগিল! সকলেই ভাবিতে লাগিল, আমি গিয়া তাহাদের শরণাগত হইব? কিন্তু তখনও আমার প্রাণে ভয়ানক দম্ভ! আমি এত দুর্দ্দশায় কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলাম না! পিতার মৃত্যুতে অভাগিনী জননী আমার শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িলেন। যে দিকে চাই সেই দিকেই দেখি মহাবিপদ! কিন্তু এ বিপদে আমার একমাত্র সহায়—একমাত্র ভরসা—একমাত্র সান্ত্বনা—সেই ক্ষুদ্র বালিকাপত্নী নলিনী! অম্লানবদনে আপনার সমস্ত অলঙ্কারাদি খুলিয়া আমায় বিক্রয় করিতে দিয়াছে—প্রাণপণে আমার রুগ্না জননীর সেবা করিতেছে—আমার মনের কথা মুখে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই আমার সকল কার্য্যে সহায়তা করিতেছে!

বিপদ একা আসে না—এ কথা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি - এবার নিজে ভুক্তভোগী হইয়া হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিলাম। পিতার পরলোকগমনের ছয় মাস পরেই স্নেহময়ী মাতাঠাকুরাণীও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসিনী হইলেন। ভাবিলাম—"দুর্দ্দশার কি আরও বাকি আছে?".

পৈতৃক বাটীর অংশ দেনার দায় হইতে কোন রকমে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কিন্তু দিন বুঝি আর চলে না। শ্বশুরবাটী হইতে শাশুড়ী ঠাকুরাণী মাঝে মাঝে সংবাদ লইয়া থাকেন, কন্যাকে লইয়া যাইবার, নিমিত্ত প্রায়ই লোক পাঠান, কিন্তু নলিনী যাইতে চাহে না। আমি যাইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলে বলে—"যখন সুসময় ছিল, তখন বাপের বাড়ী বড় একটা যাই নাই, এখন দুঃসময় পড়িয়াছে, কোন মুখ লইয়া তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইব!" কথাটা যুক্তি সঙ্গত বুঝিয়া আমিও বড় পীড়াপীড়ি করিতাম না। কিন্তু শ্বশুর মহাশয়—কিম্বা শ্যালকেরা কেহই একদিন আমাদের বাড়ীতে আসেন নাই। আমি বুঝিলাম- "না আসে বরং ভাল!"

কি চাকুরী করিব, কাহার নিকট চাকুরীর জন্য যাইব, চাকুরী কেমন করিয়া জোগাড় করিতে হয়—তাহা কিছুই জানি না! লেখা পড়াও তেমন জানি না! বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল! এক দিন একজন বলিল—"তোমার চাকুরীর ভাবনা কি? এখনি থিয়েটারে গেলে—খুব মোটা মাহিনা পাও!" কথাটা শুনিয়া মনে বড় ঘৃণা হইল! নলিনীকে বলিলাম—"থিয়েটারে চাকুরী করিব? তুমি কি বল?" সরলা বালিকা যেন চমকিতা হইয়া উঠিল। করজোড়ে বিনয় করিয়া বলিল "ঐটী করিও না—আর যা খুসী কর! চেষ্টা করিলে, একটা না একটা চাকুরী জুটিবেই!"

থিয়েটার হইতে দু এক জন লোক আমার নিকট যাতায়াত

করিতে আরম্ভ করিল ; বলিল—"তোমাকে মাসিক ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা দিতে কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বীকৃত আছেন।" কথাটা এ অবস্থায় আমার পক্ষে খুব লোভজনক বটে - কিন্তু লোকনিন্দাভয় তখনও মনে যথেষ্ট প্রবল ! বিশেষতঃ নলিনী একেবারেই এ কার্য্যের অনুমোদন করে না। থিয়েটারে যোগদান করায় আমার আপত্তির কারণ শুনিয়া একদিন আমার উক্ত বন্ধু আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"না খেতে পেয়ে—ভিক্ষে করে মর্কে—সেটা বুঝি খুব বুদ্ধিমানের কাজ ? তবু নিজে রোজগার করে - নিজের অন্নসংস্থান কর্ত্তে পার্কে—সেটা যাগের কথাশুনে উপেক্ষা কচ্ছ ? সকল কথায় যদি মেয়েমানুষের স্ত্রীবুদ্ধি শুনতে হয়—তা'হলে আর সংসারধর্ম্ম করা চলে না। তোমার নিতান্ত দুঃসময় কিনা—তাই এই রকম মতিচ্ছন্ন হ'চ্ছে !"

মনে মনে নানা তর্ক উপস্থিত হইল। এখন কি করা কর্ত্তব্য ! থিয়েটারে চাকুরী করা ভিন্ন উপায় কি ? কাহারও তাবেদ হইতে হইবে না কাহারও খোসামোদ করিতে হইবেনা—অথচ দুটী প্রাণীর সংসার পরিচালনের জন্য ৬০৲ টাকা যথেষ্ট হইবে ! এমন সুযোগ কি পরিত্যাগ করিব ? কিসের লোকনিন্দা ? এইতো এত ভদ্র সন্তানে থিয়েটার করিতেছে—লোকনিন্দায় তাহাদের কি ক্ষতি হইতেছে ? আমারই বা কি আসে যায় ? আমি অর্থাভাবে এত কষ্ট পাইতেছি—কোন লোক যাচিয়া আসিয়া আমাকে সাহায্য করিতেছে ? উপকারে কেহ নাই, নিন্দা করিবার বেলায় সকলে আছেন ! আমি সে নিন্দা গ্রাহ্য করি না, আমি থিয়েটারে চাকুরী করিব। নলিনীকে এখন কিছু বলিব না ; যখন জানিতে পারিবে তখন বুঝাইয়া তাহাকে তুষ্ট করিব।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃরূপে যোগদান করিয়া চাকুরীস্বীকার করিলাম। দুই এক রাত্রি অভিনয়

করিবার পরই চতুর্দ্দিকে আমার নাম প্রচার হইয়া পড়িল। নলিনীর কাণে এ সংবাদ পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। অভাগিনী ইহা শুনিয়া একেবারে শুধু খাইয়া গেল, এ সম্বন্ধে আর কোনও দিন কোন কথা আমার নিকট উত্থাপন করিল না। আমিও তাহাকে কিছু বলিলাম না।

থিয়েটারে যোগদান করিয়া দেখিলাম, বিশ্বসংসার হইতে যেন আমি তফাৎ হইয়া পড়িয়াছি। থিয়েটারের বাহিরে কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারি না। লোকে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কয়, আলাপ পরিচয় করে কিন্তু আমার মনে হয়, যেন তাহার মাঝখানে একটা কি জানি কিসের বেড়া পড়িয়াছে! সকলেরই সঙ্গে যেন একটু ছাড়াছাড়া ভাব! ভাল মন্দ, ছোট বড়, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শত্রুমিত্র সকলেই আমার নিন্দা করে! সম্মুখে আসিয়া হয়তো আমার অভিনয়ের সুখ্যাতি করিয়া যায়, কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিলেই বলে—"ওটা অধঃপাতে গেছে। ছিছি ভদ্রঘরের ছেলে, বড় ঘরের ছেলে! বেশ্যার সঙ্গে পাবলিক্ থিয়েটার কোরে বাপ ঠাকুর্দ্দার নামে বংশের নামে কলঙ্ক দিলে?" কেহ কেহ বলে "আমি বরাবরই বলে এসেছি, ওর শেষে এই পরিণাম হবেই!"

স্ত্রীলোকের দল বিশেষ আমারই জাতকুটুম্ব রমণীগণ আমাকে কিছু না বলুন—নিরপরাধিনী চিরদুঃখিনী অভাগিনী নলিনীকে আমার কথা লইয়া কত টিট্‌কারীই না দেয়! আহা—সে সরলা বালা সে সমস্ত শুনিয়া কি করিবে? নীরবে প্রাণের যন্ত্রণা প্রাণে চাপিয়া রাখিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া থাকে! আমাকে সে সকল কথা কিছু বলেনা বটে,—কিন্তু লোকপরম্পরায় আমি তাহা সকলই শুনিতে পাই! পাইয়াই কি করিব? হাতের পাশা পড়িয়া গিয়াছে—আর উপায় নাই! যে পথে পদার্পণ করিয়াছি—তাহা হইতে ফিরিবার আর কোনও পথ নাই!

থাকিলেও আমার আর শক্তি নাই ! মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিই—“অমার অদৃষ্টে যা আছে—কে তা খণ্ডন কর্ব্বে ?”

নলিনী কথা কহে না—হাসে না—চুল বাঁধে না—পুরাতন কাপড় ছাড়িয়া নূতন কাপড় পরে না ! সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে অতি অল্পদিনের মধ্যে এমন একটা ভয়াবহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—যাহা দেখিয়া আমি বিশেষ রকম চিন্তাযুক্ত ও ভীত হইয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—“তোমার কি কোনও অসুখ করেছে !” মলিন বদনে একটা ক্ষীণ শুষ্ক হাসি হাসিয়া নলিনী বলিল—“না, কিছু তো হয় নি !” থিয়েটারে চাকুরী পাইয়া—আমি বাড়ীতে একটী দাসী এবং পাচিকা নিযুক্ত করিয়াছিলাম। পাচিকা রাখিতে নলিনী কিছুতেই সম্মতা হইল না। আমাকে বুঝাইয়া বলিল—“এত দুরবস্থায় রাঁধুনি রেখে মিছে খরচ বাড়াবার আবশ্যক কি ? আমি কি আর তোমাকে দুটী রেঁধে খাওয়াতে পার্ব্ব না ?” সুতরাং পাচিকাকে বিদায় করিলাম।

শ্বশুরবাড়ী হইতে আর কেহ কোনও সংবাদ লইতে আসে না। জনশ্রুতি এইরূপ, শ্বশুর মহাশয় আমার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—“আমার ছোট মেয়ে—ছোট জামাই দুজনেই মরেছে !” বাড়ীর সকলের প্রতি কড়া হুকুমজারি করিয়াছেন—“খবরদার—তাদের নাম-গন্ধও যেন আমার বাড়ীতে না হয় !” কথাগুলি যে নিতান্ত অলীক নহে—তাহারও অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। ঝি মহলে সংবাদটা প্রথমে প্রচার হয়। শাশুড়ী ঠাকুরাণী—(হাজার হোক্—মায়ের প্রাণ !) খুব গোপনে বিশ্বস্ত লোকের দ্বারায় কন্যার তত্ত্ব লইয়া থাকেন। যাহা হউক—এই রকমে তো দিন চলিতে লাগিল। আমি সমস্ত দিন বাড়ীতে থাকি—সন্ধ্যার পর বাহির হইয়া যাই। অভিনয় রাত্রে বাড়ী ফিরিতে প্রায় তিনটা বাজিত। অন্যদিন অন্ততঃ বারোটার পূর্ব্বে কিছুতেই বাড়ীতে আসিতে পারিতাম না। আসিয়া দেখি—নলিনী

আমার খাবার লইয়া একাকিনী আমার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি আসিয়া আহারাদি করিবার পরে তবে সে আহার করিতে যাইত। আমি অনেক অনুরোধ করিয়াছি তবু সে এই বিষয়ে চিরদিনই আমার অবাধ্য ছিল। আহার করিতে যাইত বটে—কিন্তু আহার করিত কি না করিত—তাহা সেই জানে! এইরূপে আমি আমার দুঃখময় অভিনেতৃজীবন যাপন করিতে লাগিলাম।

একদিন রবিবারে বৈকালবেলা থিয়েটারে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি,—হঠাৎ নলিনী জিজ্ঞাসা করিল—"আজ তোমাদের কিসের পালা হইবে?" অদ্যাবধি নলিনী এমন কথা কখনো জিজ্ঞাসা করে নাই— আজ তাহার মুখে এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া আমি যেন একটু বিস্মিত হইলাম। বলিলাম "দক্ষযজ্ঞ। কেন বল দেখি?" নলিনী হাসিয়া বলিল,—"তুমি বুঝি "মহাদেব" সাজো?" আমার কৌতুহল বাড়িয়া উঠিল,—আমি বলিলাম "হাঁ। কিন্তু তুমি আজ থিয়েটারের কথা হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ— এর মানে কি নলিনী?"

নলিনী বলিল— আমার বাপের বাড়ীতে আজ সত্যি কার "দক্ষযজ্ঞ" হ'চ্ছে। আজ আমার সেজদাদার বিয়ে, তোমার আমার নেমন্তন্ন বন্ধ!" আবার সেই শুষ্ক বদনে ক্ষীণ মৃদুহাসি—সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্যোতিহীন নয়নকোণে দুই ফোঁটা অশ্রুজল!

প্রাণে আমার বড়ই আঘাত লাগিল। সেইসঙ্গে আপনাকে মনে মনে সহস্র ধিক্কার দিলাম। হায়! আমার জন্যই এই নির্দোষী রমণীর এত জ্বালা—এত অপমান—এত মনোকষ্ট! আমাকে নীরব দেখিয়া পতিপ্রাণা সতী বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া—অতি স্নেহসূচকস্বরে বলিল "আমাকে নেমন্তন্ন ক'রেও তো আমি যেতুম না! যারা তোমার নিন্দে করে—তারা তো আমার পরম শত্রু! যেখানে তোমার নিন্দে হয়—সে যদি স্বর্গও হয়—আমি কিছুতেই তো

সেখানে যেতে পার্ব্ব না!" এত দুঃখেও আমার মনে মনে যেন স্বর্গসুখ অনুভব হইল! মনে হইল—"নলিনীর মতন সতী সাধ্বী স্ত্রী যার তার তুল্য ভাগ্যবান পৃথিবীতে কে আছে? কে বলে আমি দুঃখী, কে বলে আমার দুর্ভাগ্য?"

কথা কহিতে কহিতে নলিনী হঠাৎ বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "শুয়ে পড়লে যে? অসুখ করেছে নাকি?" নলিনী বলিল—"বড্ড মাথা ধরেছে—একটু যেন জ্বরভাব করেছে দাঁড়াতে পারি না একটু শুই।" আমি তাড়াতাড়ি কাছে বসিয়া কপালে হাত দিয়া দেখিলাম ভয়ঙ্কর গরম। বড় ভয় হইল তৎক্ষণাৎ ঝিকে দিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিলাম—এবং শীঘ্র আসিতে বলিলাম। নলিনী বলিল "এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এ আমার বাতিকের জ্বর—মাঝে মাঝে এমন হয়। কাল সকালে কিছু থাকবে না। তুমি থিয়েটারে যাও—একটু সকাল সকাল আসবার চেষ্টা কোরো।" আমার মুখে আর কথা সরিল না—আমি নীরবে নলিনীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। নীরবে কপালে হাত বুলাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দুইটী প্রেসকৃপসন করিয়া দিলেন এবং বলিলেন "এখন তো কোন ভয়ের লক্ষণ দেখিতেছি না—তবে কি Turn নেবে—কে বলিতে পারে? যাহা হোক্—এই দুইটী ঔষধ এক ঘণ্টা অন্তর পাল্‌টা পাল্‌টি করিয়া খাওয়াইবেন। আজ যদি না বাড়ে—কাল সকালে আমাকে খবর দিবেন। আর যদি রোগ বাড়িতেছে দেখেন তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই খবর দিবেন—আমি আসিয়া দেখিয়া অন্য ব্যবস্থা করিব।" ডাক্তার বাবু বিদায় হইয়া গেলেন, আমি তাঁহার কথার মর্ম্ম যেন ভাল বলিয়া বোধ করিলাম না। নলিনী আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বলিল "তুমি কেন এত ভাব্‌ছ? আমার কি এমন অসুখ

হ'য়েছে—যে তোমার এত ভয় হ'ল ? ঝিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বরং ওষুধ দুটো পাঠিয়ে দাও— আমি আপনিই দেখে শুনে নেবো এখন !" আজ আর থিয়েটারে যাইতে কোনমতেই প্রাণ চাহিতেছে না অথচ না গেলেও নয় ! কারণ আমারই Main part প্রধান ভূমিকা— "দক্ষযজ্ঞে" "মহাদেব !" আমার স্ত্রীর অসুখ—দর্শকবৃন্দ তাহা বুঝবেন কেন ? তাঁহারা পয়সা দিয়া আনন্দ করিতে আসিয়াছেন ! থিয়েটারে যাইতেই হইবে। অগত্যা বড় পিসিমার শরণাপন্ন হইয়া পড়িলাম। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে "আমি না আসা পর্য্যন্ত" নলিনীর নিকট বসিতে বলিলাম। চক্ষুলজ্জার খাতিরে এবং সময়ে অসময়ে আমাদের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছেন—কতকটা সে কারণেও বটে, তিনি নলিনীর নিকট আসিয়া বসিয়া আত্মীয়তা করিতে লাগিলেন। আমি "যত শীঘ্র পারি আসিতেছি" বলিয়া ঝিকে সঙ্গে করিয়া দারুণ দুশ্চিন্তার বোঝা মস্তকে লইয়া ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ কিনিয়া ঝিকে দিয়া পাঠাইয়া দিলাম। কি রকমভাবে খাওয়াইতে হইবে তাহাও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম।

থিয়েটারে গিয়া সকলকে আমার বিপদের কথা বলিলাম। শুনিয়া সকলে দুঃখপ্রকাশ করিলেন বটে—কিন্তু অভিনয় করা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। যখন উপায় নাই—তখন অগত্যা সাজসজ্জা করিয়া অভিনয় করিতে হইল, কিন্তু প্রাণের ভিতর যে কি হইতে লাগিল—তাহা জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিল না। যাহা হোক্ কোন রকমে সে রাত্রে অভিনয় কার্য্য শেষ করিলাম। অভিনয় শেষ হইবামাত্রই তাড়াতাড়ী বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া কয়েকজন সম্প্রদায়-ভুক্ত বন্ধু সমভিব্যাহারে যেন উড়িতে উড়িতে বাড়ী আসিয়া কম্পিত অন্তরে একেবারে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন। শয্যায় অজ্ঞানবস্থায় আমার জীবনসঙ্গিনী আমার

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবহীন সংসার অরণ্যের একমাত্র আলো করা সুন্দর নলিনী শুষ্কপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! সে দৃশ্যে প্রাণ আমার কাঁদিয়া উঠিল—কিন্তু চোকে জল আসিল না! বক্ষে থাকিয়াই দগ্ধ করিতে লাগিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন—"জীবনের আশা অতি অল্প—নাই বলিলেও চলে। রোগ সান্নিপাতিক হইয়াছে! দেখি Ingect ইন্‌জেক্ট করিয়া কি হয়!"

যাহা হইবে তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝিলাম! তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমি ধীরে ধীরে শয্যায় বসিয়া—নলিনীর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিলাম—"নলিনী! নলিনী! একটীবার চেয়ে দেখ! যাবার সময় একটা শেষ কথা কও!" ধীরে ধীরে আমার মুদিতা নলিনী নয়ন উন্মীলন করিল। আমি আবার ডাকিলাম—"নলিনী!" নলিনী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল—" "এ্যা—যাই!" এই বলিয়া বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিল। আমি বলিলাম—"নলিনী! আমার হাতে পড়ে বড় কষ্ট পেয়েছ—আশীর্ব্বাদ করি—পরজন্মে সুখী হও—অভাগাকে মার্জ্জনা কর!"

ডাক্তার বাবুও বিদায় হইলেন। ধীরে ধীরে হতভাগ্যের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া পুণ্যবতী সতী স্বামীনিন্দায় ব্যথিতা সতী—কলিযুগের "দক্ষযজ্ঞে" অনিমন্ত্রিতা সতী দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কাঁদিবার কেহ নাই—কান্নার রোল তুলিবে কে? বন্ধু বান্ধবগণের সাহায্যে ফুলালঙ্কারে—সেই পবিত্র সতীদেহ ভূষিত করিয়া শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করিলাম। চেতনরহিত জড়পদার্থের মত চলিয়াছি আপনার অস্তিত্বজ্ঞানশূন্য!—কোথায় যাইতেছি—কি করিতে যাইতেছি—কাহাকে লইয়া যাইতেছি—যেন কিছুই মনে পড়িতেছে না!

আবার চৈতন্যের উদয় হইল! দেখিলাম—চিতানলে ধূ ধূ জ্বলিয়া

জ্বলিতেছে! বুঝিলাম ঐ অনলে আমার হৃদ্‌পিণ্ড দগ্ধ হইতেছে! আবার কি হইল—মনে নাই।

বন্ধুগণ বলিল—"ওঠো—আর বসে ভাবলে কি হবে! স্নান করে নিই চল!"

আমি বলিলাম—"অস্থি গঙ্গায় দিব—দাও!"

সেই পবিত্র শেষ চিহ্ন হস্তে ধীরে—ধীরে জাহ্নবীগর্ভে অবতীর্ণ হইলাম: দেখিলাম পূতপ্রবাহিনী কল্লোলিনী মাতা ভাগিরথী আপনার মনে রঙ্গে ভঙ্গে সাগর উদ্দেশে চলিয়াছে! দূরে—অতি দূরে দেবীর পবিত্র গর্ভে সতীদেহের—সেই পবিত্র অস্থি নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম—

"জীবনের অলঙ্কার ছিল যে আমার—
স্বেচ্ছায় ফেলিনু জলে!

দর দর অশ্রুধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া সেই পবিত্র সলিলে মিশিয়া গেল!!!

সমাপ্ত।

প্রতিশোধ।

(শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

(১)

ভাদ্র মাসের রজনী, দ্বিতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। দিবসে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছে,—এখনও আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন; ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। চতুর্দ্দিক গাঢ় তমসাবৃত; উন্নত দেহ বৃক্ষগুলি উর্দ্ধদিকে শাখাবাহু প্রসারিত করিয়া স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান; তাহাদের নিবিড় পত্রপুঞ্জের মধ্যে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আছে; সেই অন্ধকারপূর্ণ গহ্বরের ক্রোড়ে শত শত খদ্যোৎ ক্ষীণদ্যুতি বিকীরণ করিতেছে।

সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ ; কেবল কাচৎ দুই একটি নিশাচর পক্ষীর কর্কশ কণ্ঠস্বর স্তব্ধ প্রকৃতি-বক্ষে চঞ্চল নৈশ বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া ভাসিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছে।

এই দারুণ দুর্য্যোগের রাত্রে নেপাল রাজ্যের রাজধানী কাঠমণ্ডুর নিকটবর্ত্তী কান্তিপুর গ্রামে, একটি ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে দুইটি প্রাণী উৎকট উৎকণ্ঠায় সময়াতিপাত করিতেছে। একটি দুই বৎসরের শিশু রোগ-শয্যায় শায়িত। পার্শ্বে শিশুটির পিতা ও মাতা আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় সজল নয়নে তাহার রোগক্লিষ্ট মুখখানির প্রতি চাহিয়া আছে এবং ক্ষণে ক্ষণে ভগবান্ পশুপতিনাথের নিকট কাতর প্রাণে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছে।

শিশুর বিবর্ণ রক্তশূন্য ওষ্ঠদ্বয় মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইতেছে ; তাহার জ্যোতিহীন কোটরগত চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে উন্মীলিত নিমীলিত হইতেছে ; অসহ্য রোগ যাতনায় কাতর হইয়া শিশু অনবরত পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছে।—কক্ষের চারিপার্শ্বে যেন মৃত্যুর ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; কোথাও সাড়া শব্দ নাই গভীর নিস্তব্ধতা চারিদিকে বিরাজ করিতেছে।

গৃহের একটি কোণে একটি দীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে। গৃহ-সামগ্রীগুলি স্বল্প মূল্যের হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—ঘরের জিনিষটি বেশ সাজান-গোছান। কিন্তু সেই অস্পষ্ট দীপালোকে আজ যেন সকলের উপর একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে।

শিশুর পিতার নাম সূর্য্যমল, বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর। তাহার বলিষ্ঠ শরীর, বিশাল বক্ষঃ, উন্নত স্কন্ধ, শ্যামকান্তি ও প্রশান্ত মূর্ত্তিতে বীরত্ব সূচিত হইতেছিল। সূর্য্যমলের পিতা নেপাল রাজের সৈন্যদলে অশ্বারোহী সৈনিকের কার্য্য করিত। এক যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হয়। তদানীন্তন সহৃদয় নেপালেশ্বর মহীপ্রভাব নিহত সৈনিকের

পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটি জায়গীর দান করেন। সূর্য্য-মল সেই জায়গীরের উপসত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে। সূর্য্যমলের স্ত্রীর নাম সুনন্দা,—সুনন্দার বয়স কুড়ি বৎসর, সুনন্দা অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী, তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের খ্যাতি রাজ্যের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। সুনন্দার মতন রমণীরত্নকে পত্নীরূপে পাইয়া সূর্য্যমল বড় সুখীই হইয়াছিল। বসন্তের প্রথম প্রভাতে সহসা এক দিন কোকিলের কুহুতানে যেমন জগত মুখরিত হইয়া উঠে, কাননে কুসুমরাশি ফুটিতে থাকে, যৌবনের প্রথম প্রভাতে তেমনই সূর্য্যমলের অন্তরে প্রেম-ফুল বিকসিত হইয়াছিল, দাম্পত্য-প্রণয়ের মধুর গুঞ্জনে তাহার হৃদয় ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে তাহাদের অন্তরের বিকশিত ফুল ফলবতীও হইল; পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রণয়ী-প্রণয়িণী সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বসন্তের নির্ম্মল আকাশে সহসা বজ্রাঘাত হইল; গার্হস্থ্য সুখের প্রথম প্রভাতে সহসা প্রলয়ের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল;—নিষ্ঠুর অদৃষ্টের এমনই তীব্র উপহাস!

আজ এই দুর্দ্দিনে ও দুর্য্যোগে দুর্ভাগ্য দম্পতি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া স্নেহের পুত্তলীকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। এখন আর কাহারও ভরসা নাই,—ভরসা কেবল একমাত্র ভগবানের, তাই তাহারা নিতান্ত কাতর প্রাণে ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বশক্তিমান অনাথের নাথ পশুপতিনাথের শরণ লইতেছে ও মুমুর্ষু পুত্রের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে।

এইরূপে রাত্রি আড়াই প্রহর গত হইল। এমন সময় শিশু একবার চক্ষু মেলিয়া ইঙ্গিতে একটু পানীয় চাহিল। সুনন্দা কত আশায় কত যত্নে পুত্রের মুখে একটু দুগ্ধ দিল। অত্যল্প মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া সে পিতা মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল,—অশ্রুধারা

তাহার দুই গণ্ড বহিয়া উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল; মাতারও চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। কিছুক্ষণ পরে শিশু ডাকিল,—'মা!' সুনন্দা শোকাবেগে কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। শিশু এবার পিতার দিকে চাহিয়া ডাকিল,—'বাবা'! সূর্য্যমল কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—'কি বাবা!'

অকস্মাৎ বক্ষাবের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাহিরে একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল উঠিল; পরক্ষণে সেই ক্ষুদ্র কক্ষের রুদ্ধদ্বার পদাঘাতে শতধা বিদীর্ণ করিয়া ছয়জন অস্ত্রধারী গুর্খা সৈন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; তাহাদের হস্তোত্থিত উন্মুক্ত তরবারিগুলি কক্ষস্থিত সেই অস্পষ্ট দীপালোকে প্রতিফলিত হইয়া চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। একজন সৈন্য সুনন্দাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"ওই সেই সুন্দরী, পাকড়াও!"

চারিজন সৈন্য সুনন্দাকে ধরিবার জন্য যুগপৎ ছুটিয়া গেল। এই আকস্মিক বিভ্রাটে সূর্য্যমল স্তম্ভিত,—সুনন্দা নিস্পন্দ! যদি এই মুহূর্ত্তে সেইখানে বজ্রপাত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহারা এত ভীত হইত না। সুনন্দা একবার পলকশূন্য চক্ষে স্বামীর দিকে চাহিল। সে চক্ষু দেখিয়া সূর্য্যমল চমকিয়া উঠিল; তাহার শোক-মথিত হৃদয় হইতে যেন অনলের একটা প্রচণ্ড প্রবাহ বহিয়া গেল! সে তৎক্ষণাৎ মুমূর্ষু শিশুর রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অগ্রগামী সৈন্য-চতুষ্টয়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল,—কম্পিতকণ্ঠে অসংকোচে বলিল,—"ব্যাপার কি! কি চাও তোমরা?"

একজন সৈন্য বলিল,—"আমরা এই সুন্দরীকে চাই; রাজার হুকুম।"

সূর্য্যমল বলিল,—"রক্ষা কর, দয়া কর; আমার সর্ব্বনাশ করিও না; এই দেখো—পুত্র আমার মরণাপন্ন!"

পশ্চাতের একজন সৈন্য এই সময় অগ্রসর হইয়া সূর্য্যমলের গণ্ডদেশে সজোরে এক চপেটাঘাত করিল; গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"চোপরাও বদমাস্; রাজার হুকুমের উপর কথা? এত বড় যোগ্যতা?"

তখন অপর একজন সৈন্য ছুটিয়া সুনন্দার হস্ত ধারণ করিয়া সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এ দৃশ্যে সূর্য্যমলের শোকমথিত দেহের শীতল রক্ত সহসা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া বলিল,—"ভয় নাই সুনন্দা, সূর্য্যমল এখনও মরে নাই, তোমাকে রক্ষা করিবার শক্তি তাহার অবশ্যই আছে!"—কক্ষের দেয়ালে একখানি সুদীর্ঘ তরবারি ঝুলিতেছিল, সূর্য্যমল বিদ্যুদ্বেগে তরবারিখানি হস্তগত করিয়া তাঁহার পত্নীর অপহরণকারীদের প্রতি ধাবিত হইল। তাহার প্রথম আক্রমণেই একজন সৈন্য সাংঘাতিক রূপে আহত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই পাঁচজন সৈন্য যুগপৎ তাহার উপর আপতিত হইয়া তাহাকে একেবারে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল; দারুণ প্রহারে পীড়িত হইয়া সূর্য্যমল কক্ষতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন জয়োন্মত্ত সৈন্যগণ বিজয়-উল্লাসে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা সুনন্দাকে লইয়া চলিয়া গেল! সূর্য্যমলের ক্ষুদ্র কুটীরখানির যাহা সার ছিল, সুন্দর ছিল, পুণ্য ও প্রীতি ছিল,—আজ রাজার ফৌজ তাহাকে মারিয়া ধরিয়া, তাহার বক্ষ-পঞ্জর বিধ্বস্ত করিয়া—তাহা কাড়িয়া লইয়া গেল!

২

আলোচ্য [illegible] যুদ্ধের কথা। নেপালে তখন [illegible] রাজকার্য্য [illegible] সুপ্রতিষ্ঠিত; রাজা মহীন্দ্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্বোধনে ভূষিত হইয়াছে, বিবিধ [illegible] [illegible] ও [illegible]

ব্যবস্থা বিধান হইয়াছে এবং তাঁহার পুত্র সদাশিব মল্ল নেপালের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন

রাজা সদাশিব মল্ল প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা পিতার অযোগ্য পুত্র; তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই প্রকৃতিপুঞ্জের বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠিলেন। দরবারের প্রধান মন্ত্রিগণের মন্ত্রণায় ইঁহার মনস্তুষ্টি হইত না; একদল স্বার্থ-সর্ব্বস্ব স্খলিতচরিত্র উচ্ছৃঙ্খল যুবক ইঁহার পার্শ্বচর হইয়াছিল, রাজা সদাশিব মল্ল তাহাদের পরামর্শ অনুসারেই পরিচালিত হইতেন। এই প্রকার সঙ্গপ্রভাবে ক্রমেই তাঁহার চরিত্র বিকৃত হইয়া পড়িল, ক্রমে তিনি ইন্দ্রিয়ের উপাসক হইয়া পড়িলেন, ইন্দ্রিয় চর্চ্চাই এখন তাঁহার জীবনের প্রধান কামনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী সতী সাধ্বী পাটরাণীতে রাজার তৃপ্তি নাই, সুন্দরী সন্ধানের জন্য রাজ্যের চারিদিকে চর নিযুক্ত হইল; শত শত সুন্দরী যুবতী এই লম্পট প্রকৃতি রাজার ইন্দ্রিয় লালসার প্রজ্জ্বলিত হুতাসনে ইন্ধনরূপে পরিণত হইল,—রাজ্যের চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল! যদি কোনো সুন্দরী যুবতী রাজা সদাশিব মল্লের নেত্রপথবর্ত্তিনী হইত, তাহা হইলে তাহার আর রক্ষার উপায় থাকিত না; সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তঃপুরশোভিনী হইলেও তাহাকে এই দুরাচার রাজার লালসানলে নারী-জীবনের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে হইত! রক্ষা কে করিবে? যিনি রক্ষাকর্ত্তা তিনিই ভক্ষক!

ক্রমে সুনন্দার রূপের কথা রাজা সদাশিব মল্লের কর্ণগোচর হইল, পশুপতিনাথের মন্দিরে একদিন সুনন্দার দর্শনও মিলিল; সে রূপ দেখিয়া কামুক নৃপতি উন্মত্ত হইয়া উঠিল, পার্শ্বচরগণের প্রতি সুনন্দাকে তাঁহার বিলাস-কুঞ্জে আনয়নের ভার অর্পিত হইল।

পুত্রের রোগমুক্তি কামনায় সুনন্দা মন্দিরে ভগবান্ পশুপতিনাথের আরাধনা করিতে গিয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহার প্রতি লম্পট

রাজার লোলুপদৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সুনন্দা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; তাহার পর রাত্রে সেই দারুণ বিভ্রাট! পাপিষ্ঠ রাজার অনুচরেরা স্বামীর সম্মুখ হইতে—মুমূর্ষু পুত্রের রোগশয্যা হইতে তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল! নিষ্ঠুর কৃতান্ত তাহার স্নেহের ধন, অঞ্চলের নিধি, প্রাণাধিক পুত্ররত্নকে হরণ করিতে বসিয়াছিল, এমন সময় নির্ম্মম নিষ্ঠুর রাজার কৃতান্তরূপী অনুচরেরা তাহাকেও হরণ করিয়া লইয়া গেল!

৩

নেপালেশ্বরের নন্দনকাননতুল্য প্রমোদ উদ্যানে—সুরম্য সুবৃহৎ উদ্যান-ভবনের সুন্দর সুসজ্জিত এক কক্ষমধ্যে এক খানি গজদন্ত-বিনির্ম্মিত পালঙ্কে সুমসৃণ ও সুকোমল শয্যার উপর অভাগিনী সুনন্দা শায়িতা। গৃহমধ্যে কতকগুলি উজ্জ্বল আলো নিঃশব্দে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছিল, সুগন্ধে গৃহখানি ভরপূর। বাহিরে আকাশে অষ্টমীর চাঁদ উঠিতেছিল,—বিধবার হাসির মত ক্ষীণ জ্যোৎস্না, কক্ষের ছাদের উপর পড়িয়া, যেন কোন সুখের বাসরের অতীত স্মৃতিকে খুঁজিয়া বাহির করিতেছিল। আকাশে বাতাস নিস্তব্ধ,—অসংখ্য তারকা অবাক্ হইয়া পৃথিবীর মুখপানে চাহিয়াছিল।

কক্ষের দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ; অভাগিনী সুনন্দা পতিগৃহ হইতে অপহৃতা হইয়া এই কক্ষে নীত হইয়াছে। সুনন্দা আজ বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা, ভগবান পশুপতিনাথের প্রতি তাহার অচলা বিশ্বাস ছিল, আজ সে বিশ্বাসও শিথিল হইতে বসিয়াছে! জনকোলাহল মুখরিত নগরীর বহির্ভাগে ক্ষুদ্র এক পর্ণ কুটীরে সংসার পাতিয়া স্বামীপুত্র লইয়া সে সুখে বসবাস করিতেছিল, তাহার পর তাহার একমাত্র পুত্রের উপর কৃতান্তের দৃষ্টি পড়িল, পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য সে কোথায়

কৃতান্তের সহিত সংগ্রাম করিতেছিল, এমন সময় সে নরপিশাচগণের কবলগতা হইল!—করুণাময় সর্ব্বদর্শী পশুপতিনাথের এমনই দয়া—এমনই বিচার বটে!

সুনন্দা কখনও কাঁদিতেছে, কখনও ভগবান পশুপতিনাথকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহার বিচারের নিন্দা করিতেছে; এমন সময় সহসা কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল, উজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী এক সুন্দর যুবাপুরুষ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইনিই রাজা সদাশিব মল্ল।

কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সদাশিব ধীর পদবিক্ষেপে সুনন্দার ঠিক সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কপোত বাহু বিচ্ছিন্না ব্যাধ-পিঞ্জরবদ্ধা কপোতী যেমন অতর্কিতে ব্যাধকে অতি সন্নিকটে দেখিয়া কাঁপিয়া উঠে, সুনন্দাও তদ্রূপ কাঁপিয়া উঠিল—চকিতে উঠিয়া কক্ষের প্রান্তভাগে গিয়া ধীর স্থির গম্ভীর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইল।

সুনন্দার তৎকালীন অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া লম্পট রাজার হৃদয় ভরিয়া গেল—বাসনার প্রচণ্ড অনল তাহার জ্বলিয়া উঠিল। সুনন্দার একটু নিকটে গিয়া রাজা বলিলেন,—"সুন্দরি! তুমি আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছ; আমি তোমাতে আত্মহারা হইয়াছি, তুমি আমার হও সুন্দরী!"

সুনন্দার আকর্ণবিশ্রান্ত নীল নয়নেন্দীবরযুগল জলে পূর্ণ হইয়া গেল! কিন্তু জল চক্ষু হইতে বাহির হইল না, বৈশাখের নবকাদম্বিনীর ন্যায় জলভারে চক্ষু-যুগল টল টল করিতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে যুবতী বলিল,—"তুমি না দেশের রাজা? তুমি না প্রজাদের মা বাপ? তোমার এই কাজ! তোমার মুখে এই কথা! তুমি জান কি—তোমার অনুচরেরা আমার মুমূর্ষু পুত্রের মৃত্যু-শয্যা হইতে আমাকে টানিয়া আনিয়াছে?—"

সহাস্যে রাজা সদাশিবমল্ল বলিলেন,—"জানি, কিন্তু সে জন্ত

আক্ষেপ করিয়া কি হইবে সুন্দরী ? আমি তোমার প্রেমের ভিখারী, তোমাকে অনন্ত সুখের অধিকারিণী করিব বলিয়াই তোমাকে এখানে আনিয়াছি। সুন্দরি ! আমাকে সুখী কর, নিজে সুখী হও !"

অভিমানে, লজ্জায়, ক্ষোভে সুনন্দার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, গলা ঝাড়িয়া, ঘামিয়া মুখ লাল করিয়া সুনন্দা বলিল,—"রাক্ষস ! পিশাচ ! আমি সুখী হইব ? এ কথা মুখে আনিতেও তোমার লজ্জা হইল না। পুত্র আমার মরণাপন্ন—আমার স্বামী জীবন্মৃত অবস্থায় গৃহে পড়িয়া আছেন,—আর তুমি আমায় সুখী করিবে ! হা পশুপতি নাথ ! এখনও তুমি নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছ ?"

সুনন্দার এরূপ দর্পিতভাব দেখিয়া সদাশিবমল্ল বিস্মিত হইলেন। তিনি অনেক যুবতীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার সম্মুখে কেহই এরূপ দর্পিত ভাবে দাঁড়াইয়া এমন দৃঢ়স্বরে কথা কহিতে সাহসী হয় নাই। রাজা বুঝিলেন, বাহুবলে বা প্রলোভনে এ রমণীকে আয়ত্ত করা অসম্ভব ; অথচ তাঁহার কামকলুষিত হৃদয় আর প্রবোধ মানে না। তখন রাজা সদাশিব কক্ষতলে সজোরে তিনবার পদাঘাত করিলেন। পরক্ষণে দুইটি কৃষ্ণকায় রমণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিল ; তাহাদের প্রত্যেকেরই হস্তে এক একটি অপরূপ পুষ্প ছিল ; সেরূপ পুষ্প সচরাচর দেখা যায় না,—সুনন্দাও কখনও দেখে নাই।

রাজা সদাশিবমল্ল নবাগতা রমণী দুই জনের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। রাজার সে মর্ম্মভেদী কলুষিত দৃষ্টিতে যেন কি কঠোর পৈশাচিক ইঙ্গিত নিহিত ছিল।

রমণীদ্বয় সুনন্দার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল ; স্মিতবদনে বলিল,— "ভগিনী, তোমার কোনও ভয় নাই ; রাজা আমাদিগকে তোমার পরিচর্য্যা করিবার জন্য রাখিয়া গেলেন ; আজ আর রাজা আসিবেন

না ; তুমি ক্লান্ত হইয়াছ—শয্যায় শয়ন কর, আমরা তোমার পরিচর্য্যা করিব।"

সুনন্দা তখনও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল ; তখনও তাহার চক্ষের উপর জগৎসংসার ঘুরিতেছিল ; সে এক প্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়াছিল ; রমণীদ্বয়ের কথার উত্তরে একটি বর্ণও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না। অর্থহীন দৃষ্টিতে নির্ব্বাক ভাবে সে নবাগতা রমণীদের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সুযোগ বুঝিয়া রমণীরা সুনন্দাকে শয্যার উপর লইয়া গেল, সযত্নে তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিল এবং অবসর-ক্রমে তাহাদের হস্তস্থিত সেই অপূর্ব্ব পুষ্প দুইটি যুগপৎ সুনন্দার নাসাতটে ধারণ করিল ; পুষ্পরেণু নিশ্বাসের সহিত সুনন্দার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল ; সে তীব্রগন্ধে সুনন্দার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া উঠিল, অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া অভাগিনী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

পরক্ষণে রমণীদ্বয় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজা সদাশিবমল্ল কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার নয়নে তখন লালসার আভা---মুখে পৈশাচিক হাস্যরেখা !!

৪

আজ নেপালের সীমাপ্রান্তে তুমুল বিপ্লব-বিদ্রোহ উপস্থিত,—প্রান্তসীমার অধিবাসিগণ নেপালেশ্বরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ! কান্তিপুর হইতে পাঁচক্রোশ দূরে গোরক্ষপুর জনপদ অবস্থিত ; এই স্থানে ভগবান গোরক্ষনাথের মন্দির,---এই মন্দিরপ্রাঙ্গনে মহামেলার আয়োজন হইয়াছে, মেলাস্থলে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছে। সহসা এই জনসমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল,—প্রকাশ পাইল, রাজা সদাশিবমল্ল মেলাস্থল হইতে একটি সুন্দরী কুলকন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। রাজা সদাশিব মল্লের লাম্পট্যে নেপালের সর্ব্বসাধারণ

মহা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, একণে চক্ষের উপর রাজার এই ব্যবহার দেখিয়া ও শুনিয়া সমবেত জনগণ একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; অতি দরিদ্র কাঙালের হৃদয়ের রক্তও উষ্ণ হইয়া উঠিল; রাজমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া—পরিণাম চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া,—মৃত্যু ভয় বিসর্জ্জন দিয়া তখন সহস্র সহস্র প্রজা 'মার্ মার্' শব্দে দিক্‌দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া উন্মত্ত ক বেগে ধাবিত হইল।

রাজা সদাশিবমল্লের [illegible] এক শত [illegible] শরীররক্ষী ও পাঁচ জন সহচর ছিল [illegible] সামান্য নগণ্য প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ [illegible] হইবে। একণে প্রজাগণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রাজার আদেশে সৈন্যগণ ফিরিয়া দাঁড়াইল,—আক্রমণকারী [illegible] হইল [illegible] সমুদ্রপ্রমাণ সহস্র সহস্র [illegible] করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজার অধিকাংশ [illegible] আততায়ীদের হস্তে নিষ্ঠুররূপে নিহত হইল; বিপদ্ বুঝিয়া রাজা ও রাজসহচরগণ অপহৃত সুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কিন্তু নদীর বাঁধ একবার ভাঙ্গিলে, তাহার উত্তাল স্রোতের প্রতিরোধ সম্ভবপর নহে। এবার উন্মত্ত জনস্রোত উগ্রবাঁধ জলস্রোতের ন্যায় রাজা ও রাজসহচরগণের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। মেলাস্থল হইতে কান্তিপুরের প্রান্তসীমার মধ্যেই হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ ও রাজার পঞ্চ সহচর প্রজাগণের হস্তে নিহত হইল; রাজা সদাশিবমল্ল প্রাণভয়ে অতি দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিয়া কোনও প্রকারে আততায়ীগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া কান্তিপুর গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত আততায়ীগণ তখনও রাজার অনুসরণে নিবৃত্ত হয় নাই; সহস্র সহস্র প্রজা মার্ মার্ শব্দে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল;

আসিতেছে। সহসা রাজার অশ্বটি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল; সে আর উঠিল না; তাহাকে আর উঠাইবার চেষ্টা না করিয়া বিপন্ন রাজা আত্মরক্ষার জন্য পদব্রজেই ছুটিয়া চলিলেন।

গোরক্ষপুর হইতে কান্তিপুরে প্রবেশ করিলে প্রথমেই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সূর্য্যমলের বাটী। সূর্য্যমল তাহার বাটীর দরজায় বসিয়া আছে; এইমাত্র তাহার পুত্রটি মারা পড়িয়াছে; পুত্রের সৎকার করিবার জন্য লোকের সন্ধানে সে দরজায় আসিয়া বসিয়াছে আর হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে; এমন সময় হাঁফাইতে হাঁফাইতে রাজা সদাশিব মল্ল তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, নিতান্ত ব্যগ্রভাবে কাতরকণ্ঠে করযোড়ে বলিলেন,—"বাপু, দোহাই তোমার—আমাকে বাঁচাও, বিদ্রোহীরা আমাকে মারিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে; আমার আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই, আমাকে আশ্রয় দাও—বাঁচাও; আমি তোমার আশ্রিত আমি তোমার শরণাগত!"

রাজা সদাশিব মল্ল আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার সর্ব্ব-শরীর তখন কাঁপিতেছিল শোকার্ত্ত সূর্য্যমল রাজাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল, তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সেই শোক অবস্থায়ও তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই সে যখন বুঝিতে পারিল— সর্ব্বদেবময় অতিথি তাহার দরজায় দণ্ডায়মান—কাঙ্গালের ন্যায় সে তাহার আশ্রয় প্রার্থী, তখন শোকার্ত্ত বিপদগ্রস্ত সর্ব্বস্বান্ত সূর্য্যমলের শোকমথিত হৃদয় গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রভাবে নূতন উদ্যমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সে সসম্মানে রাজাকে অভিবাদন করিয়া ভক্তিনম্রস্বরে বলিল,—"আপনার কোনও আশঙ্কা নাই, আপনি আমার অতিথি, আমার আশ্রয়ে কেহ আপনার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না; আপনি আসুন।"

রাজাকে লইয়া সূর্য্যমল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার পর

তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আবার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল; সেই সময়ে বিদ্রোহী প্রজাগণ কোলাহল করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছিল; বিদ্রোহীগণ সূর্য্যমলের বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল—"রাজাকে এই পথে যাইতে দেখিয়াছ?"

সূর্য্যমল বলিল,—"দেখি নাই।"

দলের একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ীতে আশ্রয় নেয় নাই তো?

সূর্য্যমল গম্ভীরভাবে উত্তর করিল,—"আমি আশ্রয় দিব? যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—আমার সাধের সংসার শ্মশান করিয়াছে, তাহাকে আমি আশ্রয় দিব?"

বিদ্রোহীদলের অনেকেই সূর্য্যমলকে চিনিত, তাহার সর্ব্বনাশের কথাও জানিত; সে কখনও তাহার সর্ব্বনাশকারীকে আশ্রয় দিতে পারে না বুঝিয়া চলিয়া গেল।

যখন গোলমাল থামিয়া গেল, বিদ্রোহীদল চলিয়া গেল, তখন সূর্য্যমল বাটীর মধ্যে—যে কক্ষে রাজা সদাশিব নল্ল রুদ্ধ নিশ্বাসে বসিয়াছিলেন—সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল, গম্ভীর স্বরে বলিল,—"মহারাজ! আপনি নিরাপদ, বিদ্রোহীরা চলিয়া গিয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"তুমি যেই হও—আমার রক্ষাকর্ত্তা তুমি, তোমার এ উপকার আমি ভুলিব না; আমি তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিব।"

সূর্য্যমল বলিল,—"আর কি পুরস্কার দিবেন মহাশয়? ইতিপূর্ব্বে আপনি আমাকে যে পুরস্কার দিয়াছেন—তাহার কথা জীবনে আমি কখনো ভুলিতে পারিব না।"

বিস্মিতভাবে রাজা বলিলেন,—"আমি তোমাকে পুরস্কার দিয়াছি,—কই আমার তো স্মরণ হইতেছে না!"

সূর্য্যমল বলিল,—দেখিতে চান? দেখিবেন আসুন, দেখিলেই আপনার স্মরণ হইবে।"

সূর্য্যমল রাজাকে সঙ্গে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিল; সেই কক্ষে শয্যার উপর তাহার প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণহীন দেহ পড়িয়াছিল। সূর্য্যমল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজাকে বলিলেন,—"ঐ দেখুন মহারাজ, আপনার দত্ত চমৎকার পুরস্কার!"

রাজা স্তম্ভিত; সূর্য্যমল বলিল,—"বিস্মিত হইতেছেন মহারাজ? এই আমার পুত্র—আমার বংশের দুলাল—অনেক দিন হইতে কঠোর রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, হতভাগার জননী তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত মৃত্যুর সহিত যুঝিতেছিল; কিন্তু আপনি তাহাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে আমি আজ পুত্রহারা! মহারাজ! আপনি আমার পুত্রের মৃত্যুর কারণ, আপনি সহধর্ম্মিণীর অপহরণকারী, আপনি আমার সর্ব্বস্বাপহারক; তথাপি আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম।

ঠিক সেই সময়ে কে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কিন্তু আমি তোকে ক্ষমা করিব না পিশাচ! পরক্ষণে এক আলুলায়িত কুন্তলা রমণী উন্মাদিনীর মত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; সে রমণী—সুনন্দা; তাহার হস্তে এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। সুনন্দা চীৎকার করিয়া বলিল,—"আমি তোকে খুন করিব—এই ছুরা তোর বুকে আমূল বসাইয়া দিব।"

সুনন্দা ছুরিকা হস্তে রাজা সদাশিব মল্লকে আক্রমণ করিতে ছুটিল; কিন্তু সূর্য্যমল ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল—"সুনন্দা, রাজা আমাদের অতিথি—"

বাধা দিয়া সুনন্দা বলিল,—"আর জান কি,—এই রাক্ষস আমার সারধন অপহরণ করিয়া আমায় কাঙালিনী—কলঙ্কিনী করিয়াছে, তোমার বংশে কালি দিয়াছে?"

সূর্য্যমলের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল; দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে সদাশিব বলিল,—"সুনন্দা, আমি রাজাকে আশ্রয় দিয়াছি, ক্ষমা করিয়াছি; আমি জানিতাম—রাজা আমার পুত্রের মৃত্যুর কারণ, আমার পত্নীর অপহরণকারী, এখন জানিলাম—রাজা আমার সাধ্বী স্ত্রীর সতীত্ব-হারী; কিন্তু তবু আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম; সুনন্দা, তুমিও সর্ব্বান্তঃকরণে রাজাকে ক্ষমা করো।"

ছুরি ফেলিয়া দিয়া সুনন্দা কক্ষতলে বসিয়া পড়িল; রাজা সদাশিব মল্ল নির্ব্বাক—নিস্পন্দ।

সূর্য্যমল তখন রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"মহারাজ! মার্জ্জনা করুন; মানুষের মন—কি জানি যদি শেষ পর্য্যন্ত ঠিক রাখিতে না পারি—আপনি এখনি রাজপ্রাসাদে প্রস্থান করুন।"

একটিও কথা না কহিয়া রাজা সদাশিব মল্ল ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

* * * *

কিন্তু উন্মত্ত জনসঙ্ঘ তখনও অপসৃত হয় নাই, পলায়িত রাজা যে নিকটে কোথাও লুকাইয়া আছে—ইহা তাহারা সহজেই অনুমান করিয়া লইয়াছিল; বিদ্রোহীগণ দল বাঁধিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাজা সদাশিব মল্ল সূর্য্যমলের বাটী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পদার্পণ করিবামাত্র, বিদ্রোহীগণের নেত্রপথবর্ত্তী হইলেন। অমনি চীৎকার করিতে করিতে বিদ্রোহীদল রাজার উপর আপতিত হইল—সকলেই নিষ্ঠুররূপে রাজাকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল, দারুণ প্রহারে মৃতকল্প অবস্থায় রাজা সদাশিব মল্ল ভূপতিত হইলেন; আততায়ীগণ তাহাতেও নিরস্ত হইল না, পতিত রাজার অঙ্গেই অধিকতর উৎসাহ সহকারে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল; তাহার

ফলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রাজা সদাশিব মল্লের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এদিকে কোলাহল শুনিয়া সূর্য্যমল ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল; দেখিল, নিষ্ঠুর বিদ্রোহীগণের অস্ত্রাঘাতে নেপালেশ্বর সদাশিব মল্ল নিহত! সূর্য্যমলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল;—আততায়ীদিগকে লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যমল বলিল,—"তোমরা কি করিলে—রাজহত্যা করিলে? রাজার রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিতে তোমাদের প্রাণ কাঁপিল না?"

দলের অনেকেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"তুমি কি বলিতেছ? অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করিয়া আমরা অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছি।"

সূর্য্যমল বলিল,—"তোমরা ভুল বুঝিয়াছ; যদি আজ তোমরা রাজাকে হত্যা না করিতে, রাজা যদি আজ নিরাপদে রাজপ্রাসাদে ফিরিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর তোমরা তাঁহাকে অত্যাচারীরূপে দেখিতে পাইতে না—তোমরা তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রাণ প্রজাবৎসল সাধু চরিত্র রাজারূপে পাইয়া ধন্য হইতে! কিন্তু তোমরা সে সুযোগ হেলায় হারাইলে!"

একজন বলিল,—"তুমি কি বলিতেছ?"

আরও অনেকে চীৎকার করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"তোমার কথা যে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।"

সূর্য্যমল বলিল,—"আমার কথা যদি শোনো, তাহা হইলে তোমরা সমস্তই বুঝিবে, আমি রাজা সদাশিব মল্লকে আশ্রয় দিয়াছিলাম, এই রাজার হস্তে এ রাজ্যের মধ্যে আমিই সকলের অপেক্ষা অত্যাচারিত, রাজা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আমার সংসারে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, আমার সহধর্ম্মিনীকে হরণ করিয়া লইয়া

গিয়া তাহার সারধর্ম্ম অপহরণ করিয়াছে,—তাহা জানিয়াও আমি ইহাকে আশ্রয় দিয়াছি, ক্ষমা করিয়াছি। তাহার ফলে রাজা প্রকৃতিস্থ হইতেন—তাঁহার জীবনের গতি একেবারে ফিরিয়া যাইত, কিন্তু তোমরা তাহাকে হত্যা করিয়া বসিলে! তোমরা বুঝিলে না যে, অত্যাচারের পরিবর্ত্তে অত্যাচার প্রতিশোধ নয়,—অত্যাচারীর উপকার করাই অত্যাচারিতের মর্ম্মান্তিক প্রতিশোধ!"

গেঁটে নন্দা।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত।

নন্দরাম মুখোপাধ্যায়কে সকলে "গেঁটে নন্দা" বলিয়াই জানিত; ভাল নাম বলিলে তাহাকে কেহ চিনিতে পারিত না। বামনাকৃতি—স্থূলকায় নন্দরাম—দৈর্ঘ্যে বড় বৃদ্ধি পায় নাই—বরং আড়েই বাড়িতেছিল। লোকে বলিত—"একে বেঁটে—তায় ষণ্ডা, নন্দার গেঁটে গেঁটে বুদ্ধি—পেটে পেটে নষ্টামি!" যাহা হউক—নন্দরাম সহরের একজন অতি তুখোড় লোক। সমবয়সীরা "নন্দা" বলিত, প্রাচীন লোকেরা "গেঁটে" বলিত, যাহারা খাতির করিত—বা ভয় করিত—তাহারা তাহার সম্মুখে বলিত "মুখুয্যে মশাই"—আড়ালে বলিত—"গেঁটে নন্দা।"

নন্দরামের পৈতৃক বাসস্থান কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন এক পল্লীগ্রামে। তাহার পিতামহ সহরে কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন, সেই অবধি তাহাদের কলিকাতায় বাস। মাঝে মাঝে—পূজার সময়—কিম্বা আবশ্যক হইলে দেশে যাইত। সেকালে কলিকাতায় জমীর দর এত মহার্ঘ ছিল না,—নন্দরামের পিতামহ

চেষ্টাচরিত্ত করিয়া একখানি মাঝারি রকমের বসতবাটী প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন।

সহরের সুবিখ্যাত মিত্রবংশ নন্দরামের পৈতৃক আশ্রয়দাতা—অন্নদাতা। মিত্রবংশের কর্তারা তিন চারি পুরুষ ধরিয়া কোন একটী বড় সওদাগরী আফিসের মুৎসুদ্দিগিরি করিয়া আসিতেছেন। নন্দরামের পিতামহ মিত্রবংশে বাজার সরকার হইয়া প্রথমে নিযুক্ত হইয়াছিল। পরে বাবুকে খোসামোদ করিয়া আফিসে Bill-Collcting সরকারের পদ পান। সেই অবধি মিত্রবংশধরগণের মুৎসুদ্দিগিরি লাভের সঙ্গে সঙ্গে নন্দরামের পৈতৃক সরকারি পদও লাভ হইল।

শৈশবকাল হইতেই নন্দরামের দেহের শক্তি,—বুদ্ধিচাতুর্য্য—কথাবার্ত্তা খুব প্রশংসনীয়। দাঙ্গাহাঙ্গামে নন্দ সর্ব্বাগ্রে যাইয়া লাঠী চালায়; কেহ কোনও বিপদে পড়িলে নন্দের বুদ্ধিকৌশল ভিন্ন উদ্ধার হয় না; মজলিসে নন্দ এমন রগড়ের কথা কহিত যে হাসিয়া হাসিয়া লোকের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইত; লেখাপড়ার দৌড় ষষ্ঠশ্রেণী পর্য্যন্ত। নন্দ কখনো বই কিনিয়া পড়ে নাই। এর তার কাছে চাহিয়া যতদূর হইত—তাহাতেই চালাইত। বই কিনিবার কথা শিক্ষকে উত্থাপন করিলে বলিত—"গরীব মানুষ—কোথায় পয়সা পাব—আপনি একখানা কিনে দিন্‌না। আমি তো আপনার ছেলের মতন!" শিক্ষকও আর কিছু বলিতেন না। নন্দরাম ক্লাসে বড় গোলমাল করিত, একদিন শিক্ষক মহাশয়ের ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিল,—তিনি নন্দরামের মাথা দেয়ালে ঠুকিয়া দিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার পর পথে সেই হতভাগ্য শিক্ষকটীকে ধরিয়া নন্দরাম তাঁহার দুটী কাণ মলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সেই অবধি নন্দরামের লেখাপড়া ত্যাগ। নন্দরাম বলিল—"দূর হোক্‌ ঘোড়ার ডিমের বই পড়া! আমাদের তিন-পুরুষের সরকারি—বজায় থাক্‌!"

"গেঁটে নন্দার" দৌরাত্ম্যে সকলেই অস্থির। পাড়ায় একটী পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ী ছিল। "নন্দরাম" প্রমুখ যত বদ্‌ছেলের আড্ডা সেই বাড়ীতে। সন্ধ্যার পর কুল্‌পি-বরফওয়ালা—খাবারওয়ালা—চানাচুরওয়ালা ইত্যাদি ডাকিয়া সকলে মিলিয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া পশ্চাদ্দিকের পাঁচীল টপ্‌কাইয়া বেমালুম সরিয়া পড়িত। বেচারীরা ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির,—শেষে জুয়াচুরী বুঝিতে পারিয়া তাহারা গোলমাল করিত—পাড়ার লোকজন জড় করিত—শেষে কোন উপায় না করিতে পারিয়া চৌদ্দপুরুষান্ত করিয়া চলিয়া যাইত। পাড়ার লোকে কেহ কোন কথা বলিত না—কারণ—"গেঁটে নন্দার" সঙ্গে লাগা বড় সোজা কথা নয়।

নন্দরাম তাহার খুল্লতাত-পুত্র হরেকৃষ্ণের সহিত জ্যেষ্ঠপুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে দেশে গমন করিতেছিল। ষ্টেশন হইতে নামিয়া প্রায় চারিক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া তবে বাড়ী পৌঁছিতে হয়। যাইতে যাইতে ক্লান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে দুই ভায়ে বিশ্রাম করিতে বসিল। এমন সময় একজন গোয়ালা একভার টাট্‌কা ছানা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। নন্দরাম তামাকু সেবন করিতেছিলেন, কলিকাটী লইয়া গোয়ালাকে লইয়া বলিল—'বড় হেরোম হয়েছে—একবার তামাক ইচ্ছে কর!" ঘোষের পো যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। নন্দরাম অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইয়া—একটু হ্যাকাহাবা সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার ঝুড়ীতে কি বাপু? চুণ নাকি?" গোয়ালা বলিল—"না—না—চুণ নয়—টাট্‌কা ছানা! কল্‌কেতায় চালান দিতে নিয়ে যাচ্ছি!"

নন্দরাম যেন অবাক্ হইয়া বলিল "ছা—না? কি পাখীর ছানা! গাছ থেকে পেড়েছ?" গোয়ালা হাসিয়া বলিল—"সেকি ঠাকুর? ছানা জাননা? দুধে তৈরি হয়!—এই থেকে খোজা

সন্দেশ রসগোল্লা তৈরি হয়! তুমি ছানা কখনো খাওনি—কখনো দেখনি?

হরেকৃষ্ণ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। নন্দরাম তাহাকে ভ্রূকুটী করিয়া সাবধান করিয়া দিয়া গোয়ালাকে বলিল—এঁ্যা—ছানা এমন জিনিষ! আহা আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক- এ সব জিনিষের স্বাদ কি ক'রে বুঝবো? আমরা নারকুল দিয়ে সন্দেশ তৈরি হয়—তাই বরাবর জানি—তাই বরাবর খেয়ে থাকি! আহা—ছা-না! গাছের নয়—জানোয়ারের নয়—একেবারে দুধের! আহা—না জানি—কি রকমই বা খেতে লাগে।" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া গোয়ালার মনে কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হইল। ঝুড়ী হইতে খানিকটা ছানা লইয়া নন্দরামকে দিয়া বলিল—"এই নাও ঠাকুর- খানিকটা সেবা কর!" একগাল দাঁতের হাসি হাসিয়া বাহুল্যতার পূর্ণ আগ্রহে ছানা লইয়া নন্দ বলিল-"আহা -বেঁচে থাক -বেঁচে থাক! তোমার গয়লাবংশের শ্রীবৃদ্ধি হোক্! একটু ছা-না খেয়ে দেখি!" এই বলিয়া নির্ব্বিঘ্নে সেই সমস্ত ছানাটী গলাধঃকরণ করিল। ছানা খাওয়া শেষ হইবামাত্রই নন্দরাম চোখ কপালে তুলিয়া—বিকৃতমুখ করিয়া—হাত পা ছুঁড়িয়া—মাটীতে পড়িয়া বিকট চীৎকার করিয়া বলিল-"হরা! গলা কাটে—গলা কাটে! ওরে—কি জিনিষ খাওয়ালে—রে—" হরেকৃষ্ণ নন্দরামকে বিলক্ষণ চিনিত—হাজার হোক্—ভাইতো বটে! দাদার মতলব তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়া একেবারে গয়লার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া—তাহাকে উপর্য্যুপরি কিল চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—"ওরে বাঁদী—কি সর্ব্বনাশ কল্লি? কি বিষ এনে খাওয়ালি? ব্রহ্মহত্যা কল্লি! আমার দাদা যে সিঁটকে পড়ল! দাদা যে আর নড়েনা. রে শালা গয়লা! চল্ ফাঁড়ীতে—চল্ তোকে ফাঁসি দোবো।" গোয়ালপো প্রথমটা যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল! কিন্তু

নন্দরামের অকস্মাৎ এই রকম দশাপ্রাপ্তি দেখিয়া ভাবিল—"হয়তো ছানাতে কোনরকম বিষাক্ত সাপে মুখ দিয়ে—সমস্ত ছানাটা বিষাক্ত করেছে—বামুন তাই খেয়ে একেবারে সদ্য সদ্য মারা পড়্ল!" যেমন এই কথা ভাবা—আর অমনি ছানার বোঝা ফেলিয়া গোয়ালা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়্। দৌড়্—দৌড়্! হরেকৃষ্ণ "ধর্—ধর্—খুনে ধর্" বলিয়া খানিকদূর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল,—যখন দেখিল সে একেবারে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে—তখন হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া নন্দরামকে বলিল—"দাদা—একবার ওঠো!"

নন্দ হাসিমুখে উঠিয়া বলিল—"এইবেলা ছানার বোঝাটা নিয়ে সরে পড়ি চল্! দুজনে মনটাক হবে! দুজনে ভাগাভাগী করে গামছায় বেঁধে নিয়ে যাই চল্—শিগ্‌গির পৌঁছে যাব! ব্যাটাকে খুব ভাগানো গেছে কিন্তু!" এই বলিয়া দুই ভ্রাতায় পরামর্শমত ছানা লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল।

মিত্রবংশের বাবুরা নন্দরামকে ভালবাসিত এবং যত্ন করিত,—আপনার গুণে নন্দরাম আফিসের সাহেবদিগেরও সেইরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। বিলকলেক্‌টিং সরকারের কাজ, তাদৃশ লেখাপড়া জানিবার আবশ্যকও নাই—নন্দরাম তো সাক্ষাৎ "মা সরস্বতী"! কোন রকমে ইংরাজি বাঙ্গালা হিন্দি মিশাইয়া সাহেবদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিত। তাহার কথা শুনিয়া হাতমুখ নাড়া দেখিয়া সাহেবরাও পরম পরিতোষ লাভ করিত। একদিন ছোট সাহেবের ছেলেকে দুধ খাওয়াইবার জন্য একটী গৰ্দ্দভ কিনিবার প্রয়োজন হয়। নন্দরামকে ছোটসাহেব নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাহেব মেম ঘরে বসিয়া আছেন,—নন্দরাম লম্বা সেলাম ঠুকিয়া—Good Morning Father Mother বলিয়া গিয়া দাঁড়াইল। (নন্দরাম

সাহেব মাত্রকেই "ফাদার" এবং মেম দেখিলেই "মাদার" সম্বোধন করিত)। সাহেব ইংরাজিতে বলিলেন—"আমাদের ছোট ছেলেটীর জন্ত একটী ভাল দেখিয়া গর্দ্দভ কিনিয়া দিতে পারিবে?" নন্দরাম আপনার ইংরাজিতে বলিল "কেন পার্ব্বনা ফাদার? এখুনিই এনে দিচ্ছি।" সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "কত টাকা দরকার?" নন্দ বলিল "অন্ততঃ শতাবধি টাকার নীচে একটা ভাল গাধা পাওয়া যায় না।" সাহেব তৎক্ষণাৎ এক শত টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"যত শীঘ্র পার আনিয়া দাও।" নন্দরাম—"বেশ!" বলিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ফাদার! কি রকম গাধা চাই!" সাহেব বলিলেন "খুব ভাল।" নন্দরাম মহামুস্কিলে পড়িল। তাহার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী চাই। কিন্তু ইংরাজিতে কি বলিতে হয় তাহা জানে না। অগত্যা বলিল—"Father! you ass or memsahib ass? (তোমার মতন গাধা কিম্বা মেমসাহেবের মতন গাধা)!" সাহেব মেম পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া চেয়ারে বসিয়া হাসিয়া লুটোপুটী খাইবার উপক্রম। নন্দরাম একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল; সাহেব বলিলেন, "হাঁ। মেমসাহেবের মতন গাধা!" নন্দরাম হুকুম বুঝিয়া লইয়া ২৫৲ টাকায় একটী ভাল স্ত্রী গর্দ্দভ কিনিয়া আনিয়া বলিল—"৯৭৷৵১৫ টাকায় কিনিয়াছি—" এই বলিয়া বক্রী ২৷৵৫ সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল। সাহেব বলিলেন "বখ্‌শিস্‌ নিয়ে যাও।" নন্দরাম উঠিয়া পড়িয়া সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিল, "তোমরাই ফাদার—তোমরাই মাদার! আমি গরীব, আমার এই দুটাকা ছ' আনাই দু লক্ষ টাকা!"

অফিস হইতে চিফ্‌ জষ্টিসের বাড়ীতে প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে একটী জিনিষ অর্ডার মতন পাঠানো হইয়াছিল—অদ্যাবধি তাহার বিলের

টাকা আদায় হইতেছে না। অফিসের বড় সাহেব মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন্ যাহার উপর এই বিল তাগাদার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সে বলিল, "ধর্ম্মাবতার,! আমার অপরাধ কি বলুন! আমি প্রত্যহই তাগাদা করিতে যাই, কিন্তু দরোয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে দেয় না।" বড় সাহেব নন্দকে সে কাজের ভার দিলেন। নন্দ তাহার পরদিন ঠিক বেলা একটার সময় চিফ্ জষ্টিসের বাড়ী গিয়া দ্বারবানকে তাড়াতাড়ী বলিল— "শিগ্‌গির সাহেবকে খবর দাও- গ্ল্যাড্‌ষ্টোন সাহেব দেখা কর্ত্তে এসেছে।" দ্বারবান বলিল—সাহেব নাই, কোর্টে গেছেন। "নন্দ বলিল—"মেমসাহেব তো আছেন, তাঁহাকেও খবর দিলে চলিবে। যাও—যাও—দেরী কোরো না—নইলে তোমার এখুনি চাক্‌রী যাবে।" দ্বারবান তাড়াতাড়ী মেমসাহেবকে খবর দিতে গেল। ইত্যবসরে নন্দ সেই ময়লা পোষাকে দ্বারবানের পশ্চাতে পশ্চাতে উপরতলায় নিঃশব্দে গিয়া উপস্থিত। মেমসাহেব দ্বিপ্রহর রৌদ্রে চারি দিক বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন; দ্বারবানের নিকট শুনিলেন —"গ্ল্যাডষ্টোন সাহেব হাজির"—কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ী ঘরের বাহিরে যেমন ব্যাপার কি দেখিতে আসিলেন,— অমনি তৎক্ষণাৎ সেই অপূর্ব্ব চেহারা "গেঁটে নন্দা" বিলখানি লইয়া খুব মাথা নীচু করিয়া সেলাম ঠুকিয়া বলিল "Mr. Gladsone is understood-Mother! I his Bill collecting Sircar! one Bill has Mother;—every day Ten times come and Tentimes go. No money—No paym[illegible]—six months gone." "অর্থাৎ" মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন্ আসেনি মাদার! আমি তাঁর সরকার! একখানা বিল আছে মাদার! রোজ দশ বার আমি দশবার ফিরে যাই! আজ ছ মাস হ'ল—টাকা পাচ্ছি না! বলিয়া অত্যন্ত

কাতর ভাবে জোড় হস্তে ভাল মানুষটীর মতন দাঁড়াইয়া রহিল। মেমসাহেব মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইয়া তৎক্ষণাৎ বিলের টাকা তো সমস্ত চুকাইয়া দিলেন, উপরন্ত নন্দরামকে ৫৲ টাকা বখসিস্ করিয়া বিদায় দিলেন। আফিসের বড় সাহেব নন্দরামের কাজে খুসী হইয়া তৎক্ষণাৎ দু টাকা বখ্সিসের হুকুম করিলেন।

সেবার নন্দরাম তাহার এক ভগ্নীপতিকে বড় জব্দ করিয়াছিল। ভগ্নীপতি এক অদ্ভুতপ্রকৃতির লোক। যে দিন শ্বশুরবাড়ীতে আসিত, একেবারে বৈঠকখানায় না বসিয়া, কাহাকে কিছু না বলিয়া বাড়ীর ভিতরে সটান গিয়া উপস্থিত হইত। বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা হয় তো মাথার কাপড় খুলিয়া অন্যমনে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে, একেবারে জামাই হঠাৎ গিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত। নন্দরাম বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুবান্ধবকে লইয়া গল্পগুজব করিতেছে—এমন সময় জুতার শব্দ শুনিয়া নন্দ জিজ্ঞাসা করিল--"কে রে--কে যায়?" জামাইবাবু কথা না কহিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। তাহার পর নন্দ উঠিয়া খবর লইল জামাইবাবু আসিয়াছেন। নন্দ মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মাকে বলিল—"এ কি রকম লোক? কথার উত্তর দিতে পারে না? নন্দর মা বলিতেন—"আহা ছেলেমানুষ—তায় মুখচোরা ----কিছু বলিস্ নি বাবা!" নন্দ মনে মনে স্থির করিল "এক দিন ইহার ঔষধ দিতে হইবে!" এই বলিয়া ওৎ করিয়া এক দিন বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর বসিয়া রহিল। জামাইবাবুর দুরদৃষ্ট—ঠিক সেই ভাবে নিঃশব্দে সাড়া না দিয়া যেমন বাড়ীর ভিতর যাইবেন, অমনি নন্দরাম ছুটিয়া গিয়া অন্ধকারে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া খুব উত্তম মধ্যম প্রহার দিল। জামাইবাবু প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ী আলো লইয়া আসিয়া দেখিল,—নন্দরাম জামাইকে [illegible] —তেছে! নন্দরামের মা বলিল,—"হাঁ—হা—করিস্ কি—[illegible]

নন্দ।" নন্দরাম যেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"ইস্—বড্ডই ভুল হয়ে গেছে মা। অন্ধকারে চিন্‌তে পারিনি। কাল সন্ধ্যের সময় বাড়ী থেকে রূপোর হুঁকোটা চুরি গেছে—আমি চোর মনে করে ধরে ছুষা দিয়েছি! আমি ঐ জন্যেইতো দশবার জিজ্ঞাসা কল্লুম—কে-হে—কে-হে! জামাই বাবু—কথা না কওয়াতেই বড়ই বিভ্রাট ঘটে গেল!" নন্দরাম মৌখিক অনুতাপ করিতে ২ জামাইবাবুর পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইতে লাগিল এবং বলিল —"কিছু মনে কোরোনা ভাই—হঠাৎ হয়ে গেছে!" জামাই বাবুর যথেষ্ট আক্কেল হইল।

নন্দরামের একটু পানদোষ ছিল পল্লীর সকলেই জানিত। একদিন নন্দ নিজ বাড়ীতে ছেলেপুলে ভায়েদের সহিত একত্রে বসিয়া আছে এমন সময় পাড়ার নরহরি চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্যক্তি তাড়াতাড়ী আসিয়া বলিল—"নন্দ! তোমাদের বোতলে ব্রাণ্ডি থাকেতো একটু দাওতো; আমার স্ত্রী কলতলায় আছাড় খাইয়া হাতে বড় চোট্ পাইয়াছে— একটু মালিস্ করিয়া দিব।" নন্দ ছেলেপুলে এবং ভায়েদের সম্মুখে মদের কথায় অত্যন্ত লজ্জিত এবং রাগত হইল। কিন্তু সে সময় সে ভাব কিছুই প্রকাশ করিল না। গম্ভীরভাবে নরহরিকে বলিল—একটা শিশি পাঠিয়ে দাও—সন্ধান করে ব্র্যাণ্ডি দিচ্ছি!" নরহরি শিশি আনিয়া দিল। নন্দরাম সেই শিশি লইয়া কলুদের বাড়ী ছুটিয়া বহুমূত্ররোগগ্রস্ত বৃদ্ধ কলুকে বলিল—"তুমি রোগের যদি চিকিৎসা করাতে চাও—তাহ'লে এই উপযুক্ত অবসর। একজন সাধু সন্ন্যাসী বহুমূত্র রোগের খুব ভাল চিকিৎসা বিনামূল্যে করিতেছেন। তুমি এই শিশিটা তোমার মূত্রে পূর্ণ করিয়া দাও;—তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ঔষধ দিবেন; তাহাতে তুমি জন্মের মতন আরোগ্য লাভ করিবে।" রুগ্ন কলু-বৃদ্ধ যেন হাতে স্বর্গের চাঁদ পাইল। তৎক্ষণাৎ শিশিটী মূত্রে পরিপূর্ণ করিয়া দিল—কিন্তু নন্দরামের হস্তে দিতে স্বীকৃত

হইল না। নন্দরাম বলিল—"তাহাতে দোষ নাই। তোমার কোন লোক সঙ্গে গেলে ঔষধের ফল হইবে না। তুমি পাড়ার লোক—আমাদের অনেক দিনের পরিচিত—তোমার একটা উপকার করিব না?" কলুকে বুঝাইয়া নন্দরাম সেই শিশি আনিয়া নরহরিকে প্রদান করিল।

ব্রাহ্মণ মহা তুষ্ট হইয়া তাড়াতাড়ী বাড়ী গিয়া স্বহস্তে সেই মূত্র লইয়া গৃহিনীর আঘাতপ্রাপ্ত হস্তে মালিস করিতে লাগিল। দুই চারি-বার মালিস করিতে না করিতেই—সেই বহুকাল যাবৎ বহুমূত্র রোগ-গ্রস্ত কলুবুড়ের মূত্রের দুর্গন্ধে সে স্থানে থাকা দায় হইয়া উঠিল। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ভীষণ উদ্গার উঠিতে লাগিল। চক্রবর্তীগৃহিণী বলিল—"ওগো—কি মদ এনেছ গো! ওগো—দুর্গন্ধে প্রাণ বেরিয়ে গেল যে গো! এর চেয়ে হাতের বেদনা যে আমার লক্ষ গুণে ভাল ছিল গো!" নরহরি বলিল—"তাইত—গেঁটে নন্দা কি ব্রাণ্ডি দিলে! এ যে বিশ্রী পেচ্ছাবের দুর্গন্ধ!" নরহরি-পত্নী তৎক্ষণাৎ গাত্র ধৌত করিতে গেল। নরহরি শিশি লইয়া নন্দরামের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁরে নন্দ—শিশিতে কি দিয়েছ—দুর্গন্ধে প্রাণ যায় যে!"

নন্দ বলিল—"তা কলুবুড়োর এতকালের ডাইবিটিস্—তার পেচ্ছাবে কি গোলাপের গন্ধ বেরুবে? শালা চক্রবর্তী বামুন! নন্দরামের কি মদের ভাঁটী আছে রে শালা? নন্দরাম কি শুঁড়ী যে বাড়ীতে মদ ধর ক'রে রাখবে—আর তুমি সকলের সামনে দাঁত বার ক'রে চাইবে? বামুনের ঘরের গরু!—সভ্যতা শেখোনি! যাও—গোবোর মেখে গঙ্গাস্নান করে এস—নইলে হাতে ক'রে অতক্ষণ রোগীর পেচ্ছাব ঘেঁটেছ—এখুনি ধবল বেরুবে!" নরহরি অবাক্ হইয়া—শিশি ফেলিয়া—ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

নন্দরাম ভাঙ্গাবাড়ীতে অনুচরবর্গ লইয়া এক সখের যাত্রার দল

বসাইল। দুই বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত তাহার মহলাই চলিতে লাগিল। সেটী তো আর যাত্রার দল নয়—একটী মদের আড্ডা। যত মাতাল একত্রে জুটিয়া মদ খাইয়া প্রত্যহ রাত্রে হল্লা করে। যাহা হউক—পালা স্থির হইল "সাবিত্রী-সত্যবান।" নন্দরাম "যম" সাজিবে। বহুদিন ধরিয়া রিহার্স্যাল্ দিয়া সকলেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। এইবার পূজায় পালা গাহিতে হইবে। কিন্তু কোন ভদ্রলোক গেঁটে নন্দার দলের নাম শুনিয়া বাড়ীতে যাত্রা দিতে চাহেনা। অনেক সন্ধান করিয়া শেষে এক ধনবান শুঁড়ীর বাড়ীতে যাত্রা গাহিবার নিমন্ত্রণ পাইল। নবমীপূজার শেষ রাত্রে গাওনা—বিজয়ারদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত—তাহাতে খাস্ শুঁড়ীর বাড়ী! দলস্থ সকলের মহা আনন্দ! নন্দরাম বলিল—"যাত্রা গাহিতে গাহিতে মদ খাওয়া হইবে না! যাত্রা শেষ হইলে যাহা হয় হইবে!" সকলেই নন্দরামের আজ্ঞাধীন। শুঁড়ী সখের দলের জন্য বাড়ীতে যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিল। নবমীর রাত্রে পঞ্চাশখানি সেকেণ্ড ক্লাস্ গাড়ী আসিয়া যাত্রার দল বাড়ীতে লইয়া গেল। রাত্রি চারিটার সময় গাওনা আরম্ভ হইল। নন্দরামের আদেশে কেহ মদ স্পর্শ করে নাই। বাড়ীওয়ালাকে বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যেন যাত্রার সময় একবিন্দু মদও না সাজ ঘরে আনা হয়। ক্রমে দু ঘণ্টা গাওনার পর—নন্দরাম নিজে বাহিরে গিয়া দোকান হইতে একপাত্র টানিয়া আসিল। ক্রমে তাহার দেখাদেখি দলস্থ অন্যান্য সকলে সসজ্জাবস্থায় বাহির হইতে একটু একটু টানিয়া আসিতে লাগিল। বাড়ীওলা দেখিল—ইহাতে যাত্রার বড় অসুবিধা হইতেছে। তখন সে আসিয়া নন্দরামকে বলিল—"আপনাদের লোক-জন—বাহিরে গিয়া কেন এত কষ্ট কচ্ছেন?—আমার ঘরে কেস্ কেস্ হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি মজুৎ—একবার হুকুম করুন—এখুনি আনিয়া দিই!" নন্দরাম প্রভৃতি দলস্থ অনেকেই সবেমাত্র গলাটুকু ভিজাইয়াছে

তৎক্ষণাৎ হুকুম হইল মদ লেয়াও! আর না হ'লে গলা বেরুচ্ছে না!" হুকুম হইতে না হইতেই একেবারে তিন কেস্ বিলাতি মদ—সোডা—লেমনেড ইত্যাদি সাজঘরে আসিয়া হাজির। নন্দরাম বলিল—"কেউ বেশী খেওনা! মাতাল হ'লে যাত্রা গাইতে পার্ব্বে না!" সকলেই বিজ্ঞের মতন বলিল—"আরে রাম বল,—বেশী খাব কেন? আমরা কি এত মূর্খ?" একটু একটু করিয়া চলিতে চলিতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সকলে একেবারে গভীর জলে গিয়া সাঁতার দিতে সুরু করিল। তখন পালা অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছে। ইহারই মধ্যে আসরে সাবিত্রীও টলিতেছেন—সত্যবানও পড়েন আর কি! তবে সত্যবানের এক ভরসা তিনি একটু বাদেই মরিতে পাইবেন। তাহ'লেই তাঁহার নিষ্কৃতি! এইবার "যম" স্বয়ং "নন্দরাম" আসরে নামিবেন; তিনি পোষাক আঁটিয়া ঠিক হইয়া বসিয়া আছেন। সকলে দেখিল "যমের" অবস্থা বড়ই শোচনীয়—মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। বাড়ীওয়ালাটী অতি ভাল মানুষ! যমের অবস্থা দেখিয়া বলিল—"পালা এবার না হয়—এই পর্য্যন্ত থাক্—একটু কন্সার্ট বাজিয়ে যাত্রা ভাঙ্গিয়ে দিই!" নন্দরাম বলিল—"কি? এত বড় কথা? আমার বেরুবার সময় যাত্রা ভেঙ্গে যাবে? তা হবেনা! ঐ বেল্ দিচ্ছে—আমায় আসরে ডাকছে! ছেড়ে দাও—বল্‌ছি—ছেড়ে দাও।" বলিয়া ধস্তাধস্তি করিতে করিতে "যমরূপী" নন্দরাম সেই পোষাক পরা অবস্থায়,—সাজঘরে যে খুব বড় এককড়া হালুয়া রান্না হইয়াছিল,—তাহারই উপরে বসিয়া পড়িল। পড়িয়াই পাঁচজনের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া—সকলকে ধাক্কা মারিয়া—পশ্চাদ্ভাগে হালুয়ামাখা—শুদ্ধ আসরে গিয়া উপস্থিত। শ্রোতারা যমের রকম দেখিয়া হৈ-হৈ শব্দে উঠিয়া পড়িল। সেই পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা এই সুযোগে যমের অঙ্গ হইতে খাব্‌লা খাব্‌লা হালুয়া তুলিয়া খাইতে লাগিল। বাড়ীওলা অনেক কষ্টে যাত্রা ভাঙ্গাইয়া দর্শক

বৃদ্ধকে বিদায় করিল। সেই অবধি "গেঁটে নন্দার" যাত্রার দল উঠিয়া গেল।

একবার পূজার সময় নন্দরাম তাহার ভ্রাতা হরেকৃষ্ণকে লইয়া পাড়ার কোনও এক ব্রাহ্মণবাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণবাড়ীতে অন্ন ব্যঞ্জন মৎস্যাদির যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল। পাতা প্রস্তুত—ব্রাহ্মণদিগের ডাক হইয়াছে; একেবারে প্রায় দুইশত ব্রাহ্মণ একত্রে বসিবে—এইরূপ ভাবে আহারের স্থান হইয়াছে। নন্দরাম ও হরেকৃষ্ণ উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিল। এমন সময় নন্দরাম ভ্রাতাকে বলিল—"হরো। এক কাজ কর্ দিকি। আমাদের দুজনের জুতো-টা একটা ঠিকানায় সরিয়ে রেখে আয়—নইলে এত গোলমালে—এত ভীড়ে শেষে খুঁজে পাওয়া দায় হবে। তুই যা ভাই—আমি তোর পাতা আগলে রাখছি।" হরেকৃষ্ণ উঠিয়া নন্দের আদেশমত কার্য্য করিতে গেল। এমন সময় একটা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ী সেই পাতে আসিয়া বসিয়া পড়িল। নন্দরাম বলিল—"আজ্ঞে—এটা একজনের পাতা! সে এইমাত্র উঠে একটা কাজে গেছে—।" বৃদ্ধ একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"পাতায় কি নাম লেখা আছে নাকি? আরওতো বিস্তর পাতা রয়েছে—সে এসে বস্‌তে পারেনা?" নন্দরাম বৃদ্ধকে কিছু বলিল না—চুপ করিয়া রহিল। হরেকৃষ্ণ তাহার পাতে অন্যজন বসিয়াছে দেখিয়া অন্যস্থানে আহার করিতে বসিল। নানা প্রকার ভাজাভুজি তরকারী পরিবেশনের পর—মৎস্য বাহির হইল। বাড়ীওয়ালার আদেশছিল—"বয়স অনুসারে ছোট বড় মাছের মুড়া দেওয়া হইবে।" নন্দরামের পার্শ্বের সেই বৃদ্ধের পাতে পরিবেশনকারী এক বৃহৎ রোহিত মৎস্যের মুড়া দিল। বৃদ্ধ মহা খুসী হইয়া পরিবেশনকারীর দিকে চাহিয়া তাহাকে একটু আপ্যায়িত করিতে লাগিল—"কেমন আছ—তোমাদের বাড়ীর সকলে

কেমন আছে— ইত্যাদি ;" ইত্যবসরে বৃদ্ধকে অন্যমনস্ক দেখিয়া নন্দরাম বেমালুম তাহার পাত হইতে মাছের বৃহৎ মুড়াটী নিজের পাতে লইয়া তন্নিবিষ্টচিত্তে তাহার সদ্গতি করিতে আরম্ভ করিল। পরিবেশনকারী চলিয়া গেলে—বৃদ্ধ আহার করিতে গিয়া দেখিল—"সাধের মুড়াটি তো নাই! কোথায় গেল?" নন্দরামের পাতে চাহিয়া দেখে—সেই বেটে ছোক্‌রাটি প্রাণ ভরিয়া তাহার মুড়া লইয়া চুষিতেছে! বৃদ্ধ অবাক্! এত বড় পাষাণ্ড—অর্ব্বাচীন কখনো সে জীবনে দেখে নাই! বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ নন্দরামকে বলিলেন—"তোমার এ কিরকম আক্কেল হে ছোক্‌রা! আমার খাওয়া নষ্ট করে?" নন্দ সে কথায় বাধা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"নাঃ—আমাদের খাওয়া নষ্ট হবে কেন? আপনার অসুখ ক'চ্ছে? আপনি সচ্ছন্দে উঠে যান না!" এই কথা বলিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া নন্দরাম উচ্চৈঃস্বরে বলিল —মশাইরা যদি অনুমতি করেন—তাহ'লে এই প্রাচীন লোকটী উঠতে পারেন! এঁর হঠাৎ পেটের পীড়া হয়েছে।" তখন সকলের সবেমাত্র অর্দ্ধেক আহার হইয়াছে! সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"উঠুন-উঠুন—উনি স্বচ্ছন্দে উঠুন—আমাদের কোনও আপত্তি নাই!" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অন্তরে অন্তরে ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিয়া—এবং প্রজ্বলিত জঠরানল লইয়া—অগত্যা লোকের তাড়নায় আহারস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। বৃদ্ধ আসল কথা কিছু প্রকাশ না করিয়া—একেবারে নিজবাটী প্রস্থান করিল। নন্দরামের জোড়া মেলা ভার!!!

সমাপ্ত।

কর্ম্মসূত্র।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় লিখিত।)

আসিছেন রাণা উদয়সিংহ *
বাদসার সভা হ'তে,
রূপবতী এক বিপ্র দুহিতা
দেখিল ফিরিতে পথে।

লজ্জার মাথা খাইয়া কামুক
কহিল কতই কথা,
সরোষ দন্তে ফিরিলা বালিকা
দলিতা ফণিনী যথা।

"নরাধম পাপী এতই সাহস
ধরিস ঘৃণিত বুকে,
সতী-শিরোমণি হিন্দুরমণী
লাথি মারে তোর মুখে।"

"সুন্দরী তুমি রূপের গর্ব্বে
কটুবাণী কহ মোরে,
রাজ রোষ ভয় অপার বিপদে
ভুলিছ দম্ভভরে।"

---

* মারবার পতি রাঠোর-রাজ উদয়সিংহ সম্বন্ধে এই ঘটনাটী "খ্যাত" নামক একখানি ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

"তোমার মতন নারকী পিশাচ
শঙ্কটে ভয় করে,
† আর্য্যা-পন্থী বিপ্রকুমারী
শমনে নাহিক ডরে।"

উদয়সিংএর হইল উদয়
দুর্জ্জয় অভিমান,
আমারি রাজ্যে বসতি করিয়া
আমারেই অপমান!

আসিয়া ভবনে লিখিলা বিপ্রে
"জীবন যদি গো চাও,
সত্বরে আনি দুহিতা তোমার
আমারে মিলায়ে দাও।"

"বাঞ্ছিত ফল লভিবে অপার
আদেশ যদ্যপি মান,
রাখিতে বংশ সম্মান
সঙ্গে তাহারে দান।"

গর্জ্জিয়া উঠিল ব্রাহ্মণ-বর
ঘৃণিত আদেশ জানি,
নিষ্ফল ক্রোধে গুমরী অধীর
দৃঢ় সে হৃদয়খানি।

দেখিল আসিছে প্রাণের দুহিতা
বদনে কালিমা ঘোর,

---

† আর্য্যা-পন্থী একপ্রকার সম্প্রদায়। ইঁহারা কালিকার অপর মূর্ত্তি আর্য্যামাতার উপাসক।

দীর্ণ হৃদয়ে কহিল ক্লিষ্ট,
"বুঝেছি সকলি তোর।"
কঠোর কান্তি, চাহিলা ক্রুদ্ধ,
প্রশ্ন নয়নে তবে ;—
"নশ্বর ধরা" কহিল বালিকা
"ধর্ম্ম রাখিতে হবে।"
স্মরিলা বিপ্র, আর্য্যাযাতায়,
তীক্ষ্ণ খড়্গো ধরি,
নিমিষে ছুটিল রক্তে বন্যা
দুহিতা খণ্ড করি।
শাপিলা ক্লিষ্ট পাপী উদ্দেশে
"ধর্ম্মে দিবেন সাজা,
তিন দিন তিন বরষ রবে না,
এত পাপ কভু ধরণী সবে না;
এমনি করিয়া ছিঁড়িয়া মর্ম্ম
মারাব রাঠোর রাজা।"
অনল কুণ্ড জ্বালিয়া পড়িল
কন্যারে লয়ে ঝাঁপি।
মরণ-বাচিনা শুনিল ধর্ম্মের
অভিসাঁপ বাণী লিখিলা কণ্ঠে,
পাপীর হৃদয় অজ্ঞাতে হেথা
সহসা উঠিল কাঁপি।
পূতিগন্ধময় ধূম পটলে
প্রাঙ্গণ গেল ছাপি।

বিস্তার করি লোল-রসনা,
এমনি করিয়া কণ্ঠ ভীষণা,
তিন দিন তিন বরষ পরেতে,
গ্রাসিল মাঠের পাখী!

ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি।

(নাট্য-কলা-কুশল বিশেষজ্ঞের লিখিত।)

হিন্দুজাতিই যে নাট্য-কলার আদি সৃষ্টিকর্তা, হিন্দুস্থানে অতি প্রাচীনকাল হইতে যে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং উৎসব বা পর্বোপলক্ষে তাহাতে নাটকাভিনয় হইত—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, প্রাচীন পুরাণেতিহাসে ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-পণ্ডিত অধ্যাপক বেবর (Weber) তাঁহার Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে গ্রীক্ জাতিকেই নাট্যকলার সৃষ্টিকারক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাকডনেল সাহেব স্বরচিত সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে বলিয়াছেন,—পুরাকালে হিন্দুদিগের সাধারণ নাট্যশালা ছিল না, তাহারা নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিতে জানিত না; তাহাদিগের নাটকাদি রাজাদিগের নৃত্যশালায় অভিনীত হইত।

কিন্তু অধ্যাপক উইলসন সাহেব উল্লিখিত উক্তিগুলি ভিত্তিহীন বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—হিন্দুর নাটকই আদি ও অকৃত্রিম; নাট্যশাস্ত্রে হিন্দু কোনও জাতির নিকটই ঋণী নহে।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সুধি স্বনামখ্যাত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী পত্রিকায় বিবিধ সারগর্ভ যুক্তি সহকারে হিন্দু-নাট্যের উৎপত্তি ও প্রাচীনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উপাদেয়, উপভোগ্য ও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—ষাট বৎসরের কিছু দিন অধিক হইল, কর্ণেল উজ্‌লে মারগুজা প্রদেশে রামগড় পাহাড়ে দুইটি গুহা আবিষ্কার করেন। উহাতে অশোকাক্ষরে খোদিত লিপিও আছে। এই লিপিতে যাহা উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা কোনও ঐতিহাসিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা নহে। কয়েক বৎসর হইল ডাক্তার ব্লক এই গুহাগুলি দেখিতে যান তিনি এই লিপিগুলির নূতন প্রতিলিপি আনিয়া পাঠ করিয়া তাহাদিগকে নাট্যসম্বন্ধীয় লিপি বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনুমান করিয়াছেন, খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দুর এই বিরাট নাট্যশালা প্রস্তুত হইয়াছিল।

শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন,—হিন্দু নাট্য-শাস্ত্রে "প্রেক্ষাগৃহ" "পেক্‌খাঘরা" প্রভৃতি শব্দ যখন বর্ত্তমান আছে দেখা যাইতেছে, তখন ম্যাকডনেল সাহেবের ঐরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিবিধ আকারের প্রেক্ষাগৃহের ব্যবস্থা দেখা যায়, প্রথম প্রকার গৃহের নাম 'বিকৃষ্ট' ইহা আয়তাকার বা দ্বিঘাকার, দৈর্ঘ্যে ১০৮ হাত। এইরূপ নাট্যশালা দেবতাদিগের অর্থাৎ দেব-মন্দির সংস্পৃষ্ট। দ্বিতীয় প্রকার গৃহও আয়তাকার ৬৪ হাত দীর্ঘ এবং ৩২ হাত প্রস্থ ; ইহা রাজা ও রাজন্যবর্গের জন্য। শাস্ত্রে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এই শ্রেণীর নাট্যশালাই জনবহুল স্থানে সাধারণের জন্য ব্যবহৃত হইত। তৃতীয় প্রকার নাট্যশালা সমভুজ ত্রিকোণাকার, প্রত্যেক ভুজের পরিমাণ ৩২ হাত ; ইহা গার্হস্থ্য নাট্যশালা।

পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন নাট্যশালাগুলির ঠিক অর্দ্ধাংশ দর্শকদিগের-

বসিবার জন্য থাকিত। বিভিন্নজাতির বসিবার জন্য বিভিন্ন স্থান থাকিত এবং তাহা বিভিন্নবর্ণের স্তম্ভের দ্বারা বিভক্ত করা হইত। আসনগুলি একের পশ্চাতে আর একটি সোপানাকারে সজ্জিত হইত। প্রত্যেক আসন তাহার সম্মুখের আসন অপেক্ষা একহাত উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত হইত। সম্মুখের আসনে ব্রাহ্মণেরা উপবেশন করিতেন এবং তাহা শ্বেতবর্ণের স্তম্ভদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত। ক্ষত্রিয়দিগের আসনগুলি রক্তবর্ণ স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা চিহ্নিত করা হইত। ইহাদের পশ্চাতে উত্তর-পশ্চিমে বৈশ্যগণের এবং উত্তর পূর্ব্বে শূদ্রগণের আসন থাকিত। বৈশ্য-গণের আসনের চিহ্ন পীতবর্ণের এবং শূদ্রগণের আসনের চিহ্ন নীল বর্ণের স্তম্ভশ্রেণী। এতদ্ভিন্ন অন্তর্দেশে কতকগুলি স্তম্ভ থাকিত ও তাহাদের পার্শ্বে যে সকল আসন থাকিত, তাহাতে বর্ণাশ্রম বহির্ভূত ব্যক্তিরা বসিত। এই দর্শকস্থানের ঊর্দ্ধে এক বারাণ্ডা থাকিত, সেখানেও পূর্ব্বোক্তরূপে চিহ্নিত আসনাদি থাকিত।

নাট্যশালার অপরার্দ্ধ স্থান অভিনেতৃগণের অধিকারে থাকিত। এই ভাগে সর্ব্বপশ্চাতের অংশের নাম 'রঙ্গশীর্ষ' এই অংশে ছয়টি স্তম্ভের ও সমস্ত পুরীর এক অষ্টমাংশ স্থান থাকিত। নাট্যবেদের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতার পূজা এই অংশে করা হইত। নেপথ্যগৃহ বা সজ্জাগৃহ হইতে এইস্থানে আসিবার দুইটি দ্বার থাকিত। নেপথ্য হইতে রঙ্গমঞ্চে আসিবার জন্য কোথায় একটি কোথাও বা দুইটি দ্বার হইত। রঙ্গমঞ্চ কখন কখন দ্বিতলরূপে নির্ম্মিত হইত। দ্বিতলে রঙ্গমঞ্চের উপরিতলে স্বর্গের দৃশ্যাবলী অভিনীত হইত। সমস্ত রঙ্গমঞ্চে বস্ত্রের উপর অঙ্কিত উদ্যান, অট্টালিকা, প্রাসাদ, মন্দির, নদী, বন, পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতির ছবিদ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকিত। এই সকল ছবিদ্বারা পরিবর্ত্তন ও অপসারণ যোগ্য দৃশ্যাবলীর অভাব দূর হইত।

নাট্যশালার প্রত্যেক অংশ নির্মাণের সময় বিবিধ দেবতার পূজার সাড়ম্বর ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রত্যেকবারেই ব্রাহ্মণ ভোজনেরও ব্যবস্থা ছিল; তবে তাহা পূজা বিশেষে সামান্ত বা ভূরি ভোজ্যদানে নির্ব্বাহিত হইত; হীনাঙ্গ, বিকলাঙ্গ বা কুৎসিত-দর্শন ব্যক্তিকে নাট্যশালা নির্মাণের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ ছিল। সন্ন্যাসী ও যতিরা নাট্যশালার ত্রিসীমার মধ্যে আসিতে পাইতেন না। 'জর্জ্জর' বা ইন্দ্রধ্বজ স্থাপনই নাট্যশালা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ দৈবকর্ম্মের মধ্যে প্রধান ব্যাপার ছিল। উৎসবের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা-কালে ইন্দ্রধ্বজ মন্ত্রপূত করিয়া নাট্যশালায় প্রোথিত করিতে হইত। ধ্বজারোপণের পরদিন অর্থাৎ উৎসবের দিন, সর্ব্বদেবদেবী পূজার পর জর্জ্জরের পূজা হইত। ইহার পঞ্চ পর্ব্বে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিকেয় ও নাগের প্রতিষ্ঠান। ধ্বজের প্রথম পর্ব্ব শ্বেতবস্ত্রে, দ্বিতীয় পর্ব্ব নীল বস্ত্রে, তৃতীয় পর্ব্ব পীত বস্ত্রে, চতুর্থ পর্ব্ব রক্ত বস্ত্রে ও পঞ্চম পর্ব্ব বিবিধবর্ণের বিচিত্রবস্ত্রে মণ্ডিত করা হইত।

অসুর জয়ের পর ইন্দ্র কর্তৃক ধ্বজারোপিত হইলে আদি নাট্যা-ভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল। নাট্যশালা সম্পূর্ণ হইলে ভরত ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বিষয় অভিনয় হইবে। ব্রহ্মা 'অমৃত মন্থন' অভিনয় করিবার আদেশ দেন এবং উহার অভিনয়ে দেবতারা বিশেষ আনন্দলাভ করেন। তৎপরে দেবতারা শিবকে নাট্যাভিনয় দেখাইয়া প্রীত করিতে চাহিলে হিমালয়ে শিবসম্মুখে। 'ত্রিপুরদাহ' অভিনীত হয়। শিব অভিনয় দর্শনে অতিমাত্র প্রসন্ন হন এবং অভিনয়ের উন্নতিকল্পে উহাতে নৃত্য সংযোগ করিবার প্রস্তাব করেন।

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের পর সেইদিন সন্ধ্যাকালে শিব নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে গীত বাদ্যের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন। তিনি সেইদিন

নানা দেবতার রূপধারণ করিয়া নানাভাবে নৃত্য ও রহস্ত প্রদর্শন করেন। ইহারই নাম—'পিণ্ডীবন্ধ'।

নৃত্যে হস্ত, পদ, কটী, পার্শ্ব, উরু, উদর, পৃষ্ঠ ও বক্ষের বহুভঙ্গী সহকারে আন্দোলন আবশ্যক, কখন তাহাদের দ্রুতগতি, কখন লঘুগতি নৃত্যে প্রয়োজন হয়। এই গতির নামই 'মাতৃকা' বা নৃত্যের জননী। এই সকল মাতৃকার তিনটি বা চারিটি মিশাইয়া লইলে যে গতি উৎপাদন করে, তাহারই নাম 'করণ' বা কার্য্য। নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ ১০৮ প্রকার করণের ব্যাখ্যা আছে। বিবিধ করণের সংমিশ্রণে যে মিশ্রগতি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'অঙ্গহার'। নাট্যশাস্ত্রে ৩২ প্রকার অঙ্গহারের ব্যাখ্যা আছে। নৃত্য বন্ধ করিবার সময়ে যাহাতে সুন্দর ভাবে সমাপ্ত হয়, তাহারও চারিপ্রকার রীতি বর্ণিত হইয়াছে। এই রীতিগুলিকে 'রেচক' বলে। এই সকল রেচক, অঙ্গহার, করণ ও পিণ্ডিবন্ধ দক্ষযজ্ঞাবসানে নৃত্যকালে মহাদেবই সৃষ্টি করেন। তিনি এই সকল নৃত্য-কৌশল তণ্ডুকে শিখাইয়া দেন। তণ্ডুর, নামানুসারে এই নৃত্যকলার নাম 'তাণ্ডব' হয়।

'ত্রিপুরদাহ' নাটকের অভিনয় দেখিয়া মহাদেব প্রীত হইয়া ভরতকে নৃত্যবিদ্যা শিখাইবার জন্ত তণ্ডুকে আদেশ করিলেন। মুনিরা ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাটকাভিনয়ে নৃত্য সংযোগ কেন করা হইল? ইহা উপাখ্যানকে প্রবর্দ্ধিত করে না বা বৃত্তি-বিকাশেও সাহায্য করে না। অভিনয়ই এই বিষয়ে যথেষ্ট, তবে উহা সংযোগের আবশ্যক কি? ভরত বলিলেন, নৃত্য নাটকীয় কলা কৌশল প্রকাশে আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু উহাকে শোভাময় করে। নৃত্য সাধারণের অতি প্রিয়, সকল উৎসবেই লোকে নৃত্যের অনুষ্ঠান করে, অতএব সেই কারণেই গানের সংশ্রবে নাটকাভিনয়ে নৃত্য সংযুক্ত হইয়াছে।

নাটকাভিনয়ের পূর্ব্বানুষ্ঠান,—( ) বাদ্যযন্ত্রাদির আয়োজন, (২) অঙ্গনের মধ্যে বাদকদিগের অবস্থিতি স্থান, (৩) সঙ্গীতারম্ভ, (৪) বাদ্য-পরীক্ষা, (৫) কণ্ঠস্বরের সহিত যন্ত্রস্বরের মিলন, (৬) তন্ত্রযন্ত্রের সহিত কণ্ঠস্বরের সঙ্গতি সাধন, (৭) বিবিধ যন্ত্রে বাদকগণের হস্ত সংযোগ, (৮) বিভিন্ন যন্ত্রের সুর সমন্বয় দ্বারা একতান বাদন, (৯) তাল বিধান ও (১০) ঈশ্বর স্তোত্র গান। এই সকলের ব্যবস্থাই রঙ্গমঞ্চের বাহিরে যবনিকার অন্তরালে করিতে হইবে। তৎপরে যবনিকা তুলিয়া দিলে সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া দশদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দশদিক্‌পালকে প্রণাম করিবেন। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ নান্দীপাঠ এবং কয়েকটি শ্লোকে জর্জ্জর স্তোত্র পাঠ হইবে। তাহার পর অঙ্গভঙ্গী ও বাগভঙ্গী সহকারে প্রকৃত অভিনয় আরম্ভ হইবে।

যবনিকা উঠিয়া গেলে সূত্রধার পুষ্পাঞ্জলী হস্তে দুইজন অনুচর সহ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবেন। আবার দুইটির মধ্যে একের হস্তে ভৃঙ্গার ও অপরের হস্তে জর্জ্জর থাকিবে। তৎপরে সূত্রধার পঞ্চপদ অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মার পূজা করিবেন। রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলে ব্রহ্মার নিত্য অধিষ্ঠান বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে অঞ্জলি দিতে হইবে, তা'রপর সুদৃশ্যভাবে হস্তান্দোলিত করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবেন এবং তৎপরে উভয় হস্ত ভূমিতে স্থাপন করিয়া তিনবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবেন, তৎপরে দক্ষিণাবর্ত্তে ব্রহ্মস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া, অনুচরের হস্ত হইতে জর্জ্জর গ্রহণ করিয়া বাদ্যগুলির দিকে পঞ্চপদ অগ্রসর হইয়া ঘুরিয়া আবার দশদিক্‌পাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিবেন।

ইহার পর আর একজন অনুচর পুষ্পপূর্ণ পাত্র লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া জর্জ্জরকে, বাদ্যগুলিকে এবং সূত্রধারকে পুষ্প দ্বারা ভূষিত করিবে; তৎপরে উপযুক্ত গীতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে

সেই ব্যক্তি প্রস্থান করিবে। তৎপরে সূত্রধার নান্দী পাঠ করিবে—সাধারণতঃ তাহাকে বলিতে হইবে,—

"নমোঽস্তু সর্ব্বদেবেভ্যো দ্বিজাতিভ্যো শুভং তথা।
জিতং সামেন বৈ রাজ্ঞা শিবং গোব্রাহ্মণায় চ॥
ব্রহ্মোত্তরং তথৈবাস্তু হতা ব্রহ্মদ্বিষস্তথা।
প্রশাস্তেমাং মহারাজ পৃথিবীঞ্চ সসাগরাম্॥
রাষ্ট্রং প্রবর্দ্ধতাঞ্চৈব রঙ্গস্যাশা প্রমৃদ্যতু।
প্রেক্ষাকর্ত্তুর্মহান্ ধর্ম্মো ভবতু ব্রহ্মাভাষিতঃ॥
কাব্যকর্ত্তুর্যশশ্চাস্তু ধর্ম্মাঙ্গানি প্রবর্দ্ধতাম্।
ইজ্যয়াঞ্চনয়া নিত্যং প্রীয়ন্তাং দেবতা ইতি॥"

তৎপরে আটটি বা দ্বাদশটি বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রত্যেক বাক্যের পরই অনুচরেরা 'এবমস্ত্বার্য্য' (আর্য্য, তাহাই হউক) বলিবে। তৎপরে বাদ্যকরেরা অষ্টতালবিশিষ্ট, নয়টি গুরু, ছয়টি লঘু এবং পুনরায় তিনটি গুরু অক্ষরযুক্ত সুর বাদন করিবে। ইহা দ্বারা জর্জ্জর স্তব পাঠ সূচিত হইবে। তৎপরে গম্ভীর স্বরে আভীপ্সিত দেবতার স্তোত্র পাঠ, রাজা বা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিজ্ঞাপন ও উপসংহারে জর্জ্জর-বিসর্জ্জন সূচক কবিতা পাঠ করিয়া জর্জ্জরকে ভূমিতে রাখিয়া দিবে। তৎপরে অনুচরেরা সরিয়া দাঁড়াইলে সূত্রধার জর্জ্জরের ভারকেন্দ্র নির্ণয় করিয়া সেই স্থান ধারণ করতঃ সুকৌশলে সুদৃশ্যভাবে অনুচর-গণের দিকে পঞ্চপদ অগ্রসর হইয়া আদিরসাত্মক একটি আর্য্যাশ্লোক পাঠ করিবে। এই পঞ্চপদী কৌশলময় গমনের নাম 'চারী'। তৎপরে অনুচরের হস্তে জর্জ্জর দান করিয়া সূত্রধার দ্রুত ও তীব্রগতি পান বাদ্যের সহিত রঙ্গমঞ্চে পরিভ্রমণ করিবে এবং কোন তীব্ররসাত্মক শ্লোক পাঠ করিবে। ইহাকে 'মহাচারী' বলে। ইহার পর সূত্রধার অনুচরগণের সহিত আলাপ করিবে। এই আলাপের নাম '[illegible]'

বা স্বাগ্রহ উদ্দেশ। ইহাতে দর্শকবৃন্দের অভিনন্দন, নাটক দর্শন ও শ্রবণার্থ আমন্ত্রণ ও নাটকের কথা উল্লেখ থাকিবে ; তৎপরে যে ভাবে প্রবেশ করা হইয়াছিল সেই ভাবে সানুচর প্রস্থান করিবে।

এই সকল মুখবন্ধের ব্যাপার অতিদীর্ঘ হওয়া উচিত নহে, কারণ তাহাতে অভিনেতৃগণ ও দর্শকগণ অধীর হইয়া উঠিতে পারেন। তাঁহারা অধীর হইয়া পড়িলে অভিনয়ের রস গ্রহণ করা দুর্ঘট হইবে। সানুচর সূত্রধার রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করিলে, আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিবে, ইহার নাম 'স্থাপক'। এই ব্যক্তিই প্রকৃত প্রস্তাবে নাটকারম্ভ করাইয়া দেয়। এই ব্যক্তি সুদৃশ্য ও মনোহরভাবে পরিক্রমণ করিতে করিতে দেবতাদিগের মহিমা কীর্ত্তন, দর্শকগণের প্রশংসা, কবির কৃতিত্ব জ্ঞাপন করিবে। এই ব্যক্তির উক্তির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপযুক্ত তাললয়ে বাজনা বাজিতে থাকিবে। অবশেষে এই ব্যক্তি নাটকের সূচনা উল্লেখ করিয়া প্রস্থান করিবে।

নাট্যাভিনয়ের এই প্রকার মুখবন্ধের ব্যাপার অবগত হইয়া মুনিরা ভরতকে 'রস', 'ভাব', 'সংগ্রহ', 'কারিকা' ও 'নিরুক্ত' ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ভরত বলিলেন, নাট্যকলা এত বিশাল যে তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা অসম্ভব। ইহাতে যে সকল সূক্ষ্ম কলাকৌশল আবশ্যক তাহা অসংখ্য। ভাব অর্থাৎ (যাহা ঘটিয়াছে বা যাহা ঘটান হইবে) চিত্তবৃত্তি সমূহ অনন্ত। একটি জ্ঞানসাগর উত্তীর্ণ হওয়াই যখন দুর্ঘট, তখন সকল জ্ঞানের কথা ধারণা করাই অসম্ভব। সূত্র ও ভাষ্যে সকল বিষয়ই সুদক্ষরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহারই সংক্ষিপ্তসারের নাম 'সংগ্রহ'। যাহাতে সূত্রানুসরণে রস, ভাব, অভিনয়, আহার্য্য, স্বর-সঙ্গতি, সিদ্ধি, সুর, বাদ্য, গীত ও অভিনেয় বিষয়ের ব্যাখ্যা আছে, তাহারই নাম 'কারিকা'। বিভিন্ন রীতি অনুসারে পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ ও ধাতু যাহাতে কথিত হইয়াছে তাহাই 'নিরুক্ত' ও

'নিগম'। বিভিন্ন ধাতু হইতে এই সকল পারিভাষিক শব্দের যে ভাবে উৎপত্তি হইয়াছে এবং যে ভাবে পারিভাষিক অর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই যাহাতে বিবৃত আছে, তাহারই নাম 'নিরুক্ত'। তৎপরে সপ্তদশ শ্লোকে এই সমস্ত বিষয়ের একটি 'সংগ্রহ' উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার পর এই নির্দেশক শ্লোকটি আছে,—

"এবমেষোঽত্র সূত্রার্থো নির্দিষ্টো নাট্যসংগ্রহঃ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সূত্রগ্রন্থবিকল্পম্।"

অর্থাৎ এই নাট্য সংগ্রহে এইরূপে সূত্রার্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর সূত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব। তৎপরে গদ্যে প্রকৃত সূত্র সম্বন্ধে প্রতি পদে ব্যাখ্যা করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সূত্র অর্থে কেবলমাত্র সূত্রগুলি নহে। কল্পসূত্র, শ্রৌত সূত্রাদির ন্যায় ইহাও বিবরণ মূলক গ্রন্থ। এই গদ্যাংশে কেবল যে সূত্রগুলি আছে, তাহা নহে, তাহাদের ভাষ্য ও অনেকগুলি কারিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। বহুস্থলে প্রকৃতি প্রত্যয়াদিও প্রদত্ত হইয়াছে। এই গদ্যাংশের মধ্যে শ্লোকে রচিত বহুলাংশের ভিতরে আমরা কেবল যে কতকগুলি আসল নাট্যসূত্র পাই, তাহা নহে, তাহাদের ভাষ্য, কারিকা, নির্ঘণ্ট ও নিরুক্তও পাইয়া থাকি। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে এই বৃহৎ শ্লোকগ্রন্থ সংগৃহীত ও রচিত হইবার পূর্ব্বে নাট্যকলা সম্বন্ধে একটি বিপুল শাস্ত্র বর্ত্তমান ছিল এবং সেই শাস্ত্র পাঁচ ছয়টি পরিবর্ত্তন ও উন্নততর স্তরভেদ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপে নাট্যকলা সম্বন্ধে সর্ব্বাদৌ যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে যে 'অসুর পরাজয়' 'অমৃত মন্থন', 'ত্রিপুরদাহ' প্রভৃতি বহুসংখ্যক নাটক বর্ত্তমান ছিল এবং সেগুলি অতি প্রাচীনকালে অভিনীত হইত, তাহা অতি সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা যাইতে

পারে। সেকালে বহু নাটক রচিত হইয়াছিল বলিয়াই নাট্যশাস্ত্র-প্রণয়নের আবশ্যক হইয়াছিল। পাণিনি শিলালী রচিত নাট্যসূত্র ও কৃশাশ্ব রচিত নাট্যসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিম্বদন্তী অনুসারে ভরতকেই আদি নাট্যসূত্রকার বলা যায়। নাট্যশাস্ত্রের মধ্যেও বিভিন্ন সিদ্ধান্তবিশিষ্ট নাট্যসূত্রের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে শিলালী, কৃশাশ্ব ও ভরত তিন জনেই বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সূত্রকার ছিলেন। কালে সূত্রগুলির ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় এবং ভাষ্য সকল লিখিত হইতে থাকে; ক্রমশঃ এই শাস্ত্রে গ্রন্থসংখ্যা বিপুল হইয়া উঠিলে, তাহা হইতে কারিকা, সংগ্রহ, নির্ঘণ্ট ও নিরুক্তাদি লিখিত হইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে খৃষ্টজন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে বিরাট নাট্যশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া সকল বিষয়ের সুসঙ্গত সমাবেশ করিয়া যে গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়, তাহাই এই ভরত-নাট্যশাস্ত্র।

এই গ্রন্থ ৩৮ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে পারিভাষিক শব্দ এত আছে যে, তাহাদের সদর্থ অনুধাবন করিতে বহু বৎসর গবেষণা ও অনুশীলন আবশ্যক। ২৮শ অধ্যায়ে কতকগুলি সূত্রে পাওয়া যায়, তাহা যন্ত্রসঙ্গীত সম্বন্ধে। সঙ্গীত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ সাতটি অধ্যায় আছে। এই সকল অধ্যায়ে যে সকল সুপ্রাচীন পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার অর্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সঙ্গীতশাস্ত্র রচয়িতৃগণেরও দুর্ব্বোধ্য, সাজসজ্জা ও অভিনেতৃনির্ব্বাচন এবং নাটকের শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে যে সকল অধ্যায় আছে, সে সকলও ঐরূপ দুষ্প্রবেশ্য। এই গ্রন্থে একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীতে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, অভিনেতাদিগেরও তাহাই প্রয়োজনীয়, সুতরাং সে কালে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে যে কোন শিল্প ও কলা অনুষ্ঠিত হইত, তাহার প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই এই গ্রন্থে ইঙ্গিত আছে; কাজেই যাঁহারা এতত্ত্বের

আলোচনাই বিশেষভাবে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষেও ইহার সকল স্থানের অর্থভেদ করা সহজ সাধ্য নহে।

এক্ষণে কথা এই,—এ গ্রন্থের রচয়িতা কে? গ্রন্থ শেষে তাঁহার কিছু সূত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থের সর্ব্বত্র ভরত উত্তমপুরুষের বাক্য প্রয়োগে বিষয়সমূহ নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সমস্ত পার্থিব বিষয়ের ব্যাপারই লিখিয়াছেন, কারণ তিনি বলেন, মানুষের পক্ষে দৈবভাবের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে এবং দেবতার অভিনয় করিতে হইলে, মানুষের ভাবেই অভিনয় করিতে হইবে। অথচ তিনি বলেন যে তাঁহার এই নাট্যবিদ্যার উৎপত্তি স্বর্গে এবং দেবতারা, অপ্সরাগণ ও অন্যান্য দেবযোনিই তাঁহার অভিনেতৃমণ্ডল। যখন এই সকল দেব-অভিনেতা কলাকুশল ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহারা আপনারা নাট্যরচনা করিতে লাগিলেন, আর সেই সকল নাট্যে ঋষিদিগকে বিদ্রূপ করা হইতে লাগিল। ঋষিরা ক্রোধে তাঁহাদিগকে দুইটি শাপ দিলেন,—তাঁহারা শূদ্রাচারী হইবেন ও তাঁহাদের এই দুষ্ট বিদ্যা লোপ পাইবে। ভরত তখন মধ্যস্থ হইয়া ঋষিদিগকে প্রসন্ন করিয়া বিদ্যালোপের অভিসম্পাত প্রত্যাহার করাইলেন। প্রথম শাপ বজায় রহিল।

নহুষের রাজত্বের অল্পকাল পরে, চন্দ্রবংশীয় কোন রাজা স্বর্গ জয় করিয়া স্বীয় পার্থিব রাজধানীতে নাট্যাভিনয় করাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ভরত ঋষিও অভিনেতৃবর্গের অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সম্মত করিলেন, অভিনেতৃবর্গ পৃথিবীতে নামিয়া আসিলেন এবং এখানে কিছু দিন থাকিয়া এক জাত জন্মা উৎপাদন করিয়া গেলেন, ইহাদের বংশগত বৃত্তিই হইল নাট্যাভিনয়। কৌটিল্য তাঁহার অর্থ শাস্ত্রে এই জাতিকে শূদ্র শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন, দেব-অভিনেতৃবর্গ তৎপরে স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন

এবং নাট্যকলার গুণপণা প্রকাশের জন্ত ভরতের দ্বারা শাপমুক্ত হইলেন। ভরত নিজে পৃথিবীতে আসেন নাই। কোলাহল (কোথাও 'কোহিল', কোথাও 'কোহল' নামে উল্লিখিত) এক ব্যক্তিই মনুষ্য-লোকের আদিশিক্ষক।

"আপ্তোপদেশসিদ্ধং হি নাট্যং প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা।
শেষং প্রস্তাবতন্ত্রেণ কোলাহল কথিষ্যতি॥
প্রয়োগান্ কারিকাশ্চৈব নিরুক্তানিতথৈব চ।
অপ্রয়োক্তিরিদং নাট্যং ক্রীড়নীয়েকহেতুকম্॥"

পুনরায়

"ভরতানাঞ্চ বংশয়োহয়ং ভবিষ্যঞ্চ প্রবর্ত্তিতঃ।
কোহলাদিভিরেনত্ত ব্যাসশাণ্ডিল্য ধূর্ত্তিতৈঃ॥
মর্ত্ত্যধর্ম্মক্রিয়াযুক্তৈঃ কিঞ্চিচ্ছাস্ত্র মবস্থিতৈঃ।
এতচ্ছাস্ত্রং প্রণীতং হি নরাণাং বুদ্ধিবর্দ্ধনম্॥"

ভরত সরল ভাবে সূত্রের পরিবর্তে শাস্ত্ররচনার কর্তৃত্ব বাৎস্যকোহল, শাণ্ডিল্য ও ধূর্ত্তিলকে প্রদান করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত দেশ ও জাতির উল্লেখ দেখা যায়,—(১) কিরাত, (২) বর্ব্বর, (৩) অন্ধ্র, (৪) দ্রাবিড়, (৫) কাশী-কোশল, (৬) পুলিন্দ এবং (৭) দাক্ষিণাত্য। এই সকল দেশের লোকচরিত্র যদি নাটকে অভিনয় করিতে হয়, তবে তাহাদের কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইতে হইবে। (৮) শক, (৯) যবন, (১০) পহ্লব, (১১) বাহ্লীক,—এই কয় দেশের লোক শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইবে। (১২) পাঞ্চাল, (১৩) শৌরসেন, (১৪) মাহিষ, (১৫) উদ্র-মাগধ, (১৬) অঙ্গ, (১৭) বঙ্গ, এবং (১৮) কলিঙ্গ দেশের লোকদিগকে মলিন-শ্বেত (উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে) রঞ্জিত হইতে হইবে। এই সম্পর্কে যে সকল জাতির উল্লেখ দেখা যাইতেছে, তাহারা

সকলে সুপ্রাচীন কালে বর্ত্তমান ছিল। অন্ধ্র ও কলিঙ্গদিগের উল্লেখ অশোক-লিপিতে পাওয়া যায়। বঙ্গগণের উল্লেখ বুদ্ধের জীবন চরিতে আছে। পাঞ্চাল ও শৌরসেনদিগের উল্লেখ বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পাওয়া যায়, আর শক, যবন ও পহ্লবদিগের কথা মনুতে আছে।

ঐ সকল বিভিন্ন দেশের লোকদিগের নাট্যরীতির উল্লেখ-কালে নাট্যশাস্ত্র চারিটি বিভিন্ন রীতির উল্লেখ করিয়াছেন;—দাক্ষিণাত্য, আবন্তি, উড্র, মাগধি ও পাঞ্চাল মধ্যম, দক্ষিণাপথ, কোশল, তোষল, মোশল, কালিঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, বনীয় ও বনবাস দেশের লোকেরা দাক্ষিণাত্য রীতির, অবন্তী, বিদিশা, সৌরাষ্ট্র, মালব, সিন্ধু, সৌবীর, আনর্ত্ত, অর্বুদ, দশার্ণ ও মৃত্তিক দেশের লোকে আবন্তী-রীতির; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বৎস, উড্রমগধ, পৌণ্ড্র, নেপাল, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, মলদ, মল্লবর্ত্তক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, প্রাগ ও প্রবীণী দেশের লোকে উড্র-মাগধী রীতির এবং পাঞ্চাল, কাশ্মীর, সৌরসেন, হস্তিনাপুর, বাহ্লীক, শাকল, মদ্র, কৌশীনর এবং হিমালয়গর্ভস্থ গঙ্গার উত্তর দিগ্বর্ত্তী জাতিসমূহ পাঞ্চাল মধ্যমরীতির অভিনয়-প্রিয় ছিল। এই সকল দেশও প্রাচীন-কালে বর্ত্তমান ছিল। দক্ষিণাপথের উল্লেখ কল্পসূত্রে, কোশলের উল্লেখ ব্রাহ্মণে, তোষল ও কলিঙ্গের উল্লেখ অশোকলিপিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ১০ম শতাব্দীতে সলোমন যে দ্রাবিল বা সাবিল দেশের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই দ্রাবিড় নামের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছু নহে। অন্ধ্র এবং মহারাষ্ট্রের প্রাকৃতরূপ অশোক লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ সকল দেশের নামই প্রাচীনকালে উল্লিখিত হইয়াছে কেবল তিন চারিটির নাম মাত্র নূতন।

এই গ্রন্থে ভাষার—বিশেষতঃ প্রাকৃত ভাষার উল্লেখকালে নিম্নোক্ত সাতটিকে 'ভাষা' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—(১) মাগধী, (২)

অবন্তীজ, (৩) প্রাচ্য, (৪) শুরসেনী, (৫) অর্দ্ধমাগধী, (৬) বাহ্লীকা (৭) দাক্ষিণাত্য এবং নিম্নোক্ত ছয়টিকে 'বিভাষা' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে,—(১) শবারী, (২) আভীরা, (৩) চাণ্ডালী, (৪) শাকরী, (৫) দ্রাবিড়ী ও (৬) উর্দ্ধরাজ। সেকালে প্রচলিত ভাষা সকলের মধ্যে সংস্কৃত মূলক নহে, এরূপ ভাষা এই শেষোক্ত কয়টিই জানা ছিল। বহুপরে কর্ণাটি দ্রাবিড়ী ও অন্যান্য ভাষাগুলিকে প্রাকৃত ভাষার তালিকায় লওয়া হইয়াছিল।

এই গ্রন্থখানি যে অতি প্রাচীনকালে রচিত,—তাহার আর এক নিদর্শন,—

"ন বর্ব্বরাকিরাতান্ধ্র দ্রাবিড়াদ্যাসু জাতিষু।
নাট্যযোগে তু কর্ত্তব্য কাব্যং ভাষা সমাশ্রয়ম্॥"

অর্থাৎ ঐ সকল জাতির ভাষা সাধারণের বোধ্য ছিল না বলিয়া উহা পরিত্যাগ করা হইত।—এই গ্রন্থে যে ভূগোল জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা এবং ভাষাবিভাগের বিবরণ দ্বারাও এই গ্রন্থের প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়।

ভারতের নাট্যকলা ইন্দ্রধ্বজারোপণের সহিত সম্বন্ধ। জর্জ্জরই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় নাট্যকলার লাঞ্ছন এবং উহা ইন্দ্রধ্বজের প্রতিরূপ। এই ধ্বজারোপণ ব্যাপারটি সম্ভবতঃ সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত; আরও কোন পুরাতন উৎসবের চিহ্নাবশেষ বলিয়া অনুমিত হয়। ইংলণ্ডের মে-পোল (May-Pole) উৎসবও এই ধ্বজোৎসব ব্যতীত আর কিছু নহে। শীতাপগমে বসন্ত আবির্ভূত হইলে, ইউরোপের গ্রামবাসীরা একত্র হইয়া বন হইতে এক দীর্ঘ জীবিত ওক গাছ কাটিয়া মহানন্দে গ্রামে লইয়া আসে এবং তাহাকে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে সাজাইয়া গ্রামের এক প্রকাশ্য স্থানে ধ্বজবৎ রোপণ করে ও সারাদিন তাহার মূলে গানবাজনা আমোদ আহ্লাদ খাওয়া-দাওয়া করিয়া

কাটায়। কোথাও কোথাও এই ধ্বজ দুই তিন বৎসর থাকে কিন্তু প্রতি বৎসর নূতন করিয়া সাজাইতে হয়। এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসাবে লোকে করিয়া থাকে মাত্র। ভারতে বর্ষাকাল বড় দুঃখের দিন। শরদাগমে প্রাচীনকালে রাজদ্বারের সম্মুখে ইন্দ্রধ্বজ স্থাপন করে। বর্ষাপগমে নবীন জীবন লাভের ভাবে এই উৎসবের যে অনুষ্ঠান তাহা লোপ হইয়া গিয়াছে। এখন ইহার অন্তার্থ অর্থাৎ ইন্দ্র অসুরগণকে (মেঘ সকলকে) জয় করিয়া আকাশমার্গ পরিষ্কার করিয়াছেন, অতএব তাঁহার উদ্দেশে এই ধ্বজারোপণ করা হইতেছে। উৎসব উপলক্ষে আনন্দকোলাহল ঠিক আছে এবং সেই সূত্রে ভারতের সমস্ত প্রদেশে নাট্যকলার বিকাশ ও নেপালের ছদ্মবেশের ক্রীড়া উদ্ভূত হইয়াছে। নেপালে ইন্দ্রযাত্রাই এখনও প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য হয়, তবে সে দেশে ধ্বজারোপণ করে না, তৎপরিবর্তে ঊর্দ্ধবাহু ইন্দ্রমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। এই ঊর্দ্ধবাহুত্বের মধ্যে সেই ধ্বজারোপণের ক্ষীণস্মৃতি বিজড়িত আছে বোধ হয়।

ভারতে নাট্যকলার বিকাশ এইরূপে এক অতি প্রাচীন উৎসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইহাকে ভারতীয় বা ভারতীয় আর্য্য বিদ্যা বলা যাইতে পারে। ইহার সহিত বহুপরবর্তী প্রাচীন গ্রীকদিগের কোন সম্পর্ক নাই।

নট ও নাট্যকার।

(শ্রীহরি সাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত।)

সেক্সপীয়ার ও মলিয়ার।

মিঃ ব্রাণ্ডার ম্যাথিউস্, গত বৎসরে, প্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের একখানি বিস্তৃত জীবনী সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন। আবার গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের North Americrn Review নামক বিখ্যাত পত্রিকায়, সেক্সপীয়র ও মলেয়ারের চরিত্র—অনেক কার্য্যগত ও অনেক সাদৃশ্যের কথাও বলিয়াছেন। আমরা সেই সুলিখিত প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া নাট্যমন্দিরের পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

সেক্সপীয়ার ও মলেয়ার দুইজনেই প্রতিভান্বিত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু সেক্সপীয়ারের বিশেষত্ব এই যে মলেয়ারের মত তিনি কেবল ফরাসী নাট্য জগতের উজ্জল নক্ষত্র নহেন। উজ্জল ধ্রুবতারার ন্যায়—সেক্সপীয়ার সর্ব্বজাতীয় নাট্য সাহিত্যাকাশে উজ্জল আলোক বিকীরণ করেন। তবে মলেয়ারের মত মিলনান্ত নাটক (comedy) লেখায় হাত সেক্সপীয়ারের ছিলনা। এই একটী বিষয়েই মহাকবি সেক্স পীয়ার স্বনামখ্যাত নাট্যকার মলেয়ারের নিকট পরাজিত।

পঞ্চাশৎবৎসর বয়সে মলেয়ার দেহত্যাগ করেন। লেসিং, ব্যালজ্যাক প্রভৃতি বিখ্যাত নাট্যকারগণও এরূপবয়সে সংসারলীলা শেষকরেন। কিন্তু ৫২ বৎসর বয়সে সেক্সপীয়ারের মৃত্যু হয়। থ্যাকারেও ৫৩ বৎসর বয়সে মরেন। সেক্সপীয়ার ও মলেয়ারের জীবনের অনেক ঘটনার

মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। দুইজনেই মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহস্থ সন্তান। দুইজনেরই যৌবন কাল সম্পূর্ণ রূপে কলুষ বর্জ্জিত ও সুপবিত্র; সেক্সপীয়ার বাল্যজীবনে নিশ্চয়ই ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডের কোন গ্রামারস্কুলে (grammar school) গিয়াছিলেন—মলেয়ারও সেইরূপ ফ্রেন্সের কোন প্রাথমিক পাঠশালায় অধ্যাপনার কার্য্য শেষ করেন। তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা বেশী ছিল না। রেসিন্, লেসিং প্রভৃতি নাট্যকারগণের শিক্ষা দীক্ষার তুলনায় সেক্সপীয়ার ও মলেয়ার অনেক সমকক্ষ নহেন! তবুও—ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে সেক্সপীয়ার আর ফরাসীর মলেয়ার অক্ষয় কীর্ত্তি ও অনন্ত গৌরব রাখিয়া গিয়াছেন। রেসিন্-লেসিং-কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; দুইজনেই অভিনয় করিবার জন্য—প্রথম যৌবনে বাড়ী হইতে পালাইয়া যান; অভিনয় কল্পনে নিবৃত্তি হইবার পরই দুইজনে নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। পুরাতন প্রাচীন classic গ্রন্থ সমূহের ঘটনার স্তিমিত ছায়া লইয়া দুইজনের প্রথমে নাটক লেখা সুরু করেন। মলেয়ার এক নাট্যসম্প্রদায়ের ম্যানেজার ও সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। সেক্সপীয়ারের প্রথমতঃ এরূপ সুযোগ না ঘটিলেও স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। অভিনয়ের ব্যবসা চালাইবার উপযুক্ত বুদ্ধি দুইজনেরই ছিল। দুইজনেই বেশ বুঝিয়া সুঝিয়া খরচ পত্র করিয়া একটা reserve অর্থাৎ স্থায়ী ধনের তহবিল করিয়াছিলেন।

সেক্সপীয়ার ও মলেয়ার, উভয়েই অতি প্রাচীন কিম্বা সামাজিক আখ্যান সমূহ লইয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন। অনেক গ্রন্থ হইতে তাঁহারা সামান্য উপকরণ লইয়া তাহাকে মাজিয়া ঘসিয়া বড় করিয়া খুব ভাল জিনিসে দাঁড় করাইতেন। অনেক শ্রেষ্ঠ পুস্তকের ঘাতপ্রতিঘাত-ময় ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা তাহা আরও শক্তিশালী করিয়া নিজেদের গ্রন্থে দৃশ্য সন্নিবেশ করিতেন। কিন্তু এরূপ হইলেও, তাঁহা-

য়ের উভয়েরই নাটকের মধ্যে একটা প্রস্ফুট স্বাতন্ত্র্য ভাব লক্ষিত হইত। এই দুইজন নাট্যকারের একটা অসাধারণ সামঞ্জস্য এই—যে তাঁহারা নবীন নাট্যকারগণকে প্রচুর উৎসাহ দিতেন; সেক্সপীয়ারের জনসন ছিল; মলেয়ারের রেসিন ছিল। Jhonson ও Recine উভয়েই নবীন নাট্যকার। কিন্তু উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা নাট্যজগতে পরিচিত হন। সেক্সপীয়ার ও মলেয়ার তাঁহাদের নাট্যজীবনের পরিণত অবস্থায় সহযোগী নাট্যকারদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একযোগে নাটক রচনা করেন সেক্সপীয়ারের সহযোগী ছিলেন—ফ্লেচার। আর মলেয়ারের সহযোগী সুবিখ্যাত ফরাসী নাটককার কর্ণেল।

অভিনয়ে বেশপরিবর্ত্তন।

কথাটা ও কাজটা বড় সোজা নয়। এরূপ দ্রুত বেশ পরিবর্ত্তন ও হুবহু আকার বিপর্য্যয় ঘটান আমাদের এ দেশের নাট্যজগতে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। বৃদ্ধবেশী অভিনেতা দুই সেকেণ্ডের মধ্যে একটু অন্তরালে আসিয়া—সুন্দরী যুবতীতে পরিবর্ত্তিত হইল—সুন্দর সুপুরুষ যুবক মুহূর্ত্তমধ্যে উইংসের পার্শ্বে আসিয়া একেবারে অশীতিপর বৃদ্ধে পরিণত হইল—ইহা বিলাতী ও ফরাসী নাট্যশালাতেই সম্ভব। আমাদের দেশে স্বপ্নের কল্পনামাত্র। "ষ্ট্রাণ্ড" ম্যাগাজিনে বিদ্যমানকালের একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা, মিঃ আর, এ, রবার্টস্‌এর অদ্ভুত বেশ ও আকার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে সমস্ত ঘটনা বাহির হইয়াছে—তাহা প্রকৃতই অদ্ভুত ও অননুকরণীয়।

মিঃ রবার্টের এইরূপ—ত্বরিত বেশভূষা ও মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনের কথা প্রথমে অনেকে বিশ্বাস করেন নাই। অনেকে সন্দিগ্ধভাবে বলিতেন, রবার্টস্‌এর সম-আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়তঃ অন্য দুই একজন

অভিনেতা আছে—তাহারাই বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ষ্টেজের মধ্যে প্রস্তুত থাকে, প্রয়োজন হইলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে রঙ্গমঞ্চে বাহির হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে নানারূপ গুপ্ত অনুসন্ধান করিয়া যখন লোকে জানিতে পারিল—একা রবার্টসই এইসব কাণ্ড করেন, ষ্টেজের অভ্যন্তরে তাঁহার অনুরূপ আর কোন অভিনেতাই নাই; তখন তাহারা রবার্টস্এর এই অলৌকিক গুণগ্রামের পক্ষপাতী হইল।

মিঃ রবার্টস্ তাঁহার এক বন্ধুকে একবার বলেন—যে তিনি একটা কোট ও ওয়েষ্টকোট, এক সেকেণ্ডের মধ্যে তাঁহার শরীর হইতে খুলিয়া ফেলিতে পারেন। সেই বন্ধু এই কথায় অবিশ্বাস করিলে রবার্টস্ তাহাকে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া কোট ও ওয়েষ্টকোট খুলিয়া তাহাকে এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করান। মিঃ রবার্টসের এই বন্ধুটী একজন বাজে লোক নহেন। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ড্রুরিলেন থিয়েটারের সত্বাধিকারী। সামান্য এই বেশ পরিবর্ত্তনের কৌশল দেখিয়াই তাঁহার মন রবার্টসের দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি উচ্চ বেতনে ড্রুরিলেনে রবার্টসকে অভিনেতারূপে নিযুক্ত করিলেন। মিঃ রবার্টস নিজমুখেই বলিয়াছেন এই সময় হইতে আমি এই ত্বরিত পরিবর্ত্তন বিদ্যা বা the art of quick changeটা আমার জীবনের প্রধান সাধনাভুক্ত করিয়া লই। তাহাতেই আমার সিদ্ধি।

অনেকে সন্দেহ করিতেন যে মিঃ রবার্টস—যে সমস্ত পোষাক বদল করিতেন—সে পোষাকগুলি কোনরূপ সুকৌশল নির্ম্মিত। অর্থাৎ হয়তঃ একটা Lady's Jacket এমনভাবে প্রস্তুত যাহার একটী পিন খুলিয়া লইলে বা স্থানবিশেষে একটী পিন্ সংযোগ করিয়া দিলে তাহা হয়তঃ একটী over-coatএ দাঁড়ায়। কিম্বা একটী gents pant এমনভাবে তৈয়ারি যে তাহার মধ্য হইতে একটী সুতা টানিয়া লইলেই তাহা হয়তঃ একটা Lady's gownএ

পরিবর্ত্তিত হয়। শেষে লোকের এরূপ সন্দেহও ভিত্তিহীন হইয়া দাঁড়াইল।

এইসব সংশয়বাদীদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে—তিনি তাঁহার প্রসাধনাগারে লইয়া গিয়া প্রত্যেক পোষাক তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন—যে সেগুলির মধ্যে কথিতমত কোন কৌশল বা Trick নাই। ইহা কেবল তাঁহার শিক্ষিত ও অভ্যস্তবিদ্যার অব্যবহিত ফল। এই সংশয়বাদীদের মধ্যে একজন সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া নিঃসন্দেহ হইয়া লণ্ডনের একখানি সংবাদপত্রে লেখেন—"Mr. Roberts has discovered particular methods aiding quickness in change in costume as well as make-up, but he is absolutely devoid of "Tricks" এই সময় হইতে রবার্ট সাহেবের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার অভিনয়ের জন্য হউক না হউক এই অদ্ভুত বেশ ও আকৃতি পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক থিয়েটার হইতে তাঁহার নিয়োগ প্রস্তাব আসিতে থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি লণ্ডনের Palace Theatreএ অভিনয় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটী বিশিষ্ট বন্ধু তাঁহার এই অদ্ভুত বেশ পরিবর্ত্তন কার্য্য প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার গুপ্ত সজ্জা গৃহে লইয়া যান। পাঠক মনে রাখিবেন, লণ্ডনের অনেক বড় বড় থিয়েটারে প্রত্যেক অভিনেতার জন্য পৃথক পৃথক সুসজ্জিত সাজঘর আছে। এই সব সাজঘর, উজ্জল বৈদ্যুতিক আলোকোজ্জ্বলিত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। সমুজ্জল মুকুর, বসিবার সুখাসন, বিশ্রামের সোফা, মুখহাত ধুইবার জন্য পোর্সিলেনের জলাধার প্রভৃতি সব সরঞ্জামই আছে। মিঃ রবার্টস, তখনই এক বৃদ্ধারমণীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া তাঁহার সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বন্ধুরা সেখানে ব্যাপারটা কি দেখিবার আশায় আশা প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া

আছেন—তাঁহাদের দৃষ্টি তাঁহার পোষাক পরিবর্ত্তন কার্য্যের দিকে সন্নিবদ্ধ। দেখিতে দেখিতে সেই বৃদ্ধরমণীবেশী মিঃ রবার্টস খুব আঁটা পোষাক পরা এক যুবা শিকারীর মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার বন্ধুরা বিস্ময় বিমুগ্ধ। সাজঘরে এই আসা যাওয়া ও ষ্টেজের মধ্যে অভিনয়ার্থে পুনঃ প্রবেশের জন্য তাঁহার তিন সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগিয়াছিল। আমাদের নাট্যশালায় একটা সামান্য পরিবর্ত্তনের জন্য দর্শককে হাঁ করিয়া wings এর দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ আশা প্রতীক্ষায় থাকিতে হয়। অভিনেতা যেন বাহিরে আসিতেই চাহে না।

কিসে তাঁহার এরূপ ত্বরিত পরিবর্ত্তনে ক্ষমতা জন্মিল এই কথা জিজ্ঞাসা করায় মিঃ রবার্টস বলিলেন বাটীতে ক্রমাগতঃ অভ্যাস (Practice) ও রিহার্সাল দ্বারা তিনি এই অদ্ভুত দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। "Dick Turpins ride to york" নামক ঘটনাপূর্ণ নাটকের অভিনয়ে যুবা "ডিক্‌টুরপিন" হইতে বৃদ্ধ "জ্যাসডে" (আর একটী ভূমিকা) পরিবর্ত্তিত হইতে প্রথম প্রথম তাঁহার ৮ মিনিট ধরিয়া সময় লাগিত। ইহাতে দর্শকগণের বিরক্তি বোধ হওয়ায়, ক্রমাগতঃ সাধনায় অভ্যাসে তিনি ৮ মিনিট হইতে এই পরিবর্ত্তনের সময়কে তিন সেকেণ্ডে নামাইয়া আনেন।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা এই—হয়ত: তিনি ষ্টেজে দাঁড়াইয়া কোন ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন, অভিনয়ে তদগতচিত্ত অথচ পরবর্ত্তী ভূমিকায় যে পরিবর্ত্তিত নূতন বেশে তাঁহাকে ষ্টেজে আসিতে হইবে অভিনয়ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াই তাহার কাজ একটু একটু করিয়া অগ্রসর করিয়া আসিতেছেন। তার পর উইংসের পার্শ্বে আসিয়াই মুহূর্ত্ত মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সহিত পুনরায় জন সমক্ষে প্রকাশ!

একবার এই ত্বরিত পরিবর্ত্তন ব্যাপারে একটু বিপত্তিও ঘটিয়াছিল।

তিনি একটী বেল্ট (Belt) বা কোমর-বন্ধনী পরিয়া একখানি নাটকে অভিনয়ে বাহির হন। কিন্তু অন্যমনস্ক অবস্থায় Belt টী অতি কঠিন ভাবে আকর্ষণ করিয়া বাঁধায় প্রথম প্রথম তাঁহার সামান্ত বেদনা বোধ হয়। ষ্টেজে আসিয়া অভিনয় সময়ে সেই বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তিনি যে অংশটী অভিনয় করিতে ছিলেন, তাহার একাংশে যাতনাব্যঞ্জক অবস্থার অভিব্যক্তি ছিল। সেই জন্য অভিনয় যতদূর স্বাভাবিক হইবার তাহা হয়, কিন্তু ষ্টেজের মধ্যে আসিয়াই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

আমাদের নাট্যশালায় আমরা মিঃ রবার্টস্‌এর মত এরূপ কৃতকর্ম্মা অভিনেতার আশা এখন করিতে পারি না বটে, কিন্তু আশা করি—বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতাগণ এই প্রকার কৌশল শিক্ষা করিয়া তাহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন।

দশ হাজার টাকা বাজি ও সাইলক রূপে স্যর হেন্‌রি আর্ভিং।

বর্ত্তমান নাট্যযুগে বিলাতী নাট্য জগতে, কেবল বিলাতী কেন সভ্য জগতের সকল শ্রেষ্ঠ নাট্যশালার উজ্জ্বলতম, মুকুটরত্ন— স্যর হেন্‌রি আর্ভিং—যেমন অভিনয়ের গাম্ভীর্য্য—তেমনি দেশকাল পাত্র জ্ঞানে অভিনয়, তেমনি হাবভাব, তেমনি চাল চলন। রাজা ত একাকারে রাজার পূর্ণ আদর্শ। আর অধম ভিক্ষুক—তা কার সাধ্য তাঁহাকে ধরিতে পারে যে, সেই ভিক্ষুক সেই স্বনামধন্য স্যর হেন্‌রি!

কোন নামজাদা নাট্যশালায় স্যর হেন্‌রি, "মার্চ্চেণ্ট অব ভিনিসের" সাইলকের ভূমিকা অভিনয় করেন। আকারে, দৃশ্যে, ভাষায়, ভাবে, সকল বিষয়ে তিনি সেই নীচমনা সংকীর্ণহৃদয় পিশাচোপম কুসীদজীবি সাইলক। বলা বাহুল্য তখন তিনি মিঃ আর্ভিং। "স্যর" উপাধি পান নাই। অভিনয় চূড়ান্ত হইয়া গেল—অভিনয় দেখিয়া প্রীত

হইয়া একজন বড় লর্ড—হেন্‌রি আর্ভিংকে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলিয়া উপহার দিলেন।

ঘটনাটির জের এখানেই মিটিল না। হেন্‌রি আরভিংএর এই অভিনয়-সাফল্য দেখিয়া লণ্ডনের আর এক সম্প্রদায় তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা খালি বিজ্ঞাপনে এই কথা টুকু খুলিয়া বলিলেন যে "আর্ভিং অনুরূপ বেশ ভূষায় সাইলকের ভূমিকা লইয়া আসরে নামিবেন।"

নাট্যালয়ে লোক ধরেনা। আর্ভিং একবার যে মূর্ত্তিতে সাইলকের ভূমিকার অভিনয় করিয়াছিলেন—তাহাও সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য! আবার তিনি নূতন রকমের কি করিবেন? লোকের আগ্রহ ঔৎসুক্য, উৎকণ্ঠা খুব বাড়িয়া উঠিল। রঙ্গালয় লোকে লোকারণ্য। জনতার ভারে নাট্যশালা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম!!

আরভিং রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন? সে মূর্ত্তি নয়, সে পোষক নয়, সে হাবভাব নয়, সে আওয়াজ নয়, সে চলাফেরা (movement) নয়—সব নূতন. সবই হুবহু পরিবর্ত্তন! কেহ বলিলেন—"না কখনই এ আরভিং নহে। কেহ বলিলেন নিশ্চয়ই এ আরভিং জুনিয়ার।" কেহ বলিলেন—"আরভিংএর কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা! বিজ্ঞাপনের বাহাদুরী আর লোক জমাইবার জন্য সম্প্রদায় এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে।"

ইংরাজজাতি বড়ই নির্ব্বন্ধবাম। যা ধরে তা ছাড়ে না। boxএর দুইজন বড়লোক—এই বিষয় লইয়া তর্ক করিতে করিতে এতদূর উত্তেজিত হইলেন যে তাঁহারা এই ব্যাপার লইয়া একটা মস্ত বাজি রাখিয়া বসিলেন। বাজিও সহজ নয়—পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা। দুই জনেরই মন ছটফট করিতেছে—কে হারে কে জেতে। যিনি আরভিং নয় বলিয়াছিলেন, তাঁহার মনে বিশ্বাস তাঁহার জিত।

বক্সের এই বাজির ব্যাপার শেষে ষ্টেজের অভ্যন্তরে গিয়া আর্ভিংএর কাণে পৌছিল। আর্ভিং মনে মনে এক চোট বেশ আনন্দ উপভোগ করিলেন। অভিনয় সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই দুইজন লর্ড ষ্টেজের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আর্ভিং তখনও সাইলকের পোষাকে। তাহাদের সম্মুখেই তিনি তাঁহার পোষাক, চুল গোঁফ দাড়ি—একে একে খুলিতে লাগিলেন। সেই অসংখ্য সাজসজ্জার মধ্য হইতে বাহির হইল—মিঃ আর্ভিং! ধন্য অভিনয় কৌশল—ধন্য বেশভূষা ও সজ্জার বাহাদুরী! এমন কলাকুশল অভিনেতা জগতের সর্ব্বত্রই আদর ও শ্রদ্ধার যোগ্য।

এই ঘটনার শেষটা বলিয়া ফেলি. যে লর্ড বাজি হারিলেন—অর্থাৎ যিনি বলিয়াছিলেন অভিনেতা আর্ভিং ন'ন, তিনি তৎপরদিন তাঁহার বন্ধুর নামে London Bank এর উপর একখানি পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক দিলেন। তাঁহার বন্ধুও এমনি উদারচেতা যে তিনি সেই চেক-খানি ভাঙ্গাইয়া এক স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলিয়া আর্ভিংকে পাঠাইয়া দেন। আর্ভিংএর নির্লোভিতা ও মহত্ব আবার এত বেশী যে তিনি স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ থলিয়া ধন্যবাদ ও বিস্ময়ের সহিত সেই লর্ডকে ফেরত দিয়া বলিয়া পাঠান—"আপনাদের মত ইংলণ্ডের গণ্যমান্য দুইজন লোক যে আমার অভিনয় কৌশলে মুগ্ধ হইয়াছেন—ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আমি অর্থ গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। এজন্য আমায় মার্জ্জনা করিবেন।"

এবার এই পর্য্যন্ত; ভবিষ্যতে এইপ্রসঙ্গে আরও চিত্তত়ৃপ্তিকর কথার অবতারণা করা হইবে।

২১৫

মদিরা।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত)

সরলা তরলা আমি মানব মোহিনী
সঙ্গমত্ত রঙ্গ মম কত।
বাসনার অনুগামী আনন্দদায়িনী
যে চাহে যে ভাবে তাহে মত্ত।
যোগাসনে উচ্চ ধ্যানে উচ্চ কামনায়,
আমি তার হৃদি আমোদিনী।
বিরাগী বাসনা তুচ্ছ করে যে হেলায়,
উন্মাদের আমি উন্মাদিনী॥
শূর ধরি তরবারি শত্রু মাঝে ধায়,
নৃত্য যার অস্ত্র ঝন ঝনে।
তৃণ জ্ঞান করে প্রাণ বীর গরিমায়,
রঙ্গিনী সঙ্গিনী রণাঙ্গনে॥
বিলাসী নেহারে হাসি রমনী অধরে,
রসবতী দূতী আমি তার।
ভাসাই মাতাই মন রসের লহরে,
রঙ্গে খেলে তরঙ্গের হার।
নীচ সঙ্গে নীচ রঙ্গে করি নীচ সেবা,
তরলাঙ্গী ভাবের অধীনী।
মনে বুঝে দেখ নিন্দ মোরে যেবা,
মত্ততার মঞ্চ এ মেদিনী॥

নাট্য-রহস্য।

(শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী মহাশয় একদা কোনও
একখানি সুপ্রতিষ্ঠিত নাটকের এক প্রধান ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে
অবতীর্ণ হইয়াছেন; রঙ্গালয় অসংখ্য দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ। অর্দ্ধেন্দু বাবু
অভিনয় প্রসঙ্গে ভৃত্যের উদ্দেশ্যে ডাকিলেন—"হরে—অ হরে—হরে-
॥?" অর্দ্ধেন্দু শেখরের অভিনয় নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়াই হউক, অথবা
রঙ্গ করিবার অভিলাষেই হউক, গ্যালারীর শেষ প্রান্ত হইতে এক
জন দর্শক বলিয়া উঠিল,—"এজ্ঞে?" ভৃত্যকে ডাকিতে ডাকিতে
অর্দ্ধেন্দুবাবু রঙ্গমঞ্চ হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন, উত্তর শুনিবামাত্র
ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—দূর গুওটা
টা!—তুই ওখানে গিয়ে বসে আছিস্?"—অর্দ্ধেন্দুর ব্যাঙ্গোক্তি
শুনিয়া রঙ্গালয়ে হাস্য কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিল!

"গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটারের জনপ্রিয় অভিনেতা হাস্যার্ণব অক্ষয়-
কুমার চক্রবর্ত্তী কোনও একখানি সামাজিক নাটকে এক ভক্ত বিটলের
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তবিটেল সাজিয়া অক্ষয় কুমার জনৈক
পথিকের পুঁটুলি খুলিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে উদ্যত,—এমন সময়
গ্যালেরির কয়েক জন দর্শক রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে হেঁচো শব্দে চিৎকার
করিয়া উঠিলেন; হাঁচির শব্দে হাস্যার্ণব মহাশয় প্রথমে চমকিয়া
উঠিলেন। পরক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"বাঁচলুম বাবা
-এ মানুষের হাঁচি, গো হাঁচি—নয়!"

বসন্তপুর—জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত একখানি গণ্ডগ্রাম।

এই গ্রামে স্কুল আছে, পোষ্ট আফিস আছে, চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী আছে, পাবলিক লাইব্রেরী আছে, ফুটবল ক্লাব আছে, অনুশীলন সমিতি আছে, এবং অন্তত পাঁচটি অ্যামেচিওর থিয়েটার পার্টি আছে। বসন্তপুরের গঞ্জ খুব বিখ্যাত—একটা ছোট খাটো বন্দর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গঞ্জে মোটের উপর প্রায় তিন শত বড় বড় আড়ৎ প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক এখানে ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে। গঞ্জের অনতিদূরে নদীতীরে এণ্ড্ ইউল কোম্পানীর পাটের কল; প্রায় পাঁচ হাজার লোক এই কলে কাজ করে; তাহার ফলে গঞ্জটী আরও জমকাইয়া উঠিয়াছে। শারদীয়া পূজার সময় বসন্তপুরের গঞ্জে মহাসমারোহে বারোয়ারী হইয়া থাকে, বারোয়ারীতে দুর্গাপূজাই হয়। পাটের কলের সাহেবরাও বারোয়ারী পূজায় প্রচুর পরিমাণে চাঁদা দিয়া থাকেন। পূজার তিন দিনই থিয়েটার যাত্রা খেমটা প্রভৃতির আয়োজনানুষ্ঠান হয়। একবার বসন্তপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সখের নাট্যসম্প্রদায় "আর্য্যবান্ধব নাট্যসমাজ" বসন্তপুরের গঞ্জে পূজার সময় দুই রাত্রি অভিনয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রথম রজনীতে তাঁহারা "লঙ্কা দহন" নামক একখানি নাটকের অভিনয় করেন; অভিনয় রাত্রে সুসজ্জিত সুবিশাল আসরে প্রায় পাঁচ সহস্র দর্শক উপস্থিত; তাঁহাদের মধ্যে পাটের কলের প্রায় এক ডজন সাহেব বিরাজমান! দর্শকমণ্ডলি বিশেষ—পাটের কলের সাহেবগণ সহাস্য আস্যে হনুমানের অঙ্গভঙ্গী ও লাফালাফি দেখিয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইলেন আসরে হাসির ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল; অভিনয় অন্তে সাহেবরা সহাস্য আস্যে হনুমানের বিশেষ তারিফ করিতে করিতে কুঠিতে ফিরিলেন। পর দিন রাত্রে এই নাট্য সম্প্রদায়ের পুনরাভিনয়; গত রাত্রের সাহেবগণ এরাত্রেও মহাউৎসাহে অভিনয় দেখিতে চলিলেন। এইদিন নাট্য সম্প্রদায় "ব্যাসদেব" নামক একখানি ধর্ম্ম-মূলক নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা

করিলেন ; অভিনয় আরম্ভ হইল। সাহেবগণ প্রথম দৃশ্যের হনুমানের দর্শন প্রতিক্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু প্রথম দৃশ্যে তাঁহারা হনুমানের পরিবর্ত্তে ঋষিবালকগণকে দেখিলেন, দৃশ্যের পর দৃশ্য চলিয়া গেল, সাহেবগণ রুদ্ধনিশ্বাসে হনুমানের আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু হনুমান আসিল না ; প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ হইল। সাহেব-গণ ভাবিলেন, দ্বিতীয় অঙ্কে হনুমান নিশ্চয়ই আসিবে। কন্‌সার্টের পর ড্রপ উঠিল ; সাহেবগণ রুদ্ধ নিশ্বাসে হনুমানের জন্য ষ্টেজের উপর ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সহসা তাঁহাদের বদনমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তাঁহারা দেখিলেন দীর্ঘ শ্মশ্রু জটাধারী একব্যক্তি রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত। তিনি ব্যাসদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ ; সাহেবরা ভাবিলেন, এই লোক হনুমানের দ্বিতীয় সংস্করণ, সুতরাং আমোদ মিলিবেই লম্ফ ঝম্প করিবেই কিন্তু ব্যাসদেব রঙ্গমঞ্চে কোনও প্রকার রঙ্গভঙ্গ না করিয়া যখন হরি মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন সাহেবদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল ; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বারোয়ারীর প্রধান পাণ্ডাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হনুমান আজ অমন tame and spiritless কেন ?"

বারোয়ারীর পাণ্ডা বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন,—"সাহেব, উনি তো হনুমান নন,—উনি যে হিন্দু ঋষি ব্যাসদেব !"

কৈফিয়ৎ শুনিয়াই সাহেবগণ একেবারে অগ্নিশর্ম্মা ; চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সক্রোধে বড় সাহেব বলিয়া উঠিলেন,—stop your ব্যাসদেব-হনুবোলাও !

* * * * *

নৃত্যলাল সেণ্ট্রাল থিয়েটারের এক জন হাস্যরসিক অভিনেতা ; তাহার অভিনয়পটুতা ও রসিকতায় নাট্যামোদী দর্শকগণ বিমুগ্ধ। নৃত্যলাল থিয়েটারে মাসে বেতন পায় এক শত টাকা, কিন্তু তাহার

দৈনিক খরচ প্রায় পাঁচ টাকা। এরূপ অবস্থায় তাহার মত লোকের হস্তে পয়সা জমিবার কস্মিন কালেও সম্ভাবনা ছিলনা; ফলেও হইয়াছিল তাই। অধিকন্তু দেনার দায়ে অনেক সময় তাহাকে বিপদে পড়িতে হইত। একদিন বেলা ছয়টার পর নৃত্যলাল বাসা হইতে বাহির হইয়া থিয়েটারে আসিতেছিল, বিডনষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়াছে, এমন সময় পঞ্চাশ টাকা দেনার জন্য দুটী বেলিফ আসিয়া তাহাকে পাকড়াও করিল। নৃত্যলাল এইব্যাপারে একটু দমিল বটে কিন্তু ভয় খাইয়া হতবুদ্ধি হইল না; সে সতর্কনয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। ঘটনা ক্রমে সেই সময় সেই স্থান দিয়া সর্ব্বনাশী কাগজের সম্পাদক বিশ্বব্যোম শর্ম্মা গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, নৃত্যলাল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই বেলিফদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল বেশ হয়েছে; এই যে আমার ভাই, সর্ব্বনাশীর এডিটার যাচ্ছেন। দাঁড়াওতো আমি গিয়ে ওকে এক বার বল্লেই উনি আমার যায় খরচা সমস্ত দেনা চুকিয়ে দেবেন।" বেলিফরা তাহার উপর দৃঢ় লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল। নৃত্যলালও ছুটিয়া গিয়া সম্পাদকের গাড়ী থামাইয়া তাঁহাকে নিম্নস্বরে বলিল,—"মহাশয়! ঐ যে দুটি লোক দেখছেন, ওদের বড়ই শকটাপন্ন অবস্থা, ওদের দুজনেরই দুটো মেয়ে ক'দিন হ'ল বিধবা হয়েছে; তার দরুণ ওদের মন এত খারাপ হয়ে পড়েছে যে, হয়তো কোন্ দিন আত্মহত্যা করে বসবে। আমি সেই বিধবাদের আবার বিয়ে দেবার জন্যে ওদের বল্‌ছি, তা ওরা কিছুতেই রাজী হচ্ছে না; মনে ওদের ইচ্ছা আছে, কিন্তু সমাজের ভয় কর্‌ছে! আপনি অনুগ্রহ ক'রে ওদের বুঝিয়ে না দিলে আর উপায় নাই।" সর্ব্বনাশী কাগজের সম্পাদক বিধবার গন্ধ পাইয়াছেন, আর রক্ষা আছে? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা, আমি ওদের ব্যবস্থা কর্‌ছি।"

তার পর তিনি বেলিফদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওহে তোমরা কাল আমার সঙ্গে দেখা কোরো, আমি তোমাদের সকল গোল মিটিয়ে দেব।" বেলিফরা সর্ব্বনাশী সম্পাদককে জানিত, তাঁহার কথা শুনিয়া তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। নৃত্যলালও ভাল মানুষটীর মত থিয়েটারে চলিয়া গেল।

পরদিন বেলিফদ্বয় সর্ব্বনাশী আফিসে উপস্থিত। সর্ব্বনাশী সম্পাদক তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন,—"কিহে, তোমাদের মনে কি সন্দেহ হয়েছে বল।" বেলিফদ্বয় তো অবাক্! সবিস্ময়ে বলিল,—"আজ্ঞে সন্দেহ আবার কি? আপনার ভাই নৃত্যলাল পঞ্চাশটাকার জন্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন; আপনি ব'ল্লেন, আজ নিশ্চয়ে দেবেন, তাই তো আমরা আপনার কাছে এসেছি।"

সর্ব্বনাশী সম্পাদক ব্যাপার বুঝিলেন, আর বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ মায় খরচা সমস্ত দেনা চুকাইয়া দিয়া বেলিফদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

* * * * *

কুমারী কটী মার্কিন যুক্তরাজ্যের কোনও এক প্রসিদ্ধ থিয়েটারের নামজাদা নর্ত্তকী ও অভিনেত্রী। সংপ্রতি কটী, রীড নামক জনৈক যুবক অভিনেতা ও নর্ত্তকের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। ইহার অভিযোগের মর্ম্ম এইরূপ;—"সে দিন একখানা অপেরের রীড আমার সহিত নাচিয়াছিল; প্রথম অঙ্ক শেষ হইয়া গেলে, যখন কন্সার্ট বাজিতে লাগিল, সেই সময় রীড সুযোগ পাইয়া আমাকে ধরিয়া চুম্বন করিল; করিল তো করিল একেবারেই আমার দুইটি ঠোঁটই চুষিয়া লইল। থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেলে আমি স্বগৃহে আসিলাম। কিন্তু স্বস্তি পাইলাম না। ঠোঁটে বেদনা হইল, ঠোঁট ক্রমে ফুলিতে লাগিল। এই দেখুন, এখন আমার অধরোষ্ঠ ফুলিয়া কি

ভয়ঙ্কর হইয়াছে। ষাঁড়ের মুখের কাঁটায় আসিয়াই আমার ঠোঁটের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।”

কুমারী কচীর অভিমান শুনিয়া বিচারক বলিয়াছেন,—“যাও, অগ্রে ভাল ডাক্তারকে দেখাইয়া ঠোঁট ফুলার নিদান স্থির কর। ডাক্তারে যদি বলেন, চুম্বনেই ঠোঁট ফুলিয়াছে, যদি বলেন, ষাঁড়ের মুখে রোগের কাঁটায় ছিল, তাহাহইলে আবার নালিশ করিয়ো; আমি ষাঁড়কে ওয়ারেন্টে ধরিয়া আনিব। কিন্তু তোমাকে ইহাও প্রতিপন্ন করিতে হইবে যে, তোমার ঠোঁটে ষাঁড় ব্যতীত আর কাহারো মুখ-স্পর্শ হয় নাই।”—ডাক্তারের পরীক্ষা চলিতেছে।

* * * * *

কুমারী এনা প্যাড্‌লোভা রুষিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। গীত, বাদ্য, নৃত্য ও অভিনয়—সকল বিষয়েই ইঁহার অতুলনীয় অভিজ্ঞতা। এই এনা প্যাড্‌লোভার অভিনয়-নৈপুণ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া রুষিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট নিকোলাস রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া ইহাকে রত্নহার প্রদানে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, এনা প্যাড্‌লোভা জর্ম্মণীর বর্ত্তমান যুবরাজের আমন্ত্রণে জর্ম্মণরাজ্যে সময় করেন। এনা প্যাড্‌লোভার গুণপনার পরিচয় গ্রহণ করাই যুবরাজের অভিপ্রায় ছিল। এনা প্যাডলোভা কোন্ দিন কোন্ সময়ে জর্ম্মণীতে উপস্থিত হইবেন, তাহা পূর্ব্বেই যুবরাজকে জানাইয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে এনা জর্ম্মণ-রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, যুবরাজ রাজধানীতে উপস্থিত নাই—মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। যুবরাজের নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীগণ প্রভুর অনুপস্থিতির কারণ জানাইয়া এনাকে প্রাসাদে বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এনা প্রাসাদে প্রবেশ করা দূরের কথা, গাড়ী হইতে নামিলেন না, তিনি কর্ম্মচারীকে বলিলেন,—“তোমার প্রভুকে বলিয়ো, রুসরাজ্যের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী এনা

প্যাণ্ড্‌ভোতা জর্ম্মনীর যুবরাজের ঐশ্বর্য্য দেখিতে আসেন নাই,—ভদ্রতার অনুরোধে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহারই দর্শন নাই! এরূপ স্থলে এনা প্যাণ্ড্‌ভোতা আর এক দণ্ড থাকিতেও ইচ্ছা করেন না।—তাঁহাকে একথাও বলিয়ো,—এনা প্যাণ্ড্‌ভোতা জর্ম্মনীর যুবরাজের নিকট অভ্যর্থনা-প্রত্যাশী, তাঁহার কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অভ্যর্থিতা হইবার প্রত্যাশা তিনি কল্পনাও করেন নাই!"

ইহার দুইঘণ্টা পরে যুবরাজ মৃগয়া করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন; এনার কথা শুনিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন; এনাকে পুনরায় রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া তিনি লোক পাঠাইলেন; কিন্তু এনা আর ফিরিলেন না, যুবরাজের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া রুসিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। সেখানে তিনি গণ্য মান্য রুস-নাগরিকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে অভ্যর্থিতা হইলেন।

* * * * *

আমেরিকার কালিফর্ণিয়ায় এক রঙ্গরাণী আছেন, তাঁহার নাম পোর্শিয়া নাইট; এখন তাঁহার বয়স ছত্রিশ বৎসর মাত্র। পোর্শিয়া নাইট সঙ্গীতে অদ্বিতীয়া, রূপগুণযৌবনে অতুলনীয়া। একবার পোর্শিয়া বিলাতে মজুরা করিতে গিয়াছিলেন; বিলাতের লণ্ডন থিয়েটারে পোর্শিয়াকে দেখিয়া মাঞ্চেষ্টারের ডিউক মুগ্ধ হন। ডিউক বাহাদুর এই অভিনেত্রী-কুল-রাণীকে নিজের পাটরাণী করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কন্দর্পের দর্প শেষ পর্য্যন্ত ফলে না, তাই পোর্শিয়াকে আদালতের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অজুহত দেখাইয়া তিনি ডিউকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং এই

মামলায় তিনি জয়যুক্ত হইয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা খেসারত পাইয়াছিলেন।

* * * * *

বেরণ পত্নী শ্রীমতী শ্রাত অষ্ট্রিয়ার সর্ব্বজন প্রিয়া অভিনেত্রী। ইহাঁর খ্যাতি কেবল অষ্ট্রিয়া রাজ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; ইহাঁর কথা লইয়া সমস্ত ইয়োরোপ ব্যস্ত, ইয়োরোপের অষ্ট্রিয়া রাজ্যে ইহাঁর কথা ছাড়া অন্য কোনো অভিনেত্রীর সুখ্যাতির কথা এখন আর শ্রুত হয় না; অষ্ট্রিয়ার রাজধানী বিয়েনা সহরের সব লোকই ইহাঁকে দেখিবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞী এনার্কিষ্টের গুলিতে নিহত হন, তখন অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন, অভিনেত্রী বেরণ-পত্নী শ্রীমতী শ্রাত বুঝি বা অষ্ট্রিয়ার বৃদ্ধ সম্রাটের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া বসেন।—বুঝিবা রঙ্গেশ্বরী রাজেশ্বরের হৃদয়েশ্বরীই হইয়া উঠেন!

কিন্তু বেরণ-পত্নীর বেরণ বাহাদুর এখনো জীবিত! বেরণ শ্রীমান শ্রাত অষ্ট্রিয়ার সুধী সমাজে সমাদৃত, গণ্য মান্য, বরেণ্য বলিয়া বিদিত; পত্নীর সম্বন্ধে এ জনরব তাঁহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিয়াছিল; স্বামীর মনোভাব বুঝিতে রঙ্গেশ্বরী পত্নীর বড় বিলম্ব হয় নাই; তিনি এই ভাবে এক কৈফিয়ৎ দিয়া বলিলেন—"আমি আমার বেরণ প্রেতকে ছাড়িয়া সম্রাটকে বিবাহ করিব, এ জনরব সত্য নহে। তবে সম্রাট আমাকে খুবই ভালবাসেন বটে, কিন্তু এ ভালবাসা নূতন নহে; সম্রাটের মহিষী যখন জীবিতা ছিলেন, তখনও আমাদের এই ভালবাসা ছিল শারীরিক ও মানসিক অবসাদে অবসন্ন এ ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া রাজমহিষী যখন পতিকে ছাড়িয়া দেশান্তরে বেড়াইতে যাইতেন, তখনই আমাকে স্বীয় পতির কাছে—সম্রাটের কাছে রাখিয়া যাইতেন; মহিষীর সহিত আমার বড়ই বন্ধুত্ব ছিল, তাই তিনি আমাকেই পতির

কাছে রাখিয়া খাইতেন। আমিও মহিষীর অনুরোধ কিছুতেই এড়াইতে পারিতাম না। সম্রাটের কাছে থাকিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিতাম। আমি পড়িতাম, সম্রাট শুনিতেন; সম্রাট রাজকীয় উপবনে ভ্রমণ করিতেন, আমি ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতাম, গল্প শ্রবণ করিতাম। এইরূপেই সম্রাটের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। কিন্তু এই পর্য্যন্তই বন্ধুত্ব হইয়াছিল; মহিষী আমাকে বিশ্বাস করিতেন, আমিও সেই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি ইহা আমার সাধারণ গৌরব নহে—আমার সামান্য শ্লাঘা নহে। আমি যে ভক্ত বিশ্বাসের একটি দিন ও ব্যতিক্রম করিতাম না, তাহা আমার অন্তরঙ্গ এবং বন্ধুজনদিগের সম্যক বিদিত।"—বেরণ-পত্নীর এই মুখরোচক কৈফিয়ৎ শুনিয়া তাহার বেরণ স্বামী তুষ্ট, অষ্ট্রিয়ার জনসাধারণ তুষ্ট!

* * * * *

ম্যাদাম প্যাত্তি স্পেন রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। পাশ্চাত্য রঙ্গজগতে এখন যে কয়জন রঙ্গ-রাণী বিরাজিতা, ম্যাদাম প্যাত্তি তাঁহাদের অন্যতম ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ নগরে ম্যাদাম প্যাত্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে স্পেনে সঙ্গীত বিদ্যা ও নাট্য-কলা শিক্ষা করেন, পরে ফরাসী দেশে ইহাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইনি নিউইয়র্ক সহরে গিয়া প্রথমে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের লণ্ডনে আমীনা সাজিয়া 'কভেণ্ট গার্ডেন' রঙ্গভূমি মাত করিয়াদেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রুশ-রাজ্যে আসিয়া মস্কাউ নগরে সম্রাটকে মোহিত করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলেন। এখন প্যাত্তি বিলাতের ওয়েল্‌স্ রাজ্যের অধিবাসিনী; ক্রেগিনোস সহরকে তিনি অলকায় পরিণত করিয়াছেন। অভিনয়ের আরে এই অভিনেত্রী অনেক রাজ-

রাণীকেও পরাজিত করিয়াছেন। প্যাত্তির তিন বিবাহ; প্রথম ও দ্বিতীয় স্বামী লোকান্তরিত হইয়াছেন; সুইডেন রাজ্যের এক সম্রান্ত বংশের যুবক ম্যাদাম প্যাত্তির তৃতীয় পক্ষের পতি। প্যাত্তির বয়স এখন প্রায় ষাট বৎসর, কিন্তু বয়সে প্রবীণা হইলেও প্যাত্তি রূপেগুণে এখনও তিনি নবীনা; প্যাত্তির পতি কিন্তু নবীন যুবাপুরুষ; তাঁহার বয়স এখন ছত্রিশ বৎসর মাত্র। ম্যাদাম প্যাত্তি এখনও রঙ্গালয়ে অভিনয় করেন।

নাট্য-প্রসঙ্গ।

নাট্য-সম্রাট শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছেন; তিনি শীঘ্রই বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাইবেন। নটনাথ নটগুরুকে নিরাময় করুন।

* * *

"গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা, "নাট্যমন্দিরে"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মধ্যে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিলেন, এক্ষণে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

* * *

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী বসন্তকুমারী সংপ্রতি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুচিকিৎসকের কল্যাণে তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

* * *

স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

"কনেবউ" নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কোনও প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে অভিনীত হইবে।

* * *

সুলেখক শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি সামাজিক নাটক রচনা করিতেছেন; গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হইবে। ভুপেন বাবুর "সংসঙ্গ" নাটক প্রকাশিত হইয়াছে; সুধীসমাজে তাঁহার "সংসঙ্গের" আদর হইয়াছে।

* * *

গ্রেট ন্যাশন্যালের অন্যতম সঙ্গীত-শিক্ষক ও সুবিখ্যাত যন্ত্রবাদক শ্রীযুক্ত তারাপদ রায় হারমোনিয়ম ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা দিয়া থাকেন। শিক্ষার্থীগণ ১৭ নং মহেন্দ্র গোস্বামীর লেনে অনুসন্ধান করিলে সকল সংবাদ অবগত হইবেন।

* * *

কয়েক মাস হইতে "গ্রেট ন্যাশন্যাল", "মিনার্ভা" ও "কোহিনুর"—তিনটি থিয়েটারেই তিনখানি নূতন নাটকের অভিনয় চলিতেছে। গ্রেট ন্যাশন্যালে—"বাজীরাও", মিনার্ভায়—"চন্দ্রগুপ্ত" এবং কোহিনুরে—"বিশ্বামিত্র।" ষ্টারে এখন পুরাতন রঙ্গনাট্যগুলিরই অভিনয় চলিতেছে।

* * *

"বাজীরাও" প্রণেতা, "নাট্যমন্দিরে"র সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি নূতন ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিতেছেন; এই নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য মণিবাবু পূজার সময় ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও মহারাষ্ট্র-প্রদেশে গমন করিবেন।

* * *

গত ২৬শে ভাদ্র মঙ্গলবার গ্রেট ন্যাশন্যালের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা 'বাজীরাওয়ে'র "রণজী"—শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন মিত্রের সাহায্যার্থ এক বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল। এই সাহায্য-রজনীর উদ্বৃত্ত সমস্ত অর্থই ক্ষেত্র বাবু প্রাপ্ত হইয়াছেন। গুণীর আদর গুণবান ব্যক্তির নিকটই হইয়া থাকে, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত।

* * *

নটগুরু শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তাঁহার রচনা "নাট্য-মন্দিরে" প্রকাশিত হইবে। অবিনাশ বাবুর সাধনা সফল হউক, নট-নাথের নিকট ইহাই আমাদের কামনা।

* * *

হাবড়া হইতে "সাহিত্য-সংবাদ" নামে একখানি সাহিত্য-সম্পর্ক-মূলক মাসিকপত্র বাহির হইয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় এই নবীন পত্রিকার পরিচালক। সাহিত্য-সেবিগণের সাহিত্য-সেবা-সংক্রান্ত সংবাদ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। সাহিত্য-জগতে দুর্গাদাস বাবুর "সাহিত্য-সংবাদ" প্রতিষ্ঠা-লাভ করুক—ইহাই আমাদের কামনা।

* * *

সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "আকবরের স্বপ্ন" নামক পঞ্চাঙ্ক নাটক খানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। "আকবরের স্বপ্ন" কহিনূরে অভিনীত হইয়াছিল। হরিসাধন বাবুর 'শীষমহল' নামক একখানি সুবৃহৎ উপন্যাসও যন্ত্রস্থ; শীষমহল—মোগল-সম্রাট আকবর সাহার শাসনকালের ঘটনাবলিতে পরিপূর্ণ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হরিসাধন বাবু সিদ্ধহস্ত; তাঁহার জীবনযুদ্ধ যে সুধী-সমাজে সমাদৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * *

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত অমরেন্দ্র বাবুর প্রণীত "আহা মরি" নামক নক্সাখানির অভিনয় নিষিদ্ধ হইয়াছে; "আহামরি" নিষিদ্ধ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে "আহা মরি"র প্রচার বন্ধ করিবার ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকাশ,—"আহা মরি" নাকি কোন কোন বকধার্ম্মিকের মানে খোঁচা দিয়াছিল,—তাই তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা যত্ন করিয়া 'আহামরি' বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাদের ক্ষত মানের গোড়ায় ছাই চাপা দিয়াছেন!

* * *

"জনা" ও "লেডী ম্যাকবেথের" অভিনেত্রী শ্রীমতী তিনকড়ি বহুকাল পরে সে দিন দেবকণ্ঠ বাবুর সাহায্যরজনীতে এক রাত্রের জন্ত মিনার্ভায় "পাণ্ডব গৌরবে" সুভদ্রার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবকণ্ঠ বাবুর সাহায্য-রজনীতে কহিনুর থিয়েটারের শ্রীমতী কুসুম কুমারী, শ্রীযুক্ত অপরেশ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পালিত পাণ্ডব-গৌরবের অভিনয়ে যোগদান করিবেন—এইরূপ বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যকালে—তাঁহারা কেহই রঙ্গমঞ্চে দর্শন দেন নাই!—এজন্য সেদিন দর্শকগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন।

* * *

সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা শ্রীমতী রাণীসুন্দরী এখন "গ্রেট ন্যাশান্যালে" অভিনয়-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাণীসুন্দরী সঙ্গীতে সুপ্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, এখানে নাট্যাভিনয়েও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া জন সাধারণের সুখ্যাতির অধিকারিণী হইয়াছেন। "জীবনে-মরণে" নাটিকায় আমীনার

ভূমিকায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়া তিনি সমালোচকগণের নিকট অভিনয়-নিপুণা অভিনেত্রী বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছেন। "বাজীরাও" নাটকে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী বসন্তকুমারী 'মস্তানীর' ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু মধ্যে সহসা বসন্তকুমারী অসুস্থা হওয়ায়, মস্তানীর ভূমিকার জন্য রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ চিন্তিত হন; কিন্তু রাণীসুন্দরী স্বেচ্ছায় মস্তানীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে সম্মত হন, এবং এক দিনের চেষ্টাতেই সুকৌশলে মস্তানীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রশংসা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবীনা অভিনেত্রীর এরূপ সাহস ও কৃতিত্ব আদর্শস্থানীয় ও অভিনেত্রীগণের অনুকরণীয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

* * *

গত ৪ঠা আশ্বিন বৃহস্পতিবার "গ্রেট ন্যাশান্যাল" থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সাহায্য-রজনী উপলক্ষে উক্ত থিয়েটারে "প্রফুল্ল" ও রাণীভবাণী" এই দুইখানি নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই সাহায্য-রজনীর অভিনয়ে দেশবিখ্যাত নাট্যকার ও নটরাজ, ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমৃতলাল বসু অমর বাবুর প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া "প্রফুল্ল" নাটকে 'রমেশে'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অসাধারণ মহত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে 'ষ্টারে'র সুবিখ্যাত অভিনেতা, বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যতম অভিনেতা শ্রীযুত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী "প্রফুল্ল" ও "রাণীভবাণী" নাটকে কয়েকটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এরূপ অভিনেতা-সমন্বয় বহুকাল সংঘটিত হয় নাই; সে রাত্রে রঙ্গালয়ে অভূতপূর্ব্ব জনসমাগম হইয়াছিল, বহুসংখ্যক দর্শককে নিরাশহৃদয়ে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল, ইহাতে মনে হয়, যাঁহারা আজিকালিকার

উত্তরিকয়ে আত্মোৎসর্গ-পরাঙ্মুখ নহেন। এই দিন "মিনার্ভা" থিয়েটারেও অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সাহায্যার্থ অভিনয় হইয়াছিল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী তিনকড়ি দাসী এই রাত্রে "মিনার্ভা" থিয়েটারে "জনা" নাটকে "জনা"র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* * *

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের "রাবেয়া" ও "বিনিময়" নামক দুইখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। রাবেয়া মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের বিশেষ পূজনীয়া ঐতিহাসিক মহিলা। নাট্যকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "নাটকের সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ অতি অল্প। আমি কল্পনাকে স্বেচ্ছাধীন পরিচালিত করিয়াছি, ইতিহাসের অনুকরণ করি নাই।" রাবেয়ার চরিত্র অনেকটা আমাদের দেশের মীরাবাইয়ের চরিত্রের অনুরূপ; রাবেয়ার চরিত্র পবিত্র—নিষ্কলঙ্ক; নাটকে রাবেয়ার চরিত্র উজ্জলরূপে ফুটিয়াছে; অন্যান্য নাটকীয় চরিত্রগুলিরও বেশ বিকাশ হইয়াছে। তবে কোনও কোনও স্থলে পাত্র-পাত্রীর বক্তৃতা অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। দীর্ঘ বক্তৃতা কাব্যের উপযোগী, দৃশ্যকাব্যে বা অভিনয়ে বক্তৃতাগুলি অনতিদীর্ঘ হইলেই শোভন হয়। ফলতঃ গ্রন্থ অকটি নাট্যকারের উজ্জল কল্পনায় ঘাত-প্রতিঘাতে ও কাব্যালোকের বিচিত্র বর্ণরাগে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু যেখানে তিনি ইতিহাসের প্রস্তর দৃঢ় রাজপথে তাঁহার কল্পনা সুন্দরীকে দাঁড় করাইতে বাধ্য হইয়াছেন,—সেইখানে নাটকীয় ঘটনা ও তাঁহার কল্পনা উভয়ে তেমন মিশ খায় নাই; কিন্তু তথাপি সুধী পাঠক শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলে কাব্যানন্দলাভে বঞ্চিত হইবেন না। লেখকের "বিনিময়" নাটকখানি সেক্সপীয়রের একখানি নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত; এই নাটকখানি "মনোরমা" নামে পুরাতন ক্লাসিক থিয়েটারে

অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যামোদী ব্যক্তিগণ এই যুগল নাটক পাঠ করিলে তৃপ্তিলাভ করিবেন বলিয়াই আমাদের মনে হয়। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে গুরুদাস বাবুর দোকানে এই নাটক পাওয়া যায়।

* * *

এবার "নাট্যমন্দিরে" বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বঙ্গীয়—নাট্যশালার অন্যতম বীর্য্য—পুরুষ। ইঁহার পিতার নাম ৺ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; ইনি পিতা মাতার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। ইঁহারা পঞ্চ সহোদর ; তন্মধ্যে প্রথম ৺দেবেন্দ্রনাথই বাঙ্গালা গীতি-নাট্যের এবং দেশভক্তিমূলক নাটিকার আদিলেখক। বাঙ্গালার সেই প্রথম গীতিনাট্য, "সতী কি কলঙ্কিনী ?" ও প্রথম দেশ-ভক্তিমূলক নাটিকা "ভারত মাতা" ইঁহারই লেখনিপ্রসূত। নগেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র ; তৃতীয় ৺হেমচন্দ্র মেডিকেল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসার সহিত বহুদিন সরকারী কাজ করিয়া গিয়াছেন ; চতুর্থ কিরণচন্দ্র উত্তরকালে প্রশংসনীয় অভিনেতা হইয়াছিলেন ; পঞ্চম শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। কলিকাতায় ইঁহাদের বহুদিনের বাস। বীডন ষ্ট্রীটের মধ্যে রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীটে ১৯ নং ফটক ওয়ালা বৃহৎবাড়ীই ইঁহাদের বসত বাড়ী ছিল। অবশেষে ঐ গলিতে ভদ্রবাস দুর্ঘট হইলে, ইঁহারা বাগবাজার বাবুপাড়ায় রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে বাড়ী কিনিয়া বাস করেন। বাগবাজারে নগেন্দ্রনাথ এক ব্যায়াম-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন ; পরে এই ব্যায়াম-সঙ্ঘ নাট্য-সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। নাট্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কন্সার্ট পার্টির সৃষ্টি হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ এই কন্সার্টে ঢোল বাজাইতেন। কন্সার্ট পার্টির সমস্ত ব্যয়ভার নগেন্দ্রনাথই বহন করিতেন। উত্তরকালে

নগেন্দ্রনাথ "ন্যাশানাল" থিয়েটারে অভিনেতাও হইয়াছিলেন। তরুণ-ভূমিকায় অভিনয়ে ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। "লীলাবতী" নাটকে হেমচাঁদ, "সধবার একাদশী" নাটকে অটল এবং "নীল-দর্পণে" নবীন মাধবের ভূমিকায় ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের চেষ্টায় "ন্যাশানাল" থিয়েটারের সৃষ্টি হইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। নগেন্দ্রনাথের মৃতকাহিনী অতি শোচনীয়; পূর্ণ যৌবনে ছাদ হইতে পদস্খলিত হইয়া তিনি অকালে লোকান্তরিত হন।

[বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ।]

দ্বিতীয় বর্ষ।	কার্ত্তিক, ১৩১৮।	৪র্থ সংখ্যা।

ভারতীয় সঙ্গীত।

(জনৈক সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত।)

অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্য সমাজে সঙ্গীতের যথেষ্ট সমাদর হইয়া আসিতেছে। নৃত্য ও বাদ্য সঙ্গীতের নিত্য সহচর। গীত, বাদ্য ও নৃত্যকে সংস্কৃত ভাষায় এক কথায় তৌর্য্যত্রিক বলে। তৌর্য্যত্রিক সুকুমার শিল্পকলার অন্তর্গত এবং চতুঃষষ্ঠী কলা বিদ্যার প্রধান। সঙ্গীতে যত শীঘ্র অন্য লোককে মুগ্ধ করিতে পারা যায়, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ হয় না। মনুষ্য ত দূরের কথা, সঙ্গীতে বনের পশু-পক্ষীও মুগ্ধ হয়; ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প এবং কালান্তক যমের ন্যায় সিংহও নিশ্চল হইয়া থাকে। সঙ্গীতের এইরূপ মোহিনী শক্তি দেখিয়াই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন,—"জ্ঞানাৎ পরতরং নহি,—গানাৎ পরতরং নহি।"—জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, গানের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

প্রাচীন আর্য্যগণ সকল বিষয়েই যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিতেন, সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধেও তাহার ত্রুটী করেন নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিব। পাশ্চাত্য দেশে সঙ্গীতজ্ঞগণ প্রধান সাতটি সুরের মধ্যে পাঁচটি মধ্যসুর আবিষ্কার করিয়াছেন। সাতটি পূর্ণ সুর, চারিটি কোমল সুর, একটি কড়ি সুর,— মোটের উপর বারোটি সুর লইয়াই পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞগণ সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ব্যাপার পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞগণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, অথবা আবিষ্কার করিলেও তাহার ব্যবহার করিতে সমর্থ হন নাই।

কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ এই বারোটি মাত্র সুর আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা আরও দশটি সুর আবিষ্কার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজ একটি সুরের কোমল পর্দ্দা বাহির করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু প্রাচ্য সমাজ সেই সুরের অতি কোমল প্রভৃতি পর্দ্দা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সঙ্গীতে সেই সকল পর্দ্দা প্রয়োগ করিয়াছেন। সঙ্গীতে এইরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্দ্দাসকল আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রাচ্যসঙ্গীত কষ্টলব্ধ বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, তন্ময় হইয়া সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইত। উহা আমীরের এবং ফকীরের আলোচ্য বিদ্যা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত। সঙ্গীতের আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে হইত। এখন আমরা বিলাসপ্রিয় অথচ পরিশ্রম বিমুখ হইয়াছি। সঙ্গীত বিদ্যা সন্ন্যাসীর আলোচ্য হইলেও উহা সকলেরই উপভোগ্য। যখন উহা সকলের উপভোগ্য, তখন উহা বিলাসীর বিলাস কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যবহার্য্য কেন না হইবে? সুতরাং সাধনা না করিয়াই আমরা সঙ্গীত বিদ্যায় সিদ্ধ হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। আমাদের এই আগ্রহ চরিতার্থ করিবার উপযোগী উপকরণও পাইয়াছি। সে উপকরণ—বিলাতী বাদ্যযন্ত্র "হারমোনিয়ম।"

পূর্ব্বে যিনি সঙ্গীতবিদ্যা আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেন, তিনি তানপুরা, বেহালা, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসমূহের সাহায্যে কণ্ঠস্বরের উন্নতি সাধনে যত্ন করিতেন। ঐ সকল বাদ্যযন্ত্রে সুর বাঁধা থাকে না, সুর বাঁধিয়া লইতে হয়। সুর বাঁধিতে হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিশেষ শক্তির প্রয়োজন। সুরে সামান্য ত্রুটী থাকিলে তাহা এক মাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংশোধন করিয়া লইতে হয়। যাহার শ্রুতিশক্তির সম্যক পরিণতি হয় নাই, বিশেষ সাধনা করিয়া যাহারা সে শক্তির সম্যক পূর্ণতালাভ করে নাই, তাহারা সঙ্গীতবিদ্যা আলোচনার অধিকারী নহে। প্রথমে সুরের সহিত সুর মিলাইতে হয়, তাহার পর সেই সুরের সহিত কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গান শিক্ষা করিতে হয়। ইহা দুই এক দিনে হয় না, বিনা গুরূপদেশে হয় না।

কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন যেরূপ বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপশ্চারণ করিতে হয় না, শার্ট কোট আঁটিয়া, এসেন্স মাখিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে উচ্চশিক্ষার চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারা যায়, সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষার জন্যও সেইরূপ আর নীরস কঠিন দ্রব্য ভোজন, দিবারাত্রি তন্ময় হইয়া চর্চ্চা প্রভৃতি করিতে হয় না। কুড়ি পঁচিশ টাকা দিয়া একটা হারমোনিয়ম কিনিতে পারিলেই সঙ্গীতবিদ্যা সম্যক আরম্ভ করিতে পারা যায়, দেবী বীণাপাণিকে একেবারে দ্বারে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায়। হারমোনিয়মের একটা চাবি টিপিলেই একটা বাঁধা সুর বাহির হয়, আর কষ্ট করিয়া বেহালা তানপুরার কর্ণমর্দ্দন করিতে হয় না। সঙ্গীত বিদ্যাকে আমরা এমনই সহজসাধ্য করিয়া ফেলিয়াছি।

প্রাচীন আর্য্য সঙ্গীতের সহিত মুসলমানদিগের সঙ্গীত বিদ্যার সম্মিলনে ভারতে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা জগতে অতুলনীয়। সে সঙ্গীত আয়ত্ত করা তো দূরের কথা, বিশেষ চর্চ্চা না করিলে তাহা

সম্যকরূপে উপভোগ করিবার শক্তিও উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন যেমন গীতার শত শত সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে সকলেই গীতা ব্যাখ্যা করে, সকলেরই পকেটে পকেটে গীতার আবির্ভাব হইয়াছে, সেইরূপ সুলভ মূল্যের হারমোনিয়ম আমদানি হওয়াতে দেশে আর গায়কের অভাব নাই। সকলেই এখন গীতা পাঠ করিয়া পরমহংস, সকলেই হারমোনিয়ম কিনিয়া তানসেন।

হারমোনিয়মের বাইশটির অধিক পর্দা না থাকাতে, যাহারা হারমোনিয়মের সাহায্যে কণ্ঠস্বরের উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের কণ্ঠ হইতে বাইশটি পর্দা বাহির হয় না। তানপুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য ও গুরূপদেশ ব্যতীত ঐ সকল পর্দা কণ্ঠ হইতে বাহির করা অসম্ভব। অর্থাৎ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদগণ কণ্ঠস্বরের যেরূপ উন্নতি করিতে পারিতেন, যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন পর্দাগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেখাইতে পারিতেন—এখনকার হারমোনিয়ম-মাত্র সহায় গায়কদিগের কণ্ঠ হইতে সেরূপ বাহির হয় না। সেইজন্য নিতান্ত সুকণ্ঠ গায়ক না হইলে কেহই হারমোনিয়ম অথবা অন্য কোনরূপ বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সঙ্গীতে শ্রোতাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।

বাদ্যযন্ত্রের সুর কণ্ঠস্বরের অনুসরণ করে; কিন্তু হারমোনিয়মের আমদানি হইবার পর হইতে কণ্ঠস্বর হারমোনিয়মের সুরের অনুসরণ করিতেছে। যে সকল বাদ্যযন্ত্রের সুর বাঁধিয়া লইতে হয়, তাহা অবস্থানুসারে যে কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের সহিত মিলাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়। সেকালে—হারমোনিয়ম আমদানি হইবার পূর্ব্বে—বহু ব্যক্তি একত্র কণ্ঠস্বর মিলাইয়া যে গান করিত না তাহা নহে। তাহারা তানপুরা বা বেহালার সহিত কণ্ঠস্বর মিলাইয়া লইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বেহালা বা তানপুরার সুর বাঁধিয়া লইতে হয়; যে কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়, বিনা সাধনায় সে শিক্ষা হয় না।

আমরা হারমোনিয়মের নিন্দা করিতেছি না। হারমোনিয়মের সুর অতি সুমধুর। সুদক্ষ বাদকের হস্তে হারমোনিয়ম হইতে যেন কিন্নরীর কণ্ঠস্বর নির্গত হয়, সে সঙ্গীতে মন মোহিত হয়, হৃদয় অবশ হয়। যিনি হারমোনিয়ম যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি যে সঙ্গীত-বিজ্ঞানে অদ্ভুত অধিকারলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এখন জনসাধারণের সহজ-সাধ্য হওয়াতে আমরা আর কঠোর শ্রমসাধ্য সঙ্গীতচর্চায় মনোনিবেশ করি না। তাই আমাদের সেই প্রাচীন কীর্ত্তি সঙ্গীতবিদ্যার বিলোপ সাধনে অগ্রসর হইতেছি!

হারমোনিয়ম ব্যবহার সকলের পক্ষে সহজ; সকলেই চেষ্টা করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হারমোনিয়মের দুই একটা গান বাজাইতে পারেন। কিন্তু সহজ লভ্য গান ও প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যদিগের কষ্টলব্ধ গানের মধ্যে কত প্রভেদ! কানেড়া প্রভৃতি কয়েকটি রাগিণীতে যে সকল পর্দ্দা ব্যবহৃত হয়, তাহার সকলগুলি হারমোনিয়মে নাই; সুতরাং হারমোনিয়মে কানেড়া প্রভৃতি রাগিণী সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বাহির হয় না। যাহারা হারমোনিয়মের সহিত কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গান শিক্ষা করে তাহারা ঐ সকল রাগিণী সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে না—এ কথা বলাই বাহুল্য।

অধুনা আমাদের দেশে সঙ্গীতের যেরূপ অবনতি হইয়াছে, বোধ হয় কোন সভ্যদেশে কখনও সেরূপ হয় নাই। অধিক কথা কি, এখন সঙ্গীত আমাদের সমাজে এত হেয় হইয়াছে যে, গুরুজনের সম্মুখে গান করা অশিষ্টতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে সঙ্গীত বিদ্যাকে জ্ঞানের সমতুল্য বলিয়া প্রাচীন ঋষিরা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিবার জন্য সরস্বতীর হস্তে বীণা ও পদতলে পুস্তক স্থাপন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, সেই সঙ্গীত আমাদের

বঙ্গদেশে অনাদৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভদ্র সমাজে সঙ্গীতের সমাদর হ্রাস পাওয়াতে যাঁহারা প্রকৃত সঙ্গীতাচার্য্য, যাঁহারা সঙ্গীত চর্চ্চায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, সঙ্গীতকেই যাঁহারা একমাত্র উপজীব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও অবনতি ঘটিয়াছে, তাঁহারাও এখন আর সমাজে পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর প্রাপ্ত হন না।

কিন্তু ইয়োরোপে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। ভদ্রলোকের পুত্র কন্যারা সঙ্গীত বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারিলে সমাজে নিন্দিত হন; সঙ্গীতজ্ঞ অধ্যাপকগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতির অধ্যাপকগণের অপেক্ষা অল্প সম্মান প্রাপ্ত হন না বরং অধিকাংশ স্থলে সমধিক সমাদরই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বাধীন নৃপতিরা গায়ক গায়িকাদিগকে নানাপ্রকার উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়া তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি করেন। ভারতবর্ষেও রাজান্তঃপুর-বাসিনীরা যত্ন সহকারে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। মুসলমান বাদশাহদিগের পুরললনারাও সঙ্গীত শিক্ষায় বিশেষ চেষ্টা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এখন ভদ্রলোকের কন্যাদের কথা দূরে থাকুক, পুত্রেরাও সঙ্গীতালোচনা করা অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। পরিশ্রম-লব্ধ সঙ্গীতের বিকৃতি সহজ-লভ্য হওয়াতেই আমাদের সমাজে সঙ্গীতের অনাদর হইয়াছে। সঙ্গীতবিদ্যার নকল ও বিকৃতি এখন হার-মোনিয়মের কল্যাণে সকলেরই অনায়াসলভ্য হইয়াছে বলিয়া উচ্চ-অঙ্গের সঙ্গীতেরও অনাদর হইতেছে, ভদ্রসমাজে উহার সমাদর হ্রাস পাইতেছে। ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা নহে।

প্রেম-রহস্য।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত।)

হরনাথ ঘোষ কলিকাতার একজন গৃহস্থ ব্যক্তি। তিনি গবর্মেণ্ট আফিসে চাকুরি করিতেন, এক্ষণে পেন্‌সন্ লইয়া বাটী বসিয়া আছেন। পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ পিতার আয়াস কিংবা অনায়াসোপার্জ্জিত অর্থে দিব্য বাবুয়ানী করিয়া বেড়ায়, যেহেতু, তাহাকে "বাজারের" খবর লইতে হয় না। দুই একবার "প্রবেশিকা" পরীক্ষা দিতে চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষক মহাশয় ইন্দুর মেধাশক্তি না বুঝিয়াই হৌক্ অথবা খলতাবশতঃই হৌক্ তাহাকে প্রবেশিকা সাগর পারে যাইতে দিতে কিছুতেই, স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং ক্রোধান্ধ হইয়া ইন্দুভূষণ একেবারে মা সরস্বতীর সহিত ফারখত করিয়া দিল।

ইন্দুভূষণের বয়স ১৯।২০ কিংবা দুই এক বৎসর এদিক ওদিক হইবে। চেহারা খানি মন্দ নহে; তাহার উপর সাজগোজের বেশ পারিপাট্য আছে। মস্তকে সভ্যনব্য সম্প্রদায়মনোরঞ্জিনী শিখর-দেশোৎপন্না অধোগামিনী "তেড়ী", সর্ব্বদাই অঙ্গে সুচারু "গিলে করা" পাঞ্জাবী আস্তীন জামা, তদুপরি সিল্কের একখানি রঙ্গিন চাদর শোভমান; পরিধানে দেশী ধুতি, পায়ে লপেটা জুত, পকেটে সৌগন্ধযুক্ত সুন্দর সিল্কের রুমাল। অতএব রাজধানী কলিকাতা সহরে ইন্দুভূষণ একজন বাবু কি না?

হরনাথ বাবু যথাসময় পুত্রের বিবাহ দিয়া সুন্দরী পুত্রবধূ ঘরে আনয়নপূর্ব্বক পিতৃকর্ত্তব্যের কোন ত্রুটী করেন নাই। মা সরস্বতীকে বিদায় দান করিয়া ইন্দুভূষণ কিছুদিন অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ

করিয়াছিল। কিন্তু তাহা কেমন ভাল লাগিল না বলিয়া বোধ হয় ইন্দু তাহা হইতে বিরত হইল। হরনাথ বাবু পুত্রকে এ বিষয়ে বড় পিড়াপীড়ি করিতেন না। বোধ হয় ভদ্রলোক ভাবিতেন, "যত দিন আমি আছি, যা করে করুক, পরে বুঝ্তে পারবে।" দৈনিককার্য্যের মধ্যে ইন্দুভূষণের এই ছিল যে কোন বন্ধুর বাড়ী বসিয়া তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদি ক্রীড়া করা এবং যথা সময়ে বাটীতে আসিয়া আহারাদি করা। গীতবাদ্যেও একটু ঝোঁক ছিল, সেই জন্ম দেখা যাইত যে, কখন কখন বাটীতে বসিয়া একটী ছোট হারমোনিয়ম লইয়া বাদ্যাভ্যাস করিতেছে, কিম্বা গুন্‌গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিতেছে। আর একটী প্রধান সখ ইন্দুর বরাবরই ছিল,—প্রায়ই থিয়েটার দেখিতে যাওয়া। মাতার নিকট হইতে দুই একটাকা হাত খরচ হিসাবে যাহা প্রাপ্ত হইত তাহাতেই পান, সিগারেট, এসেন্স ইত্যাদি ক্রয় করিয়া—থিয়েটার অভিনয় দর্শন করিয়া—তাহার সদ্ব্যবহার করিত। ইন্দুভূষণ অনেক দিন হইতে থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে যাওয়া-আসা করে। এক দিন দেখিল থিয়েটারের কোন এক অভিনেত্রী কোন এক ভূমিকায় অতি সুন্দর অভিনয় করিতেছে। তাহার অভিনয়ে দর্শক-মহলে একেবারে অত্যন্ত "বাহবা" পড়িয়া গিয়াছে। ইন্দুও মনে মনে অভিনেত্রীটীকে খুব প্রশংসা করিল। পূর্ব্বে মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখিতে যাইত, এখন হইতে ইন্দুভূষণ প্রতিসপ্তাহে দুইবার করিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। যতই তাহার অভিনয় দেখে, ততই যেন ইন্দুর উত্তরোত্তর ভাল বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে ইন্দু সেই সুখ্যাতির স্রোত অভিনয় হইতে আরম্ভ করিয়া সেই রমণীর পার্থিব দেহযষ্টির উপর দিয়া প্রবাহিত করাইয়া দিল। তাহার সেই সফেদা-আলতাদির সংমিশ্রণে রঞ্জিত বদন ফুটলাইটু বিদ্যুতালোকে ইন্দুর নয়নে যেন প্রস্ফুটিত গোলাপকুসুমবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সুন্দরী নামালাকে

সজ্জীভূতা হইয়া, মনোমুগ্ধকর বিবিধ রঙ্গে ভঙ্গে নিজ ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে নিশাজাগরণ হেতু কোটর-প্রবিষ্ট কজ্জলাঙ্কিত নয়নে বেচারা দর্শকবৃন্দের প্রতি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ-শর হানিতেছে, সুতরাং সেই শর একটা ঠিক্‌রাইয়া ইন্দুভূষণের একেবারে মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাকে জখম করিয়া ফেলিল। ইন্দুভূষণ ভাবিতে লাগিল, "কে এ? অপ্সরী---কিন্নরী—না বিদ্যাধরী।" কেহ কিছু মনে করিবেন না, ইন্দুভূষণ মনে মনে সেই বিদ্যাধরীর প্রেমাশক্ত হইয়াছে।

তারপর? তারপর আর কি? প্রেমে পড়িলে প্রেমিকের যাহা হয়, ক্রমশঃ পূর্ণমাত্রায় ধরিয়া ইন্দুর সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল। কেবল সেই মুখখানির চিন্তা। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, ভ্রমণে, আলাপে, বিলাপে, প্রলাপে, হাটে, মাঠে, ঘাটে সেই মনোমোহিনীর ধ্যান। রূপসীর কলকণ্ঠে সেই মধুর সঙ্গীতধ্বনি ইন্দুর কর্ণকুহরে যেন পলে পলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইন্দু কেবল শনিবার এবং রবিবারের প্রতীক্ষা করে এবং মাতার নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের উপায় নিরূপণ করে। অভিনয় ভঙ্গের পর অন্যান্য দর্শকবৃন্দ যে যাহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলে ইন্দুভূষণ একটা প্রজ্বলিত সিগারেট মুখে করিয়া সেই গভীর রাত্রিতে থিয়েটারের ফটকের সম্মুখে হতাশ অন্তরে দাঁড়াইয়া থাকে, এবং অভিনেত্রী সুন্দরীগণের বোঝাই লইয়া যখন থিয়েটার-সম্প্রদায়-রক্ষিত অশ্বযান "ডেলিভারি" দিবার জন্য নাট্যমন্দির হইতে ইন্দুর সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়, তখন ধীরে ধীরে গৃহে আসিয়া উদাসপ্রাণে নিদ্রামগ্না অপ্রেমিকা পত্নীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া ইন্দু অবশিষ্ট রজনীটুকুও একপ্রকার অনিদ্রায় যাপন করে। মহামুস্কিল! এ প্রেমের কথা কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিবার উপায় নাই। অথচ এই অসহ্য প্রেমদাবানল তাহার হৃদয়াকাশ

একেবারে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে। ইন্দু ভাবিল "কি উপায়ে এই প্রেমনাটকের মিলনাঙ্কে উপনীত হইতে পারি।"

"যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" পণ্ডিতদিগের এই উক্তিটীর সম্পূর্ণ সার্থকতা না থাকিলেও কতক পরিমাণে নিশ্চয়ই আছে। প্রতি সপ্তাহে এইরূপ অভিনয় দেখিতে গিয়া, প্রতিদিন বৈকালে সন্ধ্যার সময় সেই রঙ্গালয়ের সম্মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া ইন্দুভূষণ উক্ত থিয়েটার সংক্রান্ত জন কয়েক মহাপুরুষদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া ফেলিল। এই সকল মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দুটী একটী ক্ষুদ্র "ভূমিকায়" অভিনয় করে; কেহ কেহ দর্শকবৃন্দের চৌকিদারের কর্ম্ম করে এবং কেহ বা ঐক্যতান বাদকদিগের দলে বসিয়া বেহালার ছড়ি লইয়া নাড়াচাড়া করে। থিয়েটার সংশ্লিষ্ট লোক বলিয়া প্রত্যেক অভিনেত্রীর সহিত তাহাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে, যখন তখন তাহাদের বাটীতে অবাধে বেশ গতিবিধি আছে। যাহা হউক এই সকল মহাশয় ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ হওয়াতে ইন্দু জ্ঞাত হইল যে কলিকাতা নিবাসী অধরচন্দ্র বসু নামধেয় কোন এক মহাপ্রভু অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগে পিতার বহু কষ্টসঞ্চিত অর্থরাশি করতলগত করিয়া ইন্দুর প্রণয়পাত্রী সেই অভিনেত্রী সুন্দরীর গ্রাসাচ্ছাদনাদি সমস্ত ব্যয়ভার স্বীয় মস্তকোপরি গ্রহণ করিয়া ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিতেছে। সুন্দরীর নাম ডালিমকুমারী; তিনিও এক্ষণে "কাপ্তেন বাবু" অধরচন্দ্রের আর্থিক প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ইহলোকের স্বধর্ম্ম পালন করিতেছেন। ইন্দুভূষণ বুঝিল, তাহার মিলনের পথ বড় সরল নহে, বরং বহু কণ্টকাকীর্ণ। তাহার নবপরিচিত থিয়েটারের বন্ধুগুলি অধরচন্দ্রের দোহাই দিয়া ডালিম কুমারীর বাটীতে গিয়া প্রায়ই আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে এবং অধরের পরলোকগত পিতাঠাকুরের অনাহার সঞ্চিত অর্থে সুরা

দেবীর সেবা করিয়া এবং চপ কাটলেটাদি নানাপ্রকার উপাদেয় সুখাদ্য আস্বাদন করিয়া আপনাদের মনুষ্যজীবন ধন্য করে। ইন্দুভূষণ ঐ দলভুক্ত হওয়াতে অতি অল্পদিনেই অধরচন্দ্রের সহিত অত্যন্ত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ফেলিল এবং আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই অধরচন্দ্রের লাঙ্গুল ধরিয়া ডালিমকুমারীর বাসস্থানরূপ স্বর্গধামে ত্বরায় উপনীত হইল।

এতদিনে ইন্দুর হৃদয়ের নিদারুণ উদ্বেগানলোত্তাপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। প্রেমিকপ্রবর ইন্দুভূষণ এক্ষণে আপনার চক্ষের সম্মুখে ডালিম কুমারীর সেই মনোমোহিনী মূর্ত্তিখানি যেরূপই লোচনানন্দদায়িনী দেখুক না কেন, অপ্রেমিক বিশ্বনিন্দুক লোকেরা কিন্তু বলিয়া থাকে সেই অভিনেত্রী অভিনয় অন্তে সাজসজ্জা পরিত্যাগ করণান্তর কৃত্রিম গোলাপীবর্ণ বিধৌত করিয়া যখন নিজ বসন পরিধানে নিদ্রা-প্রদত্ত স্বরূপ প্রকাশিত করে তখন তাহা ভয়াবহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, অধরচন্দ্র ইন্দুকে ডালিমকুমারীর সহিত আলাপ করাইয়া দিয়া আপন উদারচিত্তের পরিচয় প্রদান করিল। ইন্দুর কতক আশা ফলবতী হইল। দুই চারিদিন পরেই ডালিমবিবির সহিত ইন্দুর বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া উঠিল। কিন্তু "শিশিরে কি কোটে ফুল বিনা বরিষণে?" পিপাসার্ত্ত ইন্দু দেখিল তাহার সম্মুখে শীতল জল, কিন্তু তাহা স্পর্শ করিবার কোন অধিকার নাই। ইন্দু একখানি পুস্তকে পড়িয়াছিল 'সার ফিলিপ সিডনী' নামে কোন এক যুদ্ধের সেনাপতি যুদ্ধকালে ভয়ঙ্কর আহত হইয়া এবং শিবির আনীত হইয়া অত্যন্ত পিপাসিত হইলে তাহার অনুচরেরা তাহাকে পিপাসা নিবারণের জন্য একপাত্র শীতল জল তাঁহার হস্তে প্রদান করে। সিডনী যেমন বারিপান করিতে যাইবেন অমনি দেখিলেন যে তাঁহার শিবিরস্থিত আর একজন আহত সৈনিক ভয়ঙ্কর তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অনিমেষলোচনে

তাঁহার হস্তস্থিত পানিপাত্রের প্রতি চাহিয়া আছে। মহাত্মা সিডনী বিন্দুমাত্র পান না করিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই জলপাত্রটী সেই সৈনিককে দিয়া বলিলেন, "আমার অপেক্ষা ইহা তোমার অধিক আবশ্যক।" ইন্দু ভাবিল, "হায়! অধরচন্দ্র যদি বীরপুরুষ সিডনীর মতন মহানুভব হইত।"

যাহা হউক ইন্দুভূষণের প্রেমপিপাসা নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং "হবিষাকৃষ্ণবর্ত্মেব" উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোন উপায় নাই। অধরের পিতার ন্যায় তাহার পিতার সেরূপ সঞ্চিত অর্থরাশি নাই অথবা থাকিলেও ইন্দুভূষণের অদৃষ্টদোষে নির্ব্বুদ্ধি জনক মহাশয় এখনও সশরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সে যাহা হউক ইন্দুকে এক্ষণে আর অধরের ছায়া ধরিয়া তাহার রাসমন্দিরে যাইতে হয় না। এক্ষণে ডালিমের অতি আপনার লোকের ন্যায় ইন্দু যখন তখন তাহার বাটীতে যাওয়া আসা করে। অধরচন্দ্র সেখানে থাকুক অথবা নাই থাকুক, ইন্দু প্রায় সমস্ত দিন সেখানে বিদ্যমান। প্রাতে ৭টার সময় যায় আবার পৈতৃক হোটেলে অর্থাৎ নিজ বাটীতে বেলা ১১।১২টার সময় আসিয়া তাড়াতাড়ি দুটী অন্ন উদরে নিক্ষেপ করতঃ অর্দ্ধঘণ্টা পরেই সেখানে উপস্থিত হয়। আবার ৪।৫টার সময় বাড়ী আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পিতামাতাকে কৃতার্থ করিয়া অল্পক্ষণ পরেই গন্তব্য স্থানে গমন করে। ইন্দুভূষণ প্রেমের খাতিরে ডালিমের অনেক গৃহকার্য্য সম্পন্ন করে, আবশ্যক হইলে বাজার হইতে দুই একটা জিনিস পত্রও কিনিয়া আনে—কখন বা হারমোনিয়ম বাজাইয়া—কখন বা দুই একটা বিরহ সঙ্গীত গাহিয়া ডালিমের মন রাখিতে চেষ্টা করে। যখন অন্য কিছু কাজ কর্ম্ম না থাকে তখন ডালিমের মুখের প্রতি হতাশ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে। ডালিমকুমারী প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে থিয়েটারে রিহার্স্যাল দিতে

চলিয়া যায় এবং রাত্রি ১১।১২টার সময় ফিরিয়া আসে। ততক্ষণ ইন্দুভূষণ অধরচন্দ্র এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গের সহিত সেই শূন্যগৃহে বসিয়া শূন্যপ্রাণে কোনও প্রকারে সে সময়টুকু অতিবাহিত করে; থিয়েটারের দিন থিয়েটার দেখিতে যায় এবং আবার থিয়েটারের শেষে গভীর রাত্রে ডালিমের গৃহে আসিয়া কিছুক্ষণ "প্রেমের জাবর" কাটিয়া প্রায় রাত্রি শেষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই প্রেমকূপে নিমজ্জিত হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত অপ্রেমিক বন্ধুবর্গের সহিত ইন্দুভূষণ বেড়াইত, এক্ষণে তাহারা কেহই তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পায় না। অনেকে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করিয়া থাকে। যাহা হউক ইন্দুর এই প্রেম-রহস্য তাহাদিগের মধ্যে ক্রমেই প্রচার হইয়া পড়িল। দৈবাৎ পথে যাইতে যাইতে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইন্দু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইত। সুতরাং তাহার নিকট পূর্ব্ববন্ধুদিগের আর কোন মর্য্যাদা রহিল না। ইন্দুভূষণের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ইন্দুর পিতামাতা (বোধ হয় কোনরূপ সন্দেহ করিয়া) এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি সমস্ত দিন প্রত্যহ কোথায় থাক, বাড়ী আসিতে এত রাত্রি হয় কেন?" ইন্দু তাহাদিগকে বেশ "জলবৎ তরলং", বুঝাইয়া দিল যে তাহার কোন ধনবান পুত্রের সহিত অত্যন্ত বন্ধুত্ব হইয়াছে; তিনি তাহাকে অতি শীঘ্রই একটা দুই চারি শত টাকা বেতনের চাকুরী করিয়া দিবেন; তাই তাহার বাটীতে যায়। পিতা হরনাথ বাবু (নিরীহ ভাল মানুষ) কি বুঝিলেন বলিতে পারি না; তিনি এ বিষয়ে পুত্রকে আর কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু ইন্দুর মাতা ইন্দুকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিত, "হাঁ বাবা, চাকুরির কতদূর কি হলো?" ইন্দুও অম্লানবদনে উত্তর করিত "আর অধিক বিলম্ব নাই।" প্রায় অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কর্ত্তৃপক্ষদিগের দোষেই তাঁহাদের বালকেরা অধোগমনে গিয়া থাকে।

তাঁহারা যদি বরাবর পুত্রের প্রতি গোপনে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখিয়া যান, তাহা হইলে অনেক সুফল ফলিতে পারে। বালকদিগের সুচরিত্র সম্বন্ধে মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ রাখিয়া, তাহাদের বাহ্যিক সারল্য-ভাবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাহাদিগের চালচলন এবং সমস্ত কার্য্যাকার্য্যের উপর তিলমাত্র সন্দিগ্ধচিত্তে দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিলে অনেক কর্ত্তৃপক্ষকে অতি অল্প দিন পরেই পুত্রের অধোগমনের জন্য অনুশোচনা করিতে হয়। থিয়েটার দেখা বন্ধুবাটী নিমন্ত্রণ যাওয়া, সান্ধ্য সমীরণ সেবন উপলক্ষ্য করিয়া দিনা সাজগোজে কত বালক তাহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বাটীর বাহির হইয়া কত কীর্ত্তি করিয়া বেড়ায়, তাহা কয় জন কর্ত্তৃপক্ষ সন্ধান লইয়া থাকেন। যাহা হউক ইন্দুভূষণ পিতামাতার কুসন্দেহের বাহিরে থাকিয়া নিশ্চিন্তে প্রেমের ধ্বজা স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক ডালিমকুমারীর বাটী গমনাগমন করিয়া থাকে। ডালিমবিবি, অধরচন্দ্র এবং অন্যান্য অনুচরবর্গও ইন্দুর এই ঐকান্তিক প্রেমাসক্তির বিষয় অনেক দিন বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে এ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিত না। এক দিবস ইন্দু দারুণ মনোবেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া ডালিমকুমারীকে নির্জ্জনে পাইয়া নিজমুখে তাহার হৃদয়ের অসহ্য যাতনার কথা সমস্ত প্রকাশ করিয়া ফেলিল। রোগীর মুখে এইরূপ রোগব্যক্ত হইতে দেখিয়া ডালিমকুমারী মনে মনে খুব হাসিল এবং ভাবিল, "এই সুযোগে ফাঁকি দিয়া যদি কিছু আদায় হয়ত মন্দ কি?" সেও দুটী একটী হাব ভাব দেখাইয়া ইন্দুকে ঠিক বুঝাইয়া দিল যে সেও ইন্দুর প্রেমসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। যেমন ইন্দু বুঝিল যে সে প্রেমের প্রতিদান পাইয়াছে, অমনি তাহার মনে হইল যেন সে শূন্যে ভর করিয়া হুহু শব্দে স্বর্গে উঠিয়া যাইতেছে।

সেই দিন হইতে দুপুর বেলা (কারণ সে সময় অধরচন্দ্র কিংবা

তাহার অনুচরবর্গ কেহই সেখানে থাকে না।) ডালিমকুমারীকে নির্জ্জনে পাইয়া ইন্দুভূষণ প্রেমের কত কথাই কহিত। ডালিমাকে হৃদয়ের ব্যথা বুঝাইতে কত চেষ্টা করিত! কখন বা অতল ভাবসাগরে নিমজ্জিত হইয়া দুই এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেও ত্রুটী করিত না। ডালিমকুমারী রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী। সে ইন্দুর নিকট হইতে মাপিয়া তিন হস্ত পরিমিত দূরে বসিয়া তাহার প্রেমালাপ শুনিত। কখন কখন শুনিতে শুনিতে মনে মনে বিরক্ত হইয়া আপন শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি জাগরণজনিত ক্লেশক্লান্তি দূর করিবার জন্য নিদ্রা-দেবীর শরণাপন্না হইত।

এক দিন ইন্দুর সহিত বাহ্যিক প্রেম প্রসঙ্গ-ক্রমে ডালিম বলিল, "দেখ ভাই! আমার গোটা পঞ্চাশ টাকার বড় আবশ্যক হইয়াছে। যদি আমাকে চুপি চুপি যোগাড় করিয়া দিতে পার তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়, নয়তো আমি বড় বিপদে পড়িব।" ইহা শুনিয়া ইন্দুর চক্ষু স্থির! একেবারে মুখখানি শুকাইয়া গেল। পঞ্চাশ টাকা! ইন্দু কোথায় পাইবে? আগে বরং মাতার নিকট হইতে ৫।৭ টাকা চাহিলে পাইত, কিন্তু ইদানীং কি জানি কেন তাহার মাতা এক আধ টাকা দিতেও অনেক ওজর আপত্তি করেন। ইন্দু ভাবিল, "হায়! আমার এত সাধের প্রেমের লতা অর্দ্ধশত রৌপ্য চক্ররূপ তীক্ষ্ণ-ধার কালচক্রে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল!" বেচারা কি করে। অবশেষে বলিল, অতি শীঘ্রই সংগ্রহ করিয়া দিবে। কুক্ষণে ইন্দু সে দিন ডালিমের সহিত প্রেমালাপ করিতে বসিয়াছিল। হৃদয়ের গহবর প্রজ্বলিত প্রেমানল হইতে অকস্মাৎ ধূম নির্গত হইয়া ইন্দুকে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখাইতে লাগিল। তাহার বহু দিন রোপিত প্রেমবীজ, প্রায় অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, দুষ্ট বিধাতা কি নিদারুণ বাধাই সাধিল! যাহা হউক "আজ দিব" "কাল দিব" করিয়া ইন্দু তত্রাচ প্রত্যহ নিয়মিতকালে

ডালিমকুমারীর শ্রীমুখপঙ্কজ দেখিতে যাইত। কিন্তু সেরূপ প্রেমালাপ করিতে আর ভরসা হইত না। ডালিমবিবি ইন্দুকে প্রত্যহই টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিত। এক একবার ইন্দু ভাবিত, "দূর হোক আর আসিব না।" কিন্তু সেই মুখখানি মনে পড়িলে ইন্দু আর মনোবেগ সম্বরণ করিতে পারিত না। কাজেই প্রাণের দায়ে শ্রীমন্দিরে ছুটিত।

এইতো আমাদের ইন্দুভূষণের আর্থিক—সাংসারিক—দৈনিক ও প্রাণয়িক অবস্থা। আহা বেচারার "ধাইতে অমৃতপানে বুকে বজ্র বিঁধিল!" অতীব মনোকষ্টে দিন যায়; কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। ইন্দুর এক্ষণে "মারীচের" দশা উপস্থিত। ডালিমকুমারীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার লীলামন্দিরে বাতায়ত বন্ধ করিতে চাহিলে, রামচন্দ্রের তীক্ষ্ণশরাসনরূপ বিচ্ছেদের নিদারুণ শরাঘাতে প্রাণধারণ দুষ্কর, অথচ ডালিমের সঙ্গে পূর্ব্বঘনিষ্ঠতা বজায় রাখিতে হইলেও, দশাননের শররূপ ডালিমকুমারীকর্তৃক অর্দ্ধশতমুদ্রার ঘনঘন তাগাদার তীব্র তাড়নায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম। ইন্দুর আসন্ন-যৌবনা অপ্রেমিকা পত্নী ক্ষীরোদবালা স্বামীর অকস্মাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন দর্শনে মনে মনে কেমন একটু ভীতা হইয়াছিল। প্রায় মাসাবধি দেখিতেছিল, যে সমস্ত দিন স্বামী বাড়ী থাকে না; রাত্রে "এই আসে এই আসে"—করিয়া প্রায় দুই তিন প্রহর অতীত হইয়া যায়, তথাপিও অভাগিনী স্বামীর দর্শন পায় না। কারণ, ইন্দুভূষণ, অধিকাংশ দিনই, রজনীর প্রায় সাড়ে তিন প্রহর অতিবাহিত করিয়া, অতি গোপনে তস্করের ন্যায় বাটীতে আগমন করে। অবশ্য, এ ক্ষেত্রে তাহার বাটীর চাকরটী প্রধান সহায়। ইন্দুর বিস্তর কাকুতি মিনতিতে ভৃত্যটী দয়াপরবশ হইয়া চুপি চুপি রাত্রে প্রেমিকপ্রবর "দাদাবাবুকে" দ্বার খুলিয়া খিড়কিবাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইত, এবং মলিন হস্তপাদ

বাবু অথবা গৃহিণী এ সম্বন্ধে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদিগকে ইন্দুভূষণ সম্বন্ধে বেশ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিত।

ইন্দুভূষণ অত রাত্রেও বাটী আসিয়া দেখিত, পত্নী ক্ষীরোদবালা তখনও জাগ্রতা! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সেতো আর প্রেম জানেনা! সে যদি অমনি দুটো দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া—অতিশয় মিহিকণ্ঠে ইন্দুর মুখপানে চাহিয়া গাহিত—"আমি সারা নিশি তোমারি লাগিয়া, রহিব বিরহ-শয়নে জাগিয়া.—তুমি নিমিষের তরে প্রভাতে আসিয়া, মুখপানে চেয়ে হাঁসিও!" ব্যস্—তাহা হইলে আর কিছু দেখিতে হইত না! হায় ডালিমকুমারী!

ইন্দু প্রেমের বোঝা মাথায় লইয়া বাটী আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িত: ক্ষীরোদবালার সহিত ভদ্রতাব অনুরোধে দুটো একটা কথাও যে না কহিত—একথা বলিলে মহাপাপ হইবে। ক্ষীরোদবালা বুঝিত যে শ্বশুর শ্বাশুড়ী যদি জানিতে পারেন যে ইন্দু প্রত্যহ অত রাত্রি করিয়া বাটী আসে—তাহা হইলে ইন্দুকে অত্যন্ত তিরস্কার করিবেন। সেটা ক্ষীরোদা সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে মিথ্যাকথা বলিত যে ইন্দুভূষণ, —তাঁহারা শয়ন করিবার ঠিক পরেই আসিয়া শয়ন করে। অপ্রেমিকা বালা বোধ হয় ভাবিত—"আমার যা' পাপ হয় হোক্ —তবু স্বামীকে অসন্তুষ্ট করিব না।" ইন্দুভূষণ পত্নীর ঈদৃশ আচরণ বুঝিতে পারিয়া মনে মনে তাহার প্রতি খুব তুষ্ট ছিল! পাঠক হয়তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—ডালিমকুমারীর প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ইন্দুভূষণ ক্ষীরোদবালাকে ভালবাসিত কিনা! যথার্থই ভালবাসিত। নাটক-নভেলের ভালবাসা না হৌক্—মেঘদূতকাব্য বর্ণিত প্রেমিকের ভালবাসা না হৌক—১৯১২০ বৎসরের ভদ্রসন্তানের আপন পত্নীর প্রতি যতটা মায়া—মমতা—টান অথবা স্নেহ থাকা আবশ্যক তাহা ইন্দুর যথেষ্ট ছিল। কেবল দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ

ডালিমকুমারীর প্রেম—কালাপানিজাত একটা ঘন কুয়াশার আবরণ, পত্নী ক্ষীরোদবালার প্রতি ইন্দুর ভালবাসার মধ্যস্থলে পড়িয়া গিয়াছে। সে কুয়াশা হঠাৎ একদিনের সংঘটন সূর্য্যালোকে বিদূরিত হইলে—ইন্দুভূষণের ভ্রমান্ধতাও দূরিভূত হইল।

ডালিমকুমারীর জন্ম পঞ্চাশটাকা সংগ্রহ করিতে ইন্দুভূষণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল। দুইএকজন বন্ধুবান্ধবের নিকট ঋণ প্রার্থনা করিয়াছিল,—তাহাতেও কোন ফল দর্শে নাই। নিজের কাছেও এমন কিছু মূল্যবান দ্রব্য নাই—যাহা বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক রাখিয়া সেই টাকাগুলি সংগ্রহ করে। কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারে না—কাজেই ডালিমকুমারীর কাছে মুখ দেখান তাহার ভার হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দুভূষণ প্রত্যহ বিমর্ষভাবে থাকে,—রাত্রে শয্যায় শুইয়া ছটফট্ করে। পত্নী ক্ষীরোদবালা সে সমস্ত লক্ষ্য করে,—কিন্তু স্বামীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারেনা—অথবা তাহার সাহসে কুলাইত না। একদিন ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি কোন অসুখ বিসুখ করেছে?"

ইন্দু বলিল—"না—অসুখ কর্ব্বে কেন?"

ক্ষীরোদা—"তবে তুমি কদিন অমন ধারা কোচ্ছো কেন?"

ইন্দু—"কেন—তা' তোমাকে বোলে কি হবে?"

ক্ষীরোদা—"কি হবে—তা জানি না। তবু শুন্‌তে দোষ আছে কি?"

ইন্দু—"না—দোষ আর কি?"

ক্ষীরোদা—"তবে বল না।"

ইন্দু—"বোল্লে কি কোন উপায় হবে?"

ক্ষীরোদা—"কি আগে শুনি—তাহ'লে বুঝ্‌তে পারবো—নইলে কেমন কোরে বোল্‌বো—উপায় হবে কি না?"

ইন্দুভূষণের মাথায় একটা মতলব জুটিল। ভাবিল—"এত লোকের কাছে তো বলিছি—কোথাও কিছু হোলোনা। এর কাছে দেখিনা—যদি জোগাড় হয়!" এই স্থির করিয়া ইন্দু বেশ কতকগুলি মিথ্যাকথা সাজাইয়া পত্নীকে বুঝাইল যে—সে একজন বন্ধুর একটা সোণার চেন্ একদিন ব্যবহার করিতে চাহিয়া আনিয়াছিল—কিন্তু গ্রহবশে সেটা তাহার নিকট হইতে চুরি গিয়াছে। যাহার চেন্—সে ভয়ঙ্কর তাগাদা করিতেছে; যদি শীঘ্র না দিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে পুলিসে যাইতে হইবে। তাহার দাম পঞ্চাশ টাকা! সেই জন্য ইন্দু বড়ই চিন্তিত—ভীত—ইত্যাদি।

স্বামীকে এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত জানিয়া এবং তজ্জন্য তাহাকে পুলিসে যাইতে হইবে বুঝিয়া—সরলা বালিকার গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হইল; ভয়ে সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সে স্বামীকে বলিল—"তুমি এতদিন এ'কথা আমাকে বলনি কেন?"

ইন্দু—"তুমি ছেলে মানুষ তোমাকে বোলে কি হবে?"

ক্ষীরোদা—"আচ্ছা—সে যদি পঞ্চাশ টাকা পায়—তাহ'লে তোমাকে আর কিছু বোল্‌বে না?"

ইন্দু—"না—তাহ'লে আর সে কেন বোল্‌বে?"

ক্ষীরোদা—"আচ্ছা—আমি তোমাকে এখুনিই দিচ্ছি।"

ইন্দুভূষণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি দেবে? তুমি এত টাকা কোথায় পাবে?"

ক্ষীরোদা—"আমার কাছে প্রায় একশো' টাকার উপোর আছে। আমি জমিয়েছি। আমি যখুনি বাপের বাড়ী থেকে আসি,—মা আমাকে চুপি চুপি, এখানে আমার নিজের খরচ কর্ব্বার জন্যে ১০।১৫৲ টাকা দেয়। তা' আমি আর কি খরচ কর্ব্বো? সে সবই জমা করা আছে—তোমাকে এখুনিই বের কোরে দিচ্ছি।"

এই বলিয়া তাড়াতাড়ী উঠিয়া ক্ষীরোদবালা আপনার বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে সমস্ত টাকাগুলি বাহির করিয়া আনিয়া স্বামীর হস্তে অম্লানবদনে প্রদান করিল। ইন্দু গণিয়া দেখিল—প্রায় দেড়শত-টাকা—নগদ।

ইন্দু বলিল—"এত টাকা নিয়ে আমি কি কোর্ব্বো—আমার পঞ্চাশ টাকায় দরকার!"

ক্ষীরোদা—"তোমায় যা ইচ্ছে—কর—ও টাকা তোমার। তুমি এখুনি তাকে মিটিয়ে দাও গে। এ টাকা সবই সঙ্গে কোরে নিয়ে যাও—যদি সে আরও বেশী চায়।"

ইন্দুভূষণ ৫০৲ খানি টাকা হস্তে করিয়া বাহির বাটীতে আসিল। কিন্তু—একি? যে টাকার জন্য ইন্দুর প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম—সে টাকা সহজ উপায়ে করতলগত করিয়াও ইন্দুর মন এত চঞ্চল হইয়া উঠিল কেন? এই অর্দ্ধশত মুদ্রা ডালিমকুমারীর চরণে ডালি দিলে—সে প্রেমিকা,—ইন্দুভূষণকে প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইবে। কিন্তু—তাড়াতাড়ী ডালিমকুমারীর মন্দিরোদ্দেশে না গিয়া—টাকা লইয়া একাকী নির্জ্জনে বৈঠকখানায় বসিয়া কি ভাবিতেছে?

ইন্দুভূষণ ডালিমকুমারীর প্রেমফাঁদে পড়িলেও একেবারে মনুষ্যত্বহীন হয় নাই। পত্নী ক্ষীরোদবালার এরূপ ব্যবহারে—এতদিন পরে অকস্মাৎ তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইল। এতদিন পরে ইন্দুভূষণ, ক্ষীরোদ বালা ও ডালিমকুমারীর প্রেমের স্বর্গমর্ত্তের পার্থক্য যথেষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। ইন্দু দেখিল—একজন সরলপ্রাণে টাকা দিয়া প্রাণের ভালবাসার যাথার্থ্য কার্য্যে পরিচয় দিতেছে, আর একজন কুটীলহৃদয়ে টাকা চাহিয়া মৌখিক ভালবাসা বিক্রয় করিতে চাহিতেছে। ইন্দু ভাবিল—"একি প্রেম রহস্য!"

আর যাওয়া হইল না। ইন্দু ফিরিল;—ফিরিয়া একেবারে অন্তঃ-

পুরে আপন শয়নগৃহে ক্ষীরোদবালার নিকট উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদ জিজ্ঞাসা করিল—“কি হোলো—সব মিটে গেছে ?”

ইন্দু সাদরে ক্ষীরোদবালার মুখচুম্বন করিয়া বলিল—“হ্যাঁ ! সব মিটে গেছে ! টাকা না দিয়ে অম্নিতেই মিটিয়ে এসেছি !” ক্ষীরোদা বিস্মিত হইয়া বলিল—“বল কি ! কেমন করে মিটলো ?”

ইন্দু—“আমি হারানো জিনিষ আবার খুঁজে পেয়েছি।”

ক্ষীরোদা—(সাহ্লাদে) “আঃ বাঁচলুম—সোণার চেনটা পাওয়া গেল ?”

ইন্দু—“হ্যাঁ সোণার চেনটা পাওয়া গেছে—আর একটা সোণার জিনিষ হারিয়েছিলুম হঠাৎ আজ তাও পেয়ে গেলুম।”

ক্ষীরোদ—“সে কি ?”

ইন্দু—“প্রেমের স্বর্ণপ্রতিমা—তোমাকে !”

এই বলিয়া লজ্জাবতী বালিকাকে ইন্দুভূষণ বাহুপাশে বেষ্টন করিল।

মেহের-উন্-নিসা।

(শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত।)

দশম পরিচ্ছেদ।

(সতীর শক্তি)

জগতে কেউ কাহারও দুঃখ বোঝে না। যুগযুগান্তর হইতে এ হৃদয়-হীনতার অভিনয়-ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। যে পুত্রবতী, সে বন্ধ্যার কষ্ট বোঝে না, যে চক্ষুষ্মান,—সে অন্ধের কষ্ট জানে না, যে

মিলন-মোহিতা, সে বিরহিনীর মর্ম্মভেদী জ্বালা বুঝে না। যে চিরদিন সুখে আছে—সে দুঃখের কষ্ট বুঝে না। স্বার্থের প্রভাবেই এই সমবেদনার অভাব। স্বার্থের অভাবেই সমবেদনার প্রভাব বাড়ে। জগতে স্বার্থ কিন্তু চিরদিনই বলবান। ট্রয়-ধ্বংশ, কুরুক্ষেত্রের-যুদ্ধ—রুষ-জাপান যুদ্ধ সবই এই স্বার্থের জন্য।

সন্ধ্যার অন্ধকার যমুনার কৃষ্ণবক্ষ ছাইয়া দিয়াছে। আগরা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর সম্পূর্ণরূপে আলোকোজ্জ্বলিত হইলেও, তাহার সমুন্নত প্রস্তর-প্রাচীরের, গৃহভিত্তির আশে পাশে, এক একস্থানে অন্ধকারের আধিপত্য দেখা যাইতেছে।

রাত্রি প্রথম প্রহরের নহবৎ বাজিয়া গেল; দ্বিতীয় প্রহরও প্রায় উত্তীর্ণ। সেই বিশাল রাজপুরীতে প্রহরীদের পাহারার সঙ্কেত শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দই নাই। মাঝে মাঝে দুই চারিটা নিশাচর পক্ষী পাখ্‌সাট মারিতেছে। পবনও সন্ সন্ শব্দে বহিয়া, তরুশিরস্থ পল্লবরাশি সঞ্চালন-সঞ্জাত শব্দে, নিশীথিনীর বিরাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

এই গম্ভীর নিশীথে, রঙ্গমহাল সংলগ্ন শুভ্র মর্ম্মর-বারান্দায় এক মছলন্দের বিছানার উপর সাঁচ্চার কাজকরা সুনীল সুকোমল তাকিয়ায় অঙ্গ হেলাইয়া, এক অনিন্দ্য সুন্দরী এক দৃষ্টে আকাশের দিকে কি দেখিতেছিলেন। বাহিরের অন্ধকার যেন তাঁহার প্রাণের ভিতরের অন্ধকারের সহিত মিশিয়াছে। তিনি একদৃষ্টে আকাশের দিকে দেখিতেছেন—আর থাকিয়া থাকিয়া এক একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। সে মর্ম্মভেদী আকুলশ্বাসে, জানিনা আর কাহারও কষ্ট হইতেছে কিনা—কিন্তু সেই ভীম শোভাময়ী নিথর—নিশিথিনী, সেই মর্ম্মোদ্ভূত করুণ শ্বাসের গম্ভীরতা বুঝিয়া আরও সুকৃষ্ণতর বসনে দেহ আবৃত করিতেছে।

আকাশে কত তারা। সুনীল আকাশ গাত্রে, তাহারা দল বাঁধিয়া, দল ছাড়িয়া, মাঝে মাঝে জ্বলিতেছে। ঐ সুনীলাম্বরের কত অসীম ব্যাপ্তি! সেই অনন্ত ব্যাপ্তির অসীমতার সাগরে পড়িয়া, তাহারা ক্রমাগত কিরণ বিকীরণ করিয়া যেন ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে।

সেই সুন্দরী-ললামভূতা—সুরূপসা নিরাশাবিদগ্ধ চিত্তে সহসা সেই মর্ম্মর মণ্ডিত, অলিন্দ্য ত্যাগ করিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সে কক্ষ সুগন্ধি দীপে সমুজ্জ্বলিত। তাঁহার গৃহ প্রবেশ মাত্রেই প্রোজ্জ্বল সেই আলোকরাশি তাঁহার রত্নালঙ্কার মণ্ডিত দেহ-যষ্টির উপর পড়িল। সম্মুখস্থ কলঙ্কহীন মুকুরে সেই ভুবনমোহিনী সৌন্দর্য্যের ছায়া পড়িল! সে রূপের উজ্জলতা বারণে মুকুর যেন আরও কলঙ্কহীন হইল।

সুন্দরী—মুকুর গাত্রে, নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া, একটু হাসিলেন। তারপর ধীরে ধীরে এক সোফায় বসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন,—"বাঁদি!"

বাঁদী দেখা দিল, কুর্ণীস করিল, জোড় হাতে বলিল—"কি হুকুম মা"!

সেই সুন্দরী—উৎকণ্ঠাকুল হৃদয়ে বলিলেন—"তিনি এখনও আসিতেছেন না কেন?"

বাঁদী বলিল—"কেমন করিয়া জানিব মা।"

"তুই একবার তাঁর কাছে যা—"

"যদি তিনি মহলে না থাকেন?"

"হইতে পারে না। আজ তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত আর—

"আর—কি মা?"

"তুই বাঁদী তোর সব কথা শুনিয়া কাজ নাই।"

"সেই ভাল! হুকুম তামিল করিতে এখনিই যাইতেছি।"

"যদি তাঁর দেখা পাস্—বলিস্ "জরুর প্রয়োজন!" আম্বরী বেগম সেলাম দিয়াছেন।"

"যদি দেখা না পাই—"

"তখনই চলিয়া আসিবি।"

"কোন সংবাদই তাঁহার জন্ত রাখিয়া আসিব না?"

"না—তোর যেন স্মরণ থাকে, অম্বর-রাজকুমারী, অদম্য-প্রতাপ মানসিংহের ভগিনী, অতটা আত্মসম্ভ্রম ভুলিতে পারে না।"

"যদি তিনি এ আহ্বানে না—আসেন?"

"তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিস্—না আসিলে তাঁহারই সমূহ ক্ষতি! তাঁহারই প্রয়োজনে আমি তাঁহাকে ডাকিয়াছি।"

এই কথা ওষ্ঠাধরে বিলীন না হইতে হইতে, এক সুন্দর কান্তি যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে, সেই সুরূপসীর হাত দুই খানি ধরিয়া বলিলেন—"স্থিরসমুদ্রে আজ এত প্রবল তুফান উঠিয়াছে কেন—অম্বর কুমারি?"

সেই দর্পিতা—রাজপুতকুমারি, সেই সুন্দর কান্তি যুবককে দেখিয়া যেন রোষ, অভিমান মর্ম্মজ্বালা সবই ভুলিলেন। নতজানু হইয়া তাঁহার বস্ত্র প্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন—"সাহজাদা! যদি কোন রূঢ় কথা বলিয়া অপরাধিনী হইয়া থাকি—তাহা হইলে আমায় মার্জ্জনা করুন।"

আগন্তুক পুরুষ—স্বয়ং সাহজাদা সেলিম। আর সেই অতুলনীয় রূপসী অম্বর রাজকুমারী—যোধাবাই তাঁহার ধর্ম্মপত্নী।

সেলিম, যোধাবাইকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া সেই সোফায় বসিলেন। তারপর মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ পূর্ণ স্বরে বলিলেন—"অম্বর-কুমারি! আমার পিতা আমার বিরুদ্ধে। কারও তত সহানুভূতি নাই। তুমি আমার ধর্ম্ম-পরিণীতা পত্নী। ভবিষ্যৎ হিন্দুস্থানের রাজমহিষী! তুমিও আমার উপর বিরক্ত! আমায় বলিয়া দাও—যোধা, এ জগতে সেলিমের এ জ্বালাময় প্রাণে শান্তির স্থান কোথায়।

এ মর্ম্মস্পর্শী কথায়, অম্বরকুমারীর অভিমান রাশি, ঘূর্ণিত বায়ু প্রবাহ মুখে তুলারাশির মত উড়িয়া গেল! ক্ষুদ্রকায়া গিরিনদীর স্রোত

মুখে, পাষাণখণ্ড পড়িয়া যেমন, তাহার প্রবলোচ্ছাস কিয়ৎক্ষণের জন্ত বন্ধ করে. অভিমান সংরুদ্ধ পতিপ্রেম প্রস্রবণের সেই অবস্থাই হইয়াছিল। এই একটী কথায় পাষাণ সরিয়া গেল। আবার প্রবলবেগে অমৃত প্রস্রবণ নিঃস্রাবিত হইল।

যোধাবাই স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন, "বলিয়া দাও আমায়—কি করিলে আমি তোমার উপযুক্ত হই! রাজপুত কন্তা আমি, হিন্দু কন্তা আমি, তুমি আমার স্বামী, আমার ইহকালের সর্ব্বস্ব—পরকালের সম্বল। বলিয়া দাও—সাধাকাদা, কি করিলে—এ বাদীর-বাঁদী তোমার চিত্ত তুষ্টি করিতে পারে! তোমার মর্ম্মবেদনার কারণ না হয়।"

সেই নলিননেত্র নিঃসৃত উত্তপ্ত অশ্রু বিন্দুগুলি সেলিমের হস্তে পড়িল। সেলিম সাদরে প্রিয়তমা পত্নীকে, অঙ্কে তুলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। স্নেহময় স্বরে প্রেমোদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলেন—"তুমি না করিয়াছ কি যোধাবাই! আমি চাঘ্‌তাই কুলের কলঙ্ক! আকবর সাহের পুত্র নামের অযোগ্য! বিলাস, আত্মসুখ, আত্মতুষ্টি, ব্যসন, এই লইয়াই ত আমার জীবন কাটিতেছে। তোমার মত যে অমূল্য রত্ন খোদা আমায় মিলাইয়াছেন, তাহা যে আমি অতি অযত্নে ধূলায় ফেলিয়া রাখিয়াছি। ছার এ রাজ্য! ছার এ ঐশ্বর্য্য! ছার এ আকবর্ সাহের পুত্রত্ব! তোমার ও নিষ্কলঙ্ক পবিত্র প্রেমের কাছে ত কিছুই নয় যোধাবাই! এত পাষণ্ড আমি যে তাহা বুঝিয়াও বুঝি না।"

ক্ষণপূর্ব্বে অলিন্দ্যে অবস্থানকালে অভিমানের প্রবল কুজ্ঝটিকায় যোধাবাইএর সুন্দর হৃদয়খানি অন্ধকারময় হইয়াছিল। স্বামীর সোহাগে সে কুজ্ঝটিকার অন্ধকার সরিয়া গেল। যোধাবাই সেলিমের কণ্ঠলগ্ন হইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "স্বামীন্! হৃদয়েশ্বর! সতীর সর্ব্বস্ব! অভাগিনীর কণ্ঠহার! এখন যাহা বুঝিয়াছি—তাহা যদি

চিরদিন মনে রাখিয়া চলিতে পার, তাহা হইলে তোমার মত সুখী কে? চিরদিন যে অনন্ত অফুরন্ত ভালবাসা, তোমার জন্য এ হৃদয়ে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছি, কই তাহার দিকে ত একবারও দৃষ্টিপাত করিলে না? দর্পিতা রাজপুত-ললনা—সব সহিতে পারে, স্বামীর অনাদর সহিতে পারে না। সাহাজাদা। যদি তুমি হিন্দুস্থানের সম্রাটের পুত্র না হইয়া, পথের ভিক্ষুক দরিদ্র হইতে—তাহা হইলেও এ অভাগিনী তোমার চরণপ্রান্তে এই হৃদয়ভরা স্নেহ প্রেম ও প্রীতি লইয়া এই ভাবেই আত্মসমর্পন করিত। যাহা করিয়াছ—তাহা ভুলিয়া যাও! পরিণামের দিকে একবার দৃষ্টি কর!"

সাহাজাদা সেলিম পত্নীর এ তিরস্কারে একটু আত্মহারা হইলেন। তাহার চিত্তের প্রবল মোহ যেন একটু মন্দস্রোত হইল। কিন্তু তিনি যে কি অপকর্ম্মের জন্য তিরস্কৃত হইলেন, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কাজেই, বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে বলিলেন,—"কি করিয়াছি যোধাবাই, যাহার জন্য এ তিরস্কার?"

"মনে ভাবিয়া দেখ—কি করিয়াছ!"

"কিছুই ত ঠিক্ করিতে পারিতেছি না!"

যোধপুর রাজকুমারী তখনি ত্বরিত বেগে—সেই রত্নমণ্ডিত কক্ষের অপরাংশে চলিয়া গেলেন। মুহুর্ত্ত মধ্যে এক পিঞ্জরাবদ্ধ কবুতর আনিয়া সেলিমের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন,—

"এ কবুতর কার সাহাজাদা!"

"আমার।"

"কার হাতে দিয়াছিলে।"

"কেন কেন! সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? মেহেরের হাতে। গিয়াসবেগের কন্যার হাতে।"

"তাহাকে তুমি ভাল বাসিয়াছ?"

"না—"

"তবে?"

"মিথ্যা বলিব না—তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছি।"

"ছি! ছি! আকবর সাহের পুত্রের উপযুক্ত কাজ হয় নাই।"

"আর এই সামান্য ব্যাপার লইয়া, স্বামীকে এভাবে তিরস্কার করার কাজটাও আকবর সাহের পুত্রবধূর উপযুক্ত হইতেছে না।"

"তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি। এইরূপ পিপাসা হইতে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

"কেন?"

"তুমি মেহেরকে পাইবে না।"

"কেন—পাইব না? সাহজাদার ইচ্ছার প্রতিকূলে কে দাঁড়াইবে?"

"তা জানি না। কিন্তু সতীসাধ্বী আমি। আমার মন বলিতেছে—এই ব্যাপারে বাদসাহের সহিত তোমার মনান্তর হইবে। তোমার যথেষ্ট অনিষ্ট হইবে।"

"তুমি কেমন করিয়া এ কথা বুঝিলে!"

"রমণী এসব ব্যাপার খুব ভাল বোঝে। তুমি সেই সুন্দরী রমণীর রূপোন্মত্ত! তুমি মজিয়াছ। কিন্তু মেহের মজে নাই।"

"তুমি এ সব কথা কেমন করিয়া জানিলে?"

"সে কথার উত্তর নাই বা দিলাম সাহজাদা।"

"তাহা হইলে তুমি কি বলিতে চাও—পিতা আমার উপর বিরক্ত! অদ্যকার ঘটনা তিনি সব জানিতে পারিয়াছেন।"

"পারেন নাই—কিন্তু তিনি জানিতে না পারিলেও আমি তাঁহাকে জানাইব।

"তুমি পতিব্রতা হইয়া স্বামীর অনিষ্ট করিতে যাইতেছ কেন?

"স্বামীর পদস্খলনে যে আমার সর্ব্বনাশ হইবে—সর্ব্বস্ব যাইবে।

"সম্রাটেরও অসংখ্য মহিষী আছে। তবে—যোধপুরকুমারী, আমার গর্ভধারিণীর সম্রাটের উপর এত আধিপত্য কেন ?"

"যোধপুর কুমারীর যে শক্তি আছে, তাহা হয়ত আমাতে নাই। আকবরসার যে কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে, তাহা হয়ত তাঁহার পুত্রের নাই।"

"যোধাবাই! প্রাণাধিকে! আর কেন - যথেষ্ট হইয়াছে! আমি এ তীব্র তিরস্কার শুনিবার জন্য তোমার কাছে আসি নাই। প্রাণের জ্বালায় শান্তি লাভ করিতে আসিয়াছিলাম।"

"যদি তাই হয় - আমার জীবন সর্ব্বস্ব! তাহা হইলে - তুমি আমার এই হৃদয়ে এস। আর আমি তোমায় কিছু বলিব না। জানিও — সতী সব সহিতে পারে, কিন্তু স্বামির অন্যাসক্তির পাপ সহিতে পারে না। তা—সে—ভিখারিণীই হৌক, আর রাজরাণীই হৌক।"

সেলিম— যোধাবাইএর নিকটে বসিয়া, তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া স্নেহময় স্বরে বলিলেন — "আগে জানিতাম না—যে বিধাতা আমার জন্ম এ অমৃত সাগর এতদিন—কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন! জানিতাম না—যে আমি জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের—প্রধান কামনার ধন পাইয়াছি! যোধাবাই! যোধাবাই! কি শক্তি তোমার! তুমি নিত্য মহাশক্তি রূপে আমার ক্ষীণ হৃদয়ে এইরূপে শক্তিসঞ্চার কর। আমায় মানুষের মত মানুষ করিয়া দাও। ছার সে মেহের! এখন বুঝিলাম, শত শত মেহের তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া বাঁদীগিরি করিবার উপযুক্ত নহে! আত্মসুখে মগ্ন—অসার অপদার্থ আমি! এতদিন কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যেই ভুলিয়াছি—অন্তরের সৌন্দর্য্য দেখিবার অবসর ত পাই নাই যোধাবাই ?"

নিরাশার পর আশা। অন্ধকারের পর উজ্জ্বল আলো। বিরহের পর মিলন। ঝঞ্ঝার পর পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ! কি মধুর! কি মধুর! এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়া গেল।

রাজপুতকুমারী যোধাবাই সাহাজাদা সেলিমকে—আজ যে শিক্ষা দিলেন, অন্য কেহ হইলে হয়তঃ তাহার গুরুত্ব চিরজন্মের মত হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিতে পারিত! পদ্মরাগের নিকটে থাকিলে—যেমন শ্বেত-বর্ণের যে কোন পদার্থ তাহার লোহিত-জ্যোতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে, সেইরূপ সাহাজাদা সেলিম, যতক্ষণ—যোধাবাই এর নিকট রহিলেন—ততক্ষণ তাঁহার বিলাস-মোহময় চিত্তে—সয়তান কোনরূপ আধিপত্য করিতে পারিল না। সেলিম, যোধাবাইএর—কোমলালিঙ্গন—নিপীড়িত হইয়া বুঝিলেন—"বেহেস্ত আর কোথাও নাই। পতিপ্রাণা সতীর সহিত প্রেমপ্রবণ—স্বামীর মিলনেই—এই নর লোকে এ দুঃখকষ্টের পাপের সংসারে, এ কলুষতার মধ্যে স্বর্গের পুণ্যময় উজ্জল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে!

হে! পর-প্রেম লোলুপ, রূপ-পিপাসা কাতর, আত্মসুখ-পরায়ণ, অন্ধ মুগ্ধ-প্রেমিক! নিজের বুকে হাত দিয়া বল দেখি, পতিপ্রাণা সাধ্বীর অনাবিল অফুরন্ত প্রেম কি এই জ্বালাময় মর্ত্তে—স্বর্গের স্নিগ্ধ পবিত্র ছায়া-বিকাশ নহে!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

(কর্ম্মসূত্রের প্রথম গ্রন্থি)

পাঠক! চলুন এখন আমরা বাদসাহের অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া একবার আমীরউল্‌-ওমরা, গিয়াসবেগের প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকায় প্রবেশ করি। সেখানে—স্বামী-স্ত্রীতে কি কথোপকথন হইতেছে তাহা গুপ্তভাবে শুনিয়া, অনেক কাজের কথা অবগত হই।

মীনাবাজারের—পর দুইদিন চলিয়া গিয়াছে। ভগবানের এ বিশাল জগতে, অন্য কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই! কিন্তু আগরার

রঙ্গমহালে, আর গিয়াসবেগের অন্তঃপুরে একটা প্রলয়ের ঝড়ের পূর্ব্ব সূচনা দেখা দিয়াছে।

উন্মুক্ত আকাশতলে, পতি পত্নী— সাংসারিক কথায় নিমগ্ন। সে কথা গুলির সঙ্গে আমাদের এ আখ্যায়িকার বিশেষ সম্বন্ধ।

গিয়াসবেগের পত্নী আমিনাবিবি, স্বামীর হস্তে সরবৎপূর্ণ পাত্র দিয়া বলিলেন, "সাহেব ঠাণ্ডা হইয়া একটা কথা শুনিবে কি ?"

গিয়াসবেগ প্রসন্নমুখে বলিলেন— "তোমার কোন্ কথা কবে না শুনিয়াছি! আমিন্! আমার ভাগ্য তুমি, লক্ষ্মী তুমি, আমার এ অদৃষ্ট-পরিবর্ত্তনের মূল তুমি! দুর্ভাগ্য-বিতাড়িত, সহায়হীন, আশ্রয়হীন, মরুবিহারি অনাহারী পান্থ, আজ ভারতসম্রাট আকবরসাহের প্রধান উজীর! বল! বল! আমিনা, তোমার কি অনুরোধ—কি কথা ?"

গিয়াসপত্নী আমিনা বলিলেন—"সেই যে ফুট্‌ফুটে মেয়েটী, আমায় আনিয়া দিলে, সে যে কোথায় চলিয়া গেল—একবার তাহার সংবাদ লইলে না। তাহার উপর আমার বড়ই মায়া বসিয়াছিল। মুহূর্ত্ত মাত্র চোখের দেখা—তবু বোধ হইয়াছিল, সে যেন আমার কত আপনার। যেমন সুন্দর রূপ, তেমনি সুমিষ্ট কথা—আর নামটাও সুন্দর! জুলিয়া! জুলিয়া! কি সুন্দর নাম। এত বড় সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর তুমি—তুমি ইচ্ছা করিলে না পার কি স্বামী!"

গিয়াসবেগ বলিলেন—"তোমার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে আমি না খুঁজিয়াছি এমন স্থান নাই। জানিনা—সে সহসা কোথায় অদৃশ্য হইল।"

গিয়াসবেগের পত্নী, আমিনা বিবি সহাস্যমুখে বলিলেন—"সাহেব যদি প্রকৃত স্বার্থহীন স্নেহের কোন আকর্ষণ শক্তি থাকে—তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই একদিন আমার কাছে ঘুরিয়া আসিবে। জুলিয়ার কথা এখন থাক—তার চেয়ে একটা বড় কথা তোমায় বলিবার আছে।"

গিয়াসবেগ বলিলেন—"বল সবই শুনিতেছি। হিন্দুরা বলে, "স্ত্রীভাগ্যে ধন।" আমিও তাহা বিশ্বাস করি। যদি তোমায় সেই মরুভূমিতে ফেলিয়া আসিতাম—পিশাচের মত কার্য্য করিতাম, তাহা হইলে হয়ত দিল্লীতে আসিয়া দিল্লীর-বাদসাহের "আত্‌মাদ-উদ্দৌলা" হইতে পারিতাম না। এক মুষ্টি অন্নের জন্য, জীর্ণবাসে পথে পথে ভিক্ষা করিতে হইত। বল—বল প্রিয়তমে! তোমার আর কি অনুরোধ?"

গিয়াসপত্নী প্রসন্নমুখে বলিলেন—"মেহের দিন দিন বড় হইতেছে তাহার ভাবনা—কি ভাবিতেছ?"

গিয়াস বলিলেন—"আমি সামান্য মানুষ, আমি কি ভাবিব? যে খোদা মেহেরকে মরু-প্রান্তর হইতে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন, যাঁর কৃপায় আজ সে আত্‌মাদ্‌উদ্দৌলার কন্যা, তিনিই মেহেরের উপায় করিবেন।"

গিয়াসপত্নী বলিলেন—"আমিও খোদার অনন্ত শক্তিতে বিশ্বাস করি। তোমার স্ত্রী আমি। খোদার শক্তিতে অবিশ্বাসিনী কখনও হই নাই—হইব না। তবে এক এক সময় ভাবি—খোদা মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্য্যের ক্ষমতা দিয়াছেন। আর তিনি ত—সকলের জন্য হাতে কলমে কাজ করেন না।"

গিয়াসবেগ পত্নীর এ যুক্তি-সঙ্গত বাক্যে সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালনে বলিলেন—"সত্য! পিয়ারে! তুমি যা বলিতেছ, তাহাই ঠিক! তুমি মনে ভাবিও না—যে আমার কন্যার বিবাহের কথা আমি একবারও ভাবি না। আমি ভিতরে ভিতরে সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।"

গিয়াসপত্নী আমিনা আশা-প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন—"তাহা কি আর আমি জানি না! আমি সামান্য স্ত্রীলোক বই ত নই! এতক্ষণে বুঝিলাম—মেহের আমার রাজরাণী হইবে।"

একথায় স্থিরবুদ্ধি সংযতচিত্ত গিয়াসবেগ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। চিন্তিত ভাবে বলিলেন—"প্রিয়তমে! তুমি কি বলিতেছ আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। মেহের রাজরাণী হইবে এ কথার অর্থ কি?"

গিয়াসপত্নী আমিনা সহাস্যমুখে বলিলেন—"তুমি এই সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের একজন গণ্যমান্য উজীর, আর এ সোজা কথাটী বুঝিতে পার না? যুবরাজ সেলিম- মেহেরকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন।"

"বল—কি? কি সর্ব্বনাশ!"

"সর্ব্বনাশ কিসের? এতো আনন্দের কথা। সৌভাগ্যের কথা।"

না—না। আমিনা। তুমি ক্ষীণবুদ্ধি স্ত্রীলোক বই নয়! বল—বল সেলিম—কোথায় মেহেরকে দেখিলেন?"

"কেন—তুমি কি জান না, যে মেহের সেদিন আমার সঙ্গে রঙ্গমহলের মধ্যে মীনাবাজার দেখিতে গিয়াছিল।"

"ওঃ বুঝিয়াছি। হতভাগিনী! তুমি স্বেচ্ছায় নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছ! আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ! আর মেহেরের সর্ব্বনাশ করিয়াছ।"

"জগতের মধ্যে নারীর যা শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ, ইহলোকে যা সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয় মেহের তাহাই হইবে। ইহাতে কি অনিষ্ট হইল কিছুইত বুঝিলাম না।"

"সেলিমের সহিত মেহেরের বিবাহ সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

"কেন—"

"রাজবংশীয়া না হইলে—কি দিল্লীর ভবিষ্যৎ বাদসাহের পত্নী হইতে পারে।"

"রাজকন্যা নাই হোক—রাজকন্যার মত রূপ আছে।"

"তুমি আকবর সাহকে চেন না তাই একথা বলিতেছ।"

"আকবর সাহ কি তাহা হইলে এ বিবাহের বিরোধী?"

"সহস্রবার!"

"কেন—?"

"কারণ,—মেহের আমার মত এক ভাগ্যবিতাড়িত অপরিচিতের কন্যা!"

"এখন ত তুমি আমীর-উদ্দৌলা।"

"হোক। এখন আমি সম্মানিত। এখন আমার উচ্চপদ হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের কথা ভাবিয়া দেখ আমিন্! আমার আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠতা কই।"

"তুমি সন্দেহ করিতেছ কর কিন্তু আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে মেহের দিল্লীর সিংহাসনে বসিবে।"

"তোমার এ দিব্য চক্ষু কোথায় পাইলে আমিন?"

"খোদা দিয়াছেন। খোদা বলিতেছেন—তোর মেহের রাজরাণী হইবে! আকবর সাহের পাটরাণী—সেলিমের গর্ভধারিণী বলিতেছেন, মেহের আমার পুত্রবধূ হইবে।"

"তুমি এতদূর অগ্রসর হইয়াছ! জানিও আমিনা—আকবর সাহ জীবিত থাকিতে কখনই এ বিবাহ হইবে না।"

"কেন—"

"তাহা ঠিক বুঝাইতে পারিব না। যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট।

"ধরিলাম সেলিমের সহিত বিবাহ হইবে না। কিন্তু—তুমি কি স্থির করিয়াছ? তোমার মনোনীত পাত্র কে?

"আলিকুলী খাঁ—"

"আলিকুলী খাঁ! একটা গোঁয়ার—বর্ব্বর! এক অস্ত্রজীবি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পাঠান? সে আমার স্বর্ণপ্রতিমাকে লুঠ করিয়া লইয়া যাইবে!

"আমিনা—পাঠানকে অগ্রাহ্য করিও না। একদিন এই পাঠানও মোগলের মত এ হিন্দুস্থানের অধীশ্বর ছিল।

"তোমার পাঠান জাহান্নমে যাক্। আমি এখনও বলিতেছি—আমার মেয়ে রাজরাণী হইবে।"

"আমি বলিতেছি তোমার মেহের, পাঠান বীর আলিকুলী খাঁর পত্নী হইবে। সবই ভবিতব্য! ভবিতব্য তোমার আমার হাত ধরা নয়। বৃথা তর্কে প্রয়োজন কি? পরামর্শে তর্ক আসিলে—কর্ম্ম নষ্ট হয়!"

"জানিও স্বামী—আমার প্রতিজ্ঞা মেহেরকে আমি দিল্লীশ্বরী করিব।"

"আমারও প্রতিজ্ঞা আমিনা! মেহেরকে আমি আলিকুলী খাঁর পত্নী করিব—আমি মেহেরের পিতা।"

গিয়াসবেগ আর কিছু না বলিয়া বিরক্তিভরে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। আমিনা নিজের চিন্তায় বিভোর। কাজেই সে স্বামীর এই ত্বরিত গমনে কোনরূপ বাধা দিতে পারিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

(মানসিংহের ক্রোধ)

মহারাজ মানসিংহ কোন বিশেষ প্রয়োজনে—অম্বর চলিয়া যাইবেন শুনিয়া—সাহাজাদার পত্নী যোধাবাই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। মহারাজ মানসিংহ ভগির সে আহ্বান উপেক্ষা করেন নাই। আগরা ও দিল্লীপ্রাসাদ, এমন কি ফতেপুর-শিক্রীতেও প্রত্যেক বেগমের স্বতন্ত্র মহল ছিল। মোগলের অন্তঃপুরে অন্যান্য স্থানে মানসিংহের প্রবেশ নিষেধ থাকিলেও, তাঁহার সহোদরার সহিত

সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে তিনি ভগ্নির মহলে আসিতে পারিতেন। এরূপ আসিতে হইলেও বাদশাহের অনুমতি লইতে হইত।

মানসিংহ বিমর্ষভাবে এক মখমলমণ্ডিত সুখাসনে উপবিষ্ট। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—যোধাবাই। উভয়েই নির্ব্বাক! উভয়েই যেন একটা মহা-সমস্যার মীমাংসায় পড়িয়া বাক্যহীন অবস্থায় অবস্থিত।

মানসিংহ কিয়ৎক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া, মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন —"তাহা হইলে উপায় কি যোধা!"

"যোধাবাই বিমর্ষ মুখে বলিলেন—উপায় সেই ভগবান।"

মানসিংহ—গম্ভীর মুখে বলিলেন—"আমি বলি কি—দিনকতকের জন্য তুমি আগরা ত্যাগ কর। আমি অম্বরে যাইতেছি—আমার সঙ্গে চল।"

যোধাবাই দর্পিতভাবে বলিলেন—"অম্বররাজ! স্বামীর অনুমতি বিনা ত আমি আগরা ছাড়িতে পারি না।"

মানসিংহ বলিলেন—"আমি না হয়, তোমার হইয়া সম্রাটের সম্মতি লইতেছি।"

সেলিম-পত্নী—ভারতের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্ঞী যোধাবাই—এ কথায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, ওষ্ঠাধর দংশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। তারপর বলিলেন—"না—আমি এখন আগরা ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিব না।"

"কেন—"

"আমি হিন্দুকন্যা। আমার স্বামীর এখন অধঃপতনের সম্ভাবনা। আমি এখানে থাকিলে সে অধঃপতন নিবারণ করিতে পারি।"

মানসিংহ কঠোরস্বরে বলিলেন—"তুমি না মানসিংহের ভগ্নি! অন্যাসক্ত স্বামীর ইচ্ছাকৃত অবমাননা সহ্য করাই কি তোমার উদ্দেশ্য?"

যোধাবাই—তিরস্কারপূর্ণস্বরে বলিলেন "দাদা! আপনি কি ভুলিয়া গেলেন, সাহাজাদা সেলিম আমার স্বামী। আমি তাঁর ধর্ম্মপরিণীতা পত্নী। আর আপনারাই এই পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনের প্রধান উদ্যোগী!

মানসিংহ ঘৃণার সহিত বলিলেন—"আমি আর আমার পিতা দুজনে তখন না বুঝিতে পারিয়া এ সর্ব্বনাশ করিয়াছি! যাই হোক তুমি আমার সহিত অম্বরে যাইবে কিনা?"

যোধাবাই স্থিরভাবে বলিলেন—"না!"

"কেন?"

"স্বামীর অনুমতি পাই নাই।"

"আমি তোমার স্বামী ভক্তির প্রশংসা করি। কিন্তু—"

"পত্নীর কর্ত্তব্যের পথে কোন "কিন্তুর" স্থান নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে অম্বরে যাইতে পারেন।"

"তবে আমি চলিলাম" এই বলিয়া মানসিংহ—আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যোধাবাই বলিলেন—"দাদা! যাইও না! স্থিরভাবে একবার সব কথা ভাবিয়া দেখ! তুমি একবার না হয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর যদি তিনি যাইতে বলেন—"

মানসিংহ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"আমি ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভুত অম্বররাজ মানসিংহ—দিল্লীশ্বর আকবর সার দক্ষিণ হস্ত, মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ—আমি কিনা হীনতা স্বীকার করিয়া সাহাজাদা সেলিমের নিকট তোমার অম্বর যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করিব?"

যোধাবাই বলিলেন—"মহারাজ! এক সময়ে যখন উপযাচক হইয়া সাহাজাদাকে ভগ্নি সম্প্রদান করিয়াছ, তখন ও অভিমান করিলে

চলিবে কেন? যখন আমায় বিক্রয় করিয়া বাদসাহের কুটুম্ব হইবার বাসনা পূর্ণ করিয়াছ, তখন অত উগ্র হইলে চলিবে কেন? আমি বুঝিয়াছি, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে! তাহা না হইলে স্বামী অত্যাচারক্ত, সহোদর আত্মতেজদৃপ্ত—এ অবস্থা ঘটিবে কেন?"

মানসিংহ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিলেন। ভগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যোধাবাই! সাহাজাদা পত্নী! ভুলিয়া যাও, মানসিংহ তোমার সহোদর। এত হীনতা—মানসিংহ স্বীকার করিতে পারে না।"

মানসিংহ ভগ্নির তিরস্কারে মর্ম্মাহত হইয়া, ক্রুদ্ধভাবে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে সমুদ্র প্রমাণ চিন্তা। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, তিনি অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ পার হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পশ্চাৎদিক হইতে কে যেন ডাকিল—'মহারাজ! মানসিংহ!"

মানসিংহ সেইস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"কে তুমি?"

সেই মূর্ত্তি স্থিরভাবে বলিল—"আমায় চিনিতে পারিতেছেন না মহারাজ?"

অদূরেই একটা আলোকস্তম্ভ ছিল। মানসিংহ বলিলেন "না—তোমায় ঠিক চিনিতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর যেন কোথায় শুনিয়াছি। তুমি আমার সঙ্গে এ আলোকস্তম্ভ পর্য্যন্ত আইস।"

সেই অপরিচিত মূর্ত্তি এক স্ত্রীলোকের। মানসিংহ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, তিনি সেই আলোকস্তম্ভের নিকট আসিয়া সেই রমণীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।

সেই রমণীর মুখ—সম্পূর্ণরূপে অবগুণ্ঠন মুক্ত! সে যুবতী রূপসী।

মানসিংহ দর্শন মাত্রেই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন—"তুমি! তুমি! এখানে?"

"হাঁ মহারাজ! আমি এখানে! আপনি আশ্রয় দিলেন না—আপনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সঙ্কুচিত হইলেন, কিন্তু আমি আমার নির্ব্বন্ধ বজায় রাখিয়াছি।"

মানসিংহ বলিলেন—"তুমি মোগলের রঙ্গমহালের মধ্যে আসিলে কিরূপে?"

সেই রমণী ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল—"খোদাই সর্ব্ব কার্য্যের নিয়ন্তা। মহারাজ মানসিংহ! আমি খোদার বিধানে এখানে আসিয়াছি।"

"তাহা বুঝিতেছি! কিন্তু তুমি কোন মহলে আছ।"

"সুলতান সেলিমের মহলে!"

"না—মিথ্যা কথা!"

"পাঠান কন্যা—যে মিথ্যা বলিতে অভ্যস্ত নয়, তাহা ত আমার কার্য্যে এইমাত্র প্রমাণ পাইয়াছেন। দেখিলেন ত আমার প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিয়াছি।

মানসিংহ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন—"আমায় ডাকিলে কেন?"

"একবার সাক্ষাতের জন্য।"

"এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কি?"

"কিছু আছে বই কি! আপনি ত সাহাজাদী যোধাবাইএর মহল হইতে আসিতেছেন!"

"হাঁ—"

"সেখানে কেন গিয়াছিলেন মহারাজ?"

"সেকথা শুনিবার অধিকার তোমার ত নাই!"

"না থাকিলেও আমি শুনিয়াছি!"

"কি করিয়া শুনিলে?"

"সুলতান সেলিম, আমায় একখণ্ড পত্র দিয়া তাঁহার মহিষীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সেই পত্র দিতে গিয়া, দেখি আপনারা ক্রুদ্ধভাবে কথা কহিতেছেন; তাই ঔৎসুক্য চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, দ্বারে কথা শুনিয়াছি।"

মানসিংহ এ কথা শুনিয়া একটু বিচলিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে গম্ভীরমুখে বলিলেন—"সাবধান! এ কথা প্রকাশ না হয়। তুমি যোধাবাইকে শাহাজাদার পত্র দিয়াছ?"

"না।"

"সে পত্র কোথায়?"

"এখনও আমার কাছে আছে।"

"সে পত্র তাঁকে দাও নাই কেন?"

"সুযোগ পাই নাই। আপনি সেই কক্ষে ছিলেন। পত্র অতি গোপনীয়।"

"পত্র কোথায়? আমায় দেখাইতে আপত্তি আছে?"

"কিছুমাত্র না। দেখাইবার জন্যই ত আপনাকে ডাকিয়াছি।"

"পত্রখানি দেখি।"

সেই রমণী মখমল আচ্ছাদিত—রৌপ্যাধারে রক্ষিত—একটী দ্রব্য মহারাজ মানসিংহের হস্তে দিল। মানসিংহ নিকটস্থ আলোকস্তম্ভের নিকট গিয়া পত্র বাহির করিলেন। পাঠ করিয়া অধিকতর বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

সেই রমণী বলিল—"পত্র পাঠ শেষ হইয়াছে মহারাজ! ওখানি আমায় এখন ফিরাইয়া দিন।"

"না—তাহা দিব না!"

"কেন ?"

"আমার ইচ্ছা নয়, যে আমার ভগ্নি যোধাবাই এ পত্র পাঠ করে।" মানসিংহ ক্রোধভরে সেই পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ও দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

পাঠক! এ রমণীকে চিনিয়াছেন কি! এ সেই অভাগিনী জুলিয়া। জুলিয়া মহা সমস্যায় পড়িয়া সেই স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া উন্মাদিনীর মত বলিয়া উঠিল—"হায়! কি করিলাম!"

বিলাতী রঙ্গিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সমস্ত দিবস চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মেরিয়াস এবং ক্যানি অবশেষে হক্‌টন্ ষ্ট্রীটে একখানি ঘর ভাড়া করিল। ঘরের ভাড়া প্রতি সপ্তাহে সাড়ে সাত পেন্‌স্ এবং আড়াই সিলিং সর্ব্বাগ্রে গৃহস্বামীর নিকট জমা রাখিয়া তবে তাহারা প্রবেশ করিতে পাইল। সুতরাং মেরিয়াসের যাহা পুঁজি ছিল—তাহা হইতে একেবারে আড়াই শিলিং খরচ হইয়া গেল! কিন্তু উপায় কি? মাথা গুঁজিয়া একস্থানে থাকিতে হইবে তো? ধন্নী যাহা কিছু ছিল তাহা আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে নিঃশেষ হইয়া গেল। অনাহারে তো প্রাণ রক্ষা হয় না!

পরদিন প্রত্যুষে উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া কর্ম্মের অনুসন্ধানে পথে বাহির হইল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে ;—সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে তাহারা আশায় বুক বাঁধিয়া প্রত্যেক কর্ম্মস্থানে গিয়া কর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল—তবু কোথাও কোনরূপ কর্ম্মের সংস্থান হইল না। হতাশ অন্তরে দুজনে সন্ধ্যার সময় জলে ভিজিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বাসায় উপস্থিত হইল।

দুর্দ্দশার এখনও যথেষ্ট বাকি! বৃষ্টির জলে সমস্ত দিন ভিজিয়া মেরিয়াসের ভয়ঙ্কর জ্বর হইল। মেরিয়াস পরদিন একেবারে উত্থান শক্তি-রহিত। উঠিতে চেষ্টা করিলে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়—এমনই তাহার অবস্থা!

অত্যন্ত কাতর হইয়া মেরিয়াস্ ফ্যানিকে বলিল—"আমাদের সকল আশাই তো ফুরুল—আর তো কোনও উপায় দেখ্‌ছি না! জীবন রক্ষা হওয়াও সঙ্কট! তবে আর একটা শেষ উপায় আছে—দেখি যদি তাতে কিছু হয়—"

ফ্যানি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"কি উপায় বল দিকি ?" "তুমি একবার যদি রয়েল্ ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে যেতে পার তো বড় ভাল হয়। সেখানে গিয়ে মিঃ ভিলিয়ার্স্ নামে যে অভিনেতা আছেন—তাঁকে আমার অবস্থার কথা সবিশেষ বল। কি কর্ব—দুঃখের অবস্থায় পড়লে সবই কর্ত্তে হয়! হা জগদীশ্বর! শেষে ভিলিয়ার্সের কাছেও হাত পাততে হ'ল!" বলিয়া মেরিয়াসের দুই চক্ষু দিয়া শতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। মেরিয়াসের চক্ষে জল দেখিয়া কোমলপ্রাণা ফ্যানিও স্থির থাকিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধকণ্ঠে এবং ভগ্ন স্বরে ফ্যানি বলিতে লাগিল "ভগ্নি! আমার কি অদৃষ্ট দেখ! আমি যখন সৎ পথে—ধর্ম্মপথে থাকতে যাই—তখনই

দেখি রাজ্যের বাধা বিপত্তি বিঘ্ন এসে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে কি ঈশ্বরের ইচ্ছে নয় যে আমি পাপ পথ পরিত্যাগ করি? হায়—আমার কেন মৃত্যু হয় না?" বলিতে বলিতে ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মেরিয়াস কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"থাম বোন্ থাম! জগদীশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাস রেখো—তাহলে সকল বিপদেরই অবসান হবে।"

"মেরিয়াস! তোমার কথা শুন্‌লেই আমার প্রাণে বল ও সাহস আসে। আমি অত্যন্ত নির্ব্বোধ, তা না হ'লে—তোমার এমন রুগ্ন অবস্থায়—কোথায় তোমাকে আমি সান্ত্বনা দোবো- সাহস দোবো,—তা না ক'রে নিজেই ধৈর্য্য হারা হচ্ছি? আমি এখনি মিঃ ভিলিয়ার্সের কাছে যাচ্ছি—তাকে একেবারে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আস্‌ছি! এখন নাও—এই এক পেয়ালা চা খেয়ে—একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর; অন্ততঃ আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি!" ফ্যানির কথামত মেরিয়াস চা পান করিয়া শয়ন করিল। ফ্যানি সাজসজ্জা করিয়া প্রস্থান করিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে মেরিয়াস জাগরিতা হইয়া দেখিল - ফ্যানি সেই যুবক অভিনেতা মিঃ ভিলিয়ার্সের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। মিঃ ভিলিয়ার্স মেরিয়াসের দুরবস্থা দেখিয়া বলিতে লাগিল—"মেরিয়াস্! তোমার এমন দশা দেখে আমার প্রাণে যে কি হচ্ছে তা মুখে প্রকাশ করে কি জানাব? মিঃ বাউয়ার্স তোমার সঙ্গে যে রকম দুর্ব্যবহার করেছেন—আমরা তা শুনে সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। তা এখন আমায় কি কর্ত্তে হবে বল!"

মেরিয়াস অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল "তোমাকে আর কি বল্‌বার আছে বল? তবে আমি এইটুকু বিশেষ জানি—এ জগতে তোমার মতন হিতাকাঙ্ক্ষী আর আমার কেউ নাই!"

ফ্যানিও বলিল—"মিঃ ভিলিয়ার্সকে তোমার আর বিশেষ কিছু ব'ল্‌তে হবে না। আমি পথে আস্‌তে আসতে তোমার আমার সকল কথাই ওঁকে বলেছি। ইনি আমার জন্যে থিয়েটারে একটী চাকরী জোগাড় ক'রে দিয়েছেন,—তুমি যতদিন না আরোগ্য হও ততদিন তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখ্‌বেন যেখানে তোমার খুব সেবা শুশ্রূষা হয়।"

ফ্যানির কথা শুনিয়া মেরিয়াস বলিয়া উঠিল—"মিঃ ভিলিয়ার্স! আমি জানি'না কেমন করে তোমাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্ব্ব!

"থাক্ থাক্! কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই! মেরিয়াস্! আমি আমার কর্ত্তব্যই পালন করেছি! আমি যদি সাধ্যমত নিঃসহায়—নিরাশ্রয়কে সাহায্য না করি তাহ'লে আমার যে ঘোরতর মহাপাতক হবে! তা ছাড়া—তুমি কি ভুলে যাচ্ছ যে আমরা বহুদিন হতে দুজনেই পরস্পরের পরিচিত—বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ! মনে নেই—যখন মিঃ বাউয়ার্সের থিয়েটারে আমরা একত্রে কাজ কর্ত্তেম,—তখন অভিনয়কালে যবনিকার অন্তরালে দাঁড়িয়ে দুজনে কি কথাবার্ত্তা কইতেম!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ খুব মনে আছে—তা কি আমি ভুল্‌তে পারি?" এই বলিয়া মেরিয়াস ক্ষণকাল নীরব হইল। অকস্মাৎ লজ্জায় যেন তাহার মুখবর্ণ আরক্তিম হইয়া উঠিল। মিঃ ভিলিয়ার্স ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন—"তবে আর তোমার মিছে দুঃখ কর্ব্বার তো কোন কারণ নেই মেরিয়াস্! আমি তোমার অনুরোধ কচ্ছি—তুমি দিনরাত কেঁদে কেঁদে এমন সুন্দর চক্ষু দুটী নষ্ট করার উদ্যোগ কোরো না!"

দুঃখের হাসি হাসিয়া মেরিয়াস্ বলিল "মিঃ ভিলিয়ার্স! শুধু দুঃখের

কথায়—কিম্বা মৌখিক শান্তনায় তো কারও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে যে তুমি এখনও আমাদের অবস্থার বিষয় বুঝ্‌তে পারো না!" বলিতে বলিতে আবার তাহার নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মিঃ ভিলিয়ার্স বলিলেন—"স্থির হও—কেঁদো না! বল তুমি কি চাও! আমি তোমার সাহায্য কর্ত্তে এখনিই প্রস্তুত!"

"সাহায্য না কল্লে এ অবস্থায় আমাকে নিশ্চয়ই মারা পড়তে হবে! আমার আর সহায় কে আছে? কে আমায় আশ্রয় দেবে?"

"আমি তোমায় আশ্রয় দোবো মেরিয়াস্! তুমি কেন ভয় পাচ্ছ? আমি যা স্থির করেছি তোমার পক্ষে তা মহা সুবিধা; তাতে তোমার তিলমাত্র মর্য্যাদা নষ্ট হবে না। আমি তোমাকে আমার ভগ্নীর কাছে রাখতে চাই;—তুমি যেতে সম্মত হও।"

মেরিয়াস কোনও উত্তর প্রদান করিল না। অকস্মাৎ অভাগিনী শয্যার উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া ঢলিয়া পড়িল। ভয়ে মিঃ ভিলিয়াস চীৎকার করিয়া উঠিল।

ফ্যানি বলিল, "চীৎকার কর্ব্বেন না; মেরিয়াসের রুগ্ন অবসন্ন শরীর—এই সব দুর্ভাবনায় আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, তাই মূর্চ্ছা গেছে। আপনি দয়া করে একখানি গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে আসুন—আমি ততক্ষণ মেরিয়াসকে সুস্থ করি।"

মিঃ ভিলিয়ার্স গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ফ্যানির সাহায্যে অতি সন্তর্পণে মেরিয়াসকে ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইলেন—এবং আপাততঃ ফ্যানির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া উভয়ে সেই গাড়ীতে প্রস্থান করিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গাড়ী আসিয়া বড় রাস্তার ধারে একখানি সুন্দর অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল। মিঃ ভিল্লিয়ার্স গাড়ী হইতে নামিয়া সেই বাড়ীর রুদ্ধদ্বারে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে লাগিলেন। একজন যুবতী দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

মিঃ ভিল্লিয়ার্স জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার ভগ্নী ভিতরে আছেন কি?"

"আজ্ঞে—হ্যাঁ।"

মিঃ ভিল্লিয়ার্স মেরিয়াসকে বলিলেন—"তবে আর কি! আর তোমার ভয়ের কোনও কারণ নেই! তুমি নিজেরই বাড়ীতে নিজেরই আত্মীয় স্বজনের কাছে এসে পড়েছ!

এই বলিয়া মেরিয়াসকে সঙ্গে লইয়া মিঃ ভিল্লিয়ার্স সেই বাটীর একটী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই কক্ষে একটী যুবতী পুস্তক পড়িতেছিলেন। তাঁহাদের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিস্মিতা হইয়া মিঃ ভিল্লিয়ার্সের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

মিঃ ভিল্লিয়ার্স বলিলেন, "ভগ্নী আল্লি! ভয় পেওনা! ইনি অপর কেউ নন আজ থেকে ইনি তোমার ভগ্নী!"

মেরিয়াস্ কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ভগ্নী! আমি শুনেছি তুমি বড় দয়াবতী, তোমার প্রাণ বড় ভাল! সেই বিশ্বাসেই তোমার কাছে এসেছি। আমার সমস্ত বিবরণ তোমার কাছে প্রকাশ কর্ব্ব! কিন্তু একটা বিষয়ে প্রতিশ্রুত হও,—আমার কথা কারও কাছে কখনো প্রকাশ কর্ব্বে না!"

সকলে প্রতিশ্রুত হইলে—মেরিয়াস্ ভগ্নস্বরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাদের নিকট আদ্যোপান্ত আত্মকাহিনী বিবৃত করিল। মেরিয়াসের কথা শেষ হইলে মিঃ ভিল্লিয়ার্স বলিলেন—"মেরিয়াস্! তুমি নিশ্চিন্ত

থাক, আমাদের দ্বারায় তোমার কোন কথা প্রকাশ হবে না. কিম্বা তোমার তিলমাত্র অনিষ্ট হবে না। আমাদের উপর সমস্ত নির্ভর করে থাক।"

"সে কথা আর কেন ব'লছ? নির্ভর না কল্লে এখানে আসব কেন?"

"তাহ'লেই হ'ল। আমার ভগ্নীর সঙ্গে তবে এখন শয়ন ঘরে যাও! একটু সেবা-শুশ্রূষা পেলেই তুমি দুদিনে আরোগ্য লাভ কর্ব্বে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর, মেরিয়াস্ বেশ আরোগ্য লাভ করিল। এবার যেমন করিয়া হউক্, একটী চাকুরী নিশ্চয় সংগ্রহ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া মেরিয়াস্ একজন থিয়েটারের (এজেণ্ট) প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিল। ইঁহার বাসস্থান বো ষ্ট্রীটে একটী ক্ষুদ্র বাটীতে। লোকটী তাড়াতাড়ী পাঁচ সিলিং নিজের দক্ষিণা লইতে যেমন তৎপর, কার্য্য করিতে তেমন নহেন। সুতরাং তাঁহার দ্বারায় মেরিয়াসের কার্য্যের কোনরূপ সুবিধা হইল না। মেরিয়াস নিজে উদ্যোগী হইয়া কর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া মেরিয়াস একেবারে রয়েল গ্র্যাণ্ড্ সেলুনে গিয়া উপস্থিত হইল। লণ্ডনে ইহার তুল্য উচ্চদরের গীতিনাট্যশালা আর নাই। ইহার অধ্যক্ষ এবং একমাত্র স্বত্বাধিকারী মিঃ ক্লিফোর্ড পূর্ব্বে একজন কুম্ভকার ছিলেন, এক্ষণে অবস্থার পরিবর্ত্তনে খেতাব পাইয়াছেন,—"পার্সিভেল ডি ক্লিফোর্ড।" মেরিয়াসের আবেদনে প্রথমে মিঃ ক্লিফোর্ড তাহাকে চাকুরী প্রদান করিতে স্বীকৃত হন নাই—কিন্তু নানা কারণে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

তখন ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হইতেছিল;—পথ অত্যন্ত কর্দ্দমময়, মেরিয়াস্

ক্লিফোর্ডের নিকট চাকুরী না পাইয়া সেলুন হইতে বিদায় লইবার সময়ে পোষাক নষ্ট হইবার ভয়ে এমনি কায়দা করিয়া পোষাক তুলিয়া চলিতে লাগিল যাহাতে তাহার চাল চলন বড় মনোরম দেখাইতেছিল।

মিঃ ক্লিফোর্ড সুন্দরী রমণীকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি গবাক্ষে দাঁড়াইয়া মেরিয়াসের চালচলন এবং সৌন্দর্য্য ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া মেরিয়াসকে ফিরাইয়া আনিলেন।

মেরিয়াসের সহিত কথাবার্ত্তায় এই স্থির হইল যে তাহাকে প্রত্যেক রাত্রে নর্ত্তকী এবং গায়িকার কার্য্য করিতে হইবে, এবং তাঁহার জন্ত তাহাকে আশানুরূপ বেতন দেওয়া হইবে। মেরিয়াসও স্বীকৃতা হইল।

অতি অল্প দিনেই মেরিয়াস সমগ্র দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কারণ শুধু রূপে নয়, মেরিয়াস গুণেও অন্যান্য সমস্ত অভিনেত্রীগণকেও পরাজিত করিয়াছিল। সুতরাং সকলেরই বিষম আক্রোশ মেরিয়াসের উপর! সকলেই মনে মনে ভাবে, "কোথা থেকে এই আপদ বালাই আসিয়া জুটিল!" নাট্যশালায় রঙ্গমঞ্চে কোনও অভিনেত্রীর সহিত মেরিয়াসের সদ্ভাব নাই, কেহ তাহার সহিত বাক্যালাপ করে না। সকলেই তাহাকে বিদ্রূপ পরিহাস করে; কথায় কথায় সকলেই তাহাকে টিট্‌কারী দেয়।

রঙ্গমঞ্চে দর্শকবৃন্দের নিকট মেরিয়াস অত্যধিক আদর এবং সম্মান লাভ করে। মেরিয়াস যদি গান গাইতে গাইতে বেসুরো করিয়া ফেলে দর্শকবৃন্দ তাহাতে কোনরূপ দোষ ধরে না; সকলেই এক বাক্যে মেরিয়াসের সুখ্যাতি করে—সকলেই বলে "এমন অভিনেত্রী আর ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখি নাই!"

যাহা হোক্ মেরিয়াসের অবস্থা এক্ষণে খুব উন্নত বটে, কিন্তু তথাপি

তাহার প্রাণে তেমন সুখ শান্তি নাই; কারণ একাকিনী তাহাকে অনেকগুলির মন রাখিতে হয়।

প্রথমতঃ মিঃ ক্লিফোর্ড। ইঁহাকে লইয়া মেরিয়াস সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত ইঁহার ভয়ে সে ব্যতিব্যস্ত। ক্লিফোর্ডকে দেখিলে সে বিশ হাতে দূরে সরিয়া থাকিত। কারণ, তাঁহার অধীনে যতগুলি অভিনেত্রী আছে—সকলেরই সহিত তিনি প্রণয় করিবেন। যদি কেহ আপত্তি করে, তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ম্মচ্যুতি!

দ্বিতীয়তঃ রঙ্গভূমি সজ্জাকর। অভিনয়কালে ইঁহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া শক্তিশালী অভিনেতা পর্য্যন্ত ভীত হইয়া থাকে—অবলা অভিনেত্রীগণের তো কথাই নাই। কেহ একপদ এদিক ওদিক করিলে—তীব্র কটু ভাষায় তাহাকে সপ্ত নরকরাজ্যে পাঠাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। সুতরাং তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই মেরিয়াসের স্বেদবর্ম্ম উপস্থিত হইত।

তৃতীয়তঃ বেশকারী। তিনি প্রতি কথায় প্রহার করিতে অগ্রসর হইতেন; অসাবধানে পোষাক নষ্ট করিয়াছে বলিয়া যখন তখন অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণকে জরিমানা করিতেন!

সকলের উপর মহাবিপদ—দর্শকবৃন্দকে লইয়া। দলে দলে যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা ধনী দরিদ্র প্রভৃতি আসিয়া মেরিয়াসের সহিত আলাপ করিত এবং তাহার গুণের প্রশংসা করিত। অভিনয়ান্তে প্রাণপাত পরিশ্রমের পর কি প্রকারেই বা সকলকে যথাযোগ্য আপ্যায়িত করিয়া সন্তুষ্ট করে? অথচ আপ্যায়িত করার একটু ত্রুটী হইলে মেরিয়াসের আর রক্ষা নাই! পরদিন নিন্দার তাড়নায় সহর তোলপাড়! মেরিয়াস বুঝিল এ সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল!!

(ক্রমশঃ)

এলেন টেরির বেনিফিট নাইট।

(শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত।)

এদেশে অভিনেত্রীর জীবন যেমন অনেকের চক্ষে ঘৃণিত, পাশ্চাত্য দেশে সেরূপ নয়। অনেক নাট্যরাণী, সমাজের মধ্যে বরণীয়া আদরণীয়া। এক এক জনের অভিনয় দেখিবার জন্য—নাট্যশালা যেন দর্শকভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এক সময়ের একটী ঘটনা বলিতেছি।

তখন—হেনরি আরভিং সেক্সপীয়ারের নাটকাবলীর অভিনয়ে খুব যশ সঞ্চয় করিতেছেন। সুনীল ফেনিল সাগরমেখলা, ব্রিটানিয়ার চারিদিকে আর ইউরোপ ব্যাপিয়া এলেনের আর হেনুরি আরভিংএর সুখ্যাতি। সকলেরই মুখে এককথা কি সুন্দর স্বাভাবিক অভিনয়! কি যথাযথ নাটকীয় চরিত্রের অভিব্যক্তি। কি অভিনয় প্রতিভা! ধন্য! ধন্য!

এলেন টেরির তখন নূতন নাট্যজীবন। রূপ যেন বসন্তের প্রস্ফুটিত প্রসূনরাশির মত—প্রাণ আলো করা। গুণ—তাহার আর তুলনা দিব কি? এই গুণের জন্যই দেশে বিদেশে এত নাম ডাক। এলেন যে ক্ষেত্রে দেখা দিতেছেন সেখানে অভিনয়—যতদূর উৎকৃষ্ট হইবার তা হইতেছে। তাহার উপর হেনুরি আরভিং নিজে—সেক্সপীয়ারের নাটকগুলিকে মাজিয়া ঘসিয়া অতিসুন্দর রূপে এই যুগের অভিনয় উপযোগী করিয়াছেন। তার পর দৃশ্যপট, সজ্জা সমাবেশ—তা যতদূর স্বাভাবিক হইতে হয় তাহাই হইতেছে।

ইংলণ্ডে গুণের আদর আছে—। তাহার উপর—হেনুরি আরভিংএর জীবনব্যাপী চেষ্টা উদ্ভাবনীশক্তি। এলেন টেরিকে নাট্যশালার

কর্তৃপক্ষগণ একদিন বেনিফিট নাইট দিলেন। কর্তৃপক্ষগণ বলিলাম—তাহার কারণ একটা লিমিটেড কোম্পানী এই সময়ে "লিসিয়াম থিয়েটার" ভাড়া লইয়া ছিলেন।

বেনিফিটের রাত্রে রঙ্গালয়ে আর লোক ধরে না। আলো জ্বালিবার অনেক আগে হইতেই রঙ্গশালা, লোকে ভরিয়া গিয়াছে। তিল ধারণের জায়গা নাই। লোকে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ মূল্য দিয়াও টিকেট পাইতেছে না। দর্শকদের প্রবেশের জন্য—যাইবার ও আসিবার দুইটী রাস্তা। তাহার মধ্যে লোহার রেলিং। এ স্থানে যেন মেলার জনতা।

শেষে সেই সব টিকিট ওয়ালা দর্শক মহা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো তোমাদের অভিনয় দেখিতে চাহি না—একবার মিস্ এলেনকে দেখিতে চাই!" নাট্যশালার অধ্যক্ষ—তখন বাহিরেই ছিলেন। তিনি—সকলকে সবিনয়ে বলিলেন—"মিস্ এখনও আসিয়া পৌছেন নাই। আসিলেই আপনারা তাহাকে এইখানেই দেখিতে পাইবেন।"

দর্শকগণ সেই মহাভিড়ের মধ্যে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া এলেনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এলেন নাট্যশালার মধ্যে পৌছিয়াই—এই সব কথা শুনিলেন। তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। কি সুন্দর সজ্জা! কি মধুর বিনয়! কি উজ্জল রূপ!

চারিদিকে—দিগন্তব্যাপী গম্ভীর নাদ উঠিল "হিপ্—হিপ্—হুররে"। সকলেই মাথার টুপি খুলিয়া—সেই খ্যাতনামা অভিনেত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সংক্ষুব্ধ জনতার কোলাহল একটু স্থির হইলে টেরী তাঁহার সুললিত কোমল কণ্ঠে—সকলকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেন। এইকথা শুনিবা মাত্র অতবড় জনতা একেবারে শব্দ শূন্য। আমাদের সভাসমিতি বা নাট্যাগার হইলে, হয়তঃ হিস্ হিস্

শব্দ—পায়রা ওড়ানর বিকটধ্বনি উদ্দেশ্যহীন কোলাহল আর কিছুক্ষণ চীৎকার ধ্বনিতে দিগদিগন্ত কাঁপিয়া উঠিত।

টেরি—ধীর নম্রস্বরে—সমাগত কষ্টসহিষ্ণু দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যই আমার ন্যায় হতভাগিনী আজীবন পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছে। তাহাতে যত ত্রুটি যত দোষ থাকুক না কেন আপনারা যে দোষগুলি উদারভাবে লইয়া মার্জ্জনা করিয়াছেন—এই সমুদ্রবৎ মহা জনতাই তাহার বিশেষ প্রমাণ! আপনাদের মধ্যে অনেকেই এমন লোক আছেন—যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, আমাকে—তাঁহাদের ওয়েটিংহলে অনেক সময় তীর্থকাকের মত অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। তাহাদের অনেকে এই জনতায় কষ্ট সহ্য করিতেছেন। আপনাদের এই মহত্ত্ব ও সহৃদয়তা দেখিয়া এইটুকু বুঝিতেছি—যে কর্ম্মভূমি ইংলণ্ডে গুণের অনাদর নাই—অভিনেত্রীর প্রতি ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষ ক্ষেপ নাই, শ্লেষ নাই, বিদ্রুপ নাই—আর অপরাধের মার্জ্জনা আছে। আজ আপনাদের কষ্টের কারণ হইয়াছি বলিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত! কিন্তু আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতদূর সাধ্য, তাহা আমি করিব! দুই এক দিনের মধ্যেই—আপনারা আমায় এই নাট্যশালায় এই ভূমিকায় পুনরায় দেখিতে পাইবেন। অদ্য বিদায়! বিদায়! ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন!"

চঞ্চলা দামিনীর মত এলেন—সহসা এক গুপ্ত দ্বার দিয়া ষ্টেজের মধ্যে চলিয়া গেলেন। আবার সেই বিরাট জনতায় মহা কোলাহল। কিন্তু সে কোলাহল মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থির ভাব ধারণ করিল। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাট্যশালার অধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমাদের মধ্যে অনেকে মিস্ টেরির জন্য মনোমত উপহার আনিয়াছেন। এগুলির কি উপায় হইবে?" অধ্যক্ষ বলিলেন। "ক্ল

গুলি আজ আপনারা ফিরাইয়া লইয়া যান। এবার যে দিন অভিনয় হইবে, সেই দিন স্বহস্তে মিস্‌কে দিবেন।"

একজন ভদ্রলোক বলিলেন, "না মহাশয়! তাহা হইতেই পারে না। যাহা আমরা সঙ্গে আনিয়াছি তাহা আজই লইতে হইবে। আমরা আজ অভিনয় না দেখিতে পাইয়া যথেষ্ট মর্ম্ম ব্যথা পাইয়াছি। উপহার গুলি না লইলে আমাদের তাহার উপর অপমান করা হইবে।"

নাট্যশালার অধ্যক্ষ তাহাদের এ যুক্তিপূর্ণ অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য, নিজের মাথার টুপি খুলিয়া উপহার দাতৃগণের সম্মুখীন হইলেন। সে টুপি একটা beaver hat, তাহার মধ্যবর্ত্তী গহ্বরও বেশী। কিন্তু সেই টুপিটী মুহূর্ত্ত মধ্যে উপহার দ্রব্যে ভরিয়া গেল। তাহার মধ্যে কেবল সোণার আংটী, ব্রুচ, সেফ্‌টীপিন, চেইন ও পেণ্ডাণ্ট (pendant)।

নাট্যশালার অধ্যক্ষ সকলকে ধন্যবাদ দিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। অভিনয় দেখিতে না পাইয়া জনতাও ক্ষুণ্ণ মনে বিরল হইয়া পড়িল। বাহিরে সংগৃহীত এই উপহারের আনুমানিক মূল্য—প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা তাহা ছাড়া ভিতরেও অনেকে নানাবিধ বহুমূল্য উপহার দিয়াছিলেন।

সেক্ষপীয়ারের নাটকাবলীতে মিস্ এলেন্‌টেরির ভূমিকা।

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ভাবিয়া এই স্থানে আমরা এলেনটেরি জগতের মহাকবি আজীবন ও অনন্তকাল পর্য্যন্ত নাট্যসম্রাট সেক্ষপীয়ারের যে যে নাটকে যে যে ভূমিকা লইয়া অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে কয়েকটী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহার এক সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম।

অভিনেত্রী	এলেনটেরির গৃহীত ভূমিকা	সেক্সপীয়রের নাটকাবলী
মিস্ এলেনটেরি	মিসেস্ পেজ	মেরিওয়াইভ্‌সঅভ্‌উইণ্ডসর
"	বিয়েট্রিস্	মচ্ এডু এব্যাউট নথিং
"	পোর্সিয়া	মার্চ্চাণ্ট অব ভিনিস
"	রাণী ক্যাথারিণ	কিং হেনরি (VIII)
"	ইমোজেন	সিম্বোলিন্
"	কর্ডিলিয়া	কিং লিয়ার
"	লেডিম্যাকবেথ্	ম্যাকবেথ্
"	অফিলিয়া	হ্যামলেট্
"	জুলিয়েট্	রোমিও জুলিয়েট্।

আমরা এই সব ভূমিকার চিত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় King Henry VIII নাটকে তিনি রাজ্ঞী ক্যাথারিনের যে অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহার এক চিত্র বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়া দিলাম। ভবিষ্যতে অপরগুলি প্রকাশের চেষ্টা করিব।

এলেনটেরির বাহাদুরী।

আমাদের এদেশে যেমন বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা অভিনেত্রীগণ একটী নির্দ্দিষ্ট রঙ্গালয়েই অভিনয় করিতে পারেন, বিলাতে বা আমেরিকায় সেরূপ নহে। এক সহরের মধ্যে দুই তিনটী রঙ্গালয়

হয়ত একজন প্রখ্যাতনামা অভিনেত্রীর বিভিন্নাংশে অভিনয় করিবার বন্দোবস্ত করেন। কথাটা আর একটু খুলিয়া বলি। হয়তঃ কোন থিয়েটারে একটী ভূমিকা লইয়া, ঠিক রাত্রি বারটার সময় সেই অভিনেত্রীকে ষ্টেজে নামিতে হইবে। এই সময়ের দশ মিনিট আগে হয়তঃ তিনি সে রঙ্গমঞ্চের ত্রিসীমায় ছিলেন না। কিন্তু অভিনয় সময়ে ঠিক সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গালয়ে কোন কোন সময়ের মধ্যে কি কি ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অভিনেত্রী নিজেই প্রস্তুত থাকেন। ইংলণ্ডের মাটীর গুণে সকলেই ঘড়ীর কাঁটা ধরিয়া কাজ করে। যদি একই অভিনেত্রীকে এক রাত্রে দুই তিন স্থানে অভিনয় করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকেন,ও ভিন্ন ভিন্ন নাট্যশালার অধ্যক্ষদের সহিত তদনুরূপ বন্দোবস্ত করেন। নাট্যশালার অধ্যক্ষদেরও ঘড়ী ধরিয়া কাজ। এ দেশের কোন কোন মন্দভাগ্য নাট্যশালায় যেমন দর্শকের আগমন অপেক্ষা করিয়া দেরীতে কনসার্ট আরম্ভ করিতে হয়, বিলাতে সে বন্দোবস্ত নাই। সব ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। তা যেমন অধ্যক্ষ—তেমনি তার অধীনস্থ কর্ম্মচারী, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ।

বিলাতে "Playgoer" বলিয়া আমাদের নাট্যমন্দিরের ধরণে একখানি মাসিক পত্র আছে। ইহার ১৯০২ খৃঃ অব্দের নবেম্বর সংখ্যায় মিস্ এলেন টেরির হুসিয়ারির সম্বন্ধে একটী কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার যতদূর মনে আছে তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ—

ফুলহামে (Fulham S. W) Grand Theratreএ La Paupee বলিয়া এক Comic Operaতে মিস্ টেরি নায়িকার অংশ অভিনয় করিতে থিয়েটারের অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক নিয়োজিতা হন। টেরি সেইদিন আরও দুই একটী থিয়েটারে ভূমিকা লইয়াছিলেন। ফুলহামের থিয়েটারের কথা যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহা নহে।

গ্রাণ্ড থিয়েটারের ম্যানেজার মহাশয় ত থাপ্পা হইয়া উঠিলেন। রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। ১২টা ৫ মিনিটে টেরি নাট্যমঞ্চে ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইবেন—কিন্তু তাহার ত দেখা নাই! ম্যানেজার ও থিয়েটারের বড় কর্ত্তা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। সেদিন টেরির নামে রঙ্গালয়ে লোক ধরে না—কিন্তু কোথায় এলেন টেরি! লোকে তাঁহার পরিবর্ত্তে অপর একজনকে ষ্টেজে দেখিতে পাইলে—ভয়ানক টিটকারী দিবে। নাট্যশালার মহাকলঙ্ক হইবে।

নাট্যশালার অধ্যক্ষ—উপায় না দেখিয়া এক সুন্দরী অভিনেত্রীকে বাছিয়া লইয়া তাহাকে "পার্ট" মুখস্থ করাইতে লাগিলেন। অভিনয়ে না পারুক যদি সে তাহার রূপের গরবেও দর্শককে ভুলাইতে পারে, তাহা হইলেও কতক রক্ষা।

ষ্টেজের ম্যানেজার ক্রমাগত ঘড়ির দিকে চাহিতেছেন। মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী! এই পাঁচ মিনিট পরেই এলেন টেরির ভূমিকা। তবুও তার দেখা নাই। সকলের প্রাণ, মানের ভয়ে দুরু দুরু কাঁপিতেছে।

পাঁচ মিনিট হইতে দুই মিনিট কাটিল। বাকী তিন মিনিট! নূতন অভিনেত্রী উইংসের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। যে অভিনেতার সহিত টেরিকে অভিনয় করিতে হইবে তিনি Sir John Goslingএর অংশ লইয়াছেন। তাহার শেষ কয়েক ছত্র এই—

Ah! My darling! you are too late for me.

I thought you ever, there was "never" in me.

ঠিক এই মুহূর্ত্তে যথোপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত হইয়া টেরি সেই নব নির্ব্বাচিত অভিনেত্রীকে মৃদু করাঘাতে ঠেলিয়া দিয়া—ষ্টেজের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। Last catch বা শেষ কথা ধরিয়া বলিলেন—

It is better Sir Gosling to be little late.

"Never" is a word that I too late".

রঙ্গালয় দর্শকবৃন্দের আনন্দ ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আর ম্যানেজার ও স্বত্বাধিকারী টেরির এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন—"সত্যই টেরি মায়াবিনী! তাহা না হইলে এ সংকট সময়ে সহসা উপস্থিত হইয়া এরূপে আমাদের মান রক্ষা করিবে কেন?

থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেল। টেরির অভিনয়ের প্রত্যেক কথায় লোকের আনন্দ উচ্ছ্বাস। সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

নাট্যশালার অধ্যক্ষ মহাশয় মহা সন্তুষ্ট হইয়া প্রাণের আবেগ ভরে নিজের অঙ্গুলি হইতে এক বহু মূল্য হীরকাঙ্গুরীয় খুলিয়া মিস্ টেরির অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া বলিলেন "my young lady—you saved me miraculously from disgrace. Keep this as a souvener of my gratefulness" অর্থাৎ "মিস্! আজ তুমি আমায় ঘোর অপমান ও লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছ। এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক এ ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন রূপে রাখিয়া দাও।"

মিস্ টেরি অবশ্য মৃদু হাসিয়া—শিরঃ সঞ্চালনে ধন্যবাদ দিয়া অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিলেন।

নাট্যশালার অধ্যক্ষের ইঙ্গিতে, সুবাসিত শ্যাম্পেন লইয়া এক ভৃত্য উপস্থিত। অধ্যক্ষ স্বহস্তে তাহা টেরিকে পান করিতে দিয়া বলিলেন —"Would you explain the mystery please!

টেরি সেই শ্যাম্পেন পাত্র শেষ করিয়া সুগন্ধিত রুমালে সেই শ্যাম্পেনসিক্ত ফুল্ল ওষ্ঠাধর মুছিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন It is nothing Mr.—but punctuality—the watchword of every one who are servant to the public. এই কথায় একটা

হাসির রোল উঠিল! নাট্যশালার অধ্যক্ষ অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে মিস্‌ টেরির প্রাপ্য পাওনার উপর আরও উনিশ গিনি বেশী দিলেন।

টেরি রঙ্গালয় ত্যাগ করিবার সময়, যে নব নির্ব্বাচিত অভিনেত্রী তাঁহার অংশ অভিনয় জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—তাহার সহিত কর মর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"মিস্‌! আজ আমার দোষেই—তুমি এক মহা সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলে! কিন্তু যদি আমি না আসিতাম, তাহা হইলে তোমার দ্বারাই এ সম্প্রদায়ের মান রক্ষা হইত। তুমি রূপেই ভুবন জয় করিতে।"

রুস-অভিনেত্রী এনা প্যাভ্‌লোভা।

(শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

পৃথিবীর মধ্যে রুস-সাম্রাজ্যে নাট্য ও নৃত্যকলার বিশেষ সমাদর। রুসিয়ার নরনারী নৃত্যগীতের পক্ষপাতী—অনুরাগী। সেখানে সকাল সন্ধ্যায় প্রতি গৃহে গীতবাদ্য হইয়া থাকে,—কিন্নরকণ্ঠী লাবণ্যময়ী রুস-বালাগণের লাবণ্যের উৎস যেন গানে, নৃত্যে ও হাস্যকোলাহলে উছলিয়া উঠে। তাহাদের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, তাল-মান-লয়-যুক্ত সঙ্গীতের আলাপ শুনিয়া প্রবাসী পর্য্যটকগণ মুগ্ধ ও মোহিত হন।

রুসিয়ার সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সমাজও সঙ্গীতের অনুরাগী! রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস্‌ স্বয়ং ইহার পক্ষপাতী। * তাঁহার

---

* বর্ত্তমান রুস-সম্রাটের জীবনবৃত্তে প্রকাশ,—সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস্‌ সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। গীত রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রচিত গীতগুলি বিষাদের সুরে বাঁধা—তাঁহার প্রত্যেক গানেই কেমন একটি অব্যক্ত বেদনার আভাস পাওয়া যায়। প্রায়ই ডিউক হেসি গানগুলির সুর করিয়া দেন। এই সুর-লয়ে বাঁধা গানগুলি শুনিলে যেন

বিশাল সাম্রাজ্যের অধিবাসিগণ যাহাতে এই সুকুমার কলার প্রতি অনুরাগী হয়, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যকলায় প্রবৃত্ত হয় এবং এই সকল কলাকুশল নরনারীগণ যাহাতে তাহাদের প্রতিভার পরিচয় দিবার অবকাশ পায়,—মহামতি সম্রাট তাহার ব্যবস্থা-বিধানে উদাসীন নহেন।

রুসিয়ার রাজকীয় বিদ্যালয়ে নাট্য ও নৃত্যকলা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদত্ত হইয়া থাকে। রুস-সম্রাট স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি যে রমণী নৃত্য ও অভিনয়ে সমগ্র প্রতীচ্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, নর্ত্তকী ও গায়িকা-রূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত, যাঁহার গীত ও নৃত্যের মহিমায় ইয়োরোপ মোহিত, যাঁহার নৃত্যলীলাপরায়ণ রূপের প্রতিকৃতি ছায়াচিত্রে পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি সেণ্টপিটার্সবর্গনিবাসিনী এক রুসীয় যুবতী,—রুস-সম্রাট প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাঁহার নাম,—এনা প্যাভ্‌লোভা।

এনা প্যাভ্‌লোভা রাজকীয় বিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি একাধারে গীত, নৃত্য, বাদ্য ও অভিনয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী হইয়াছেন। সম্প্রতি এনা আত্মজীবন কাহিনী লিখিয়াছেন; বিলাতী সাময়িক পত্রসমূহে তাঁহার স্বরচিত জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইয়োরোপের সংবাদ-

চক্ষে জল আসে,—এমন বিষাদপূর্ণ সঙ্গীত। তাঁহার অধিকাংশ গানই ধর্ম্মভাবে পূর্ণ; খ্রীষ্টধর্ম্ম ও খ্রীষ্টান সাধকগণের মধুর মহিমায় তাঁহার কবিতাগুলি পুণ্যময়;—ধার্ম্মিক খ্রীষ্ট শিষ্যগণের অবদান ও ভোগবিলাস বিরতি তাহার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। সম্রাট অনেক গান বাঁধিয়াছেন; বাদ্যেও সম্রাটের দক্ষতা অসাধারণ। তিনি চমৎকার বেহালা বাজাইতে পারেন। একবার তাঁহার প্রাসাদ হইতে একটি উৎকৃষ্ট বেহালা হারাইয়া যায়; প্রিয় বেহালার বিরহে সম্রাট অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন।

পত্র মহলে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। এনা প্যাভ্‌লোভার জীবনবৃত্তের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মসংবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

এনা লিখিয়াছেন,—আজ কাল সুকুমার কলাগুলির মধ্যে নৃত্য-বিদ্যার বিশেষ সমাদর। সভ্যজগতে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত নর্ত্তকীর সংখ্যা আজকাল অতি বিরল। নিপুণা নর্ত্তকীর অভাব সর্ব্বত্রই। উদ্দাম নৃত্য-বেগে, গুরুগম্ভীর পদশব্দে নাট্যপীঠ প্রকম্পিত করিয়া তুলিতে অল্লাধিক মাত্রায় সকলেই সমর্থ; কিন্তু ধীরে ধীরে নিপুণতার সহিত নৃত্য করিবার কৌশল অনেকেই অবগত নহেন। সাধারণ দর্শকগণ মনে করেন, নৃত্যলীলাপরায়ণা নর্ত্তকীর নূপুর-সিঞ্জনে যখন রঙ্গমঞ্চ কম্পিত হইতেছে,—নর্ত্তকীর সাজসজ্জা ও অঙ্গভঙ্গীর মনোহারিত্ব যখন দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, তখন অবশ্যই এই নৃত্যে নর্ত্তকীর অসাধারণ নৈপুণ্য আছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যে নর্ত্তকীর নৃত্যে আয়াসের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, অথবা যাহার নৃত্যলীলায় তাণ্ডবের আভাস সূচিত হইবে, তাহারা নর্ত্তকীপদ বাচ্য নহে।

নৃত্য-কলায় অভিজ্ঞতালাভ সাধনা-সাপেক্ষ। বহুকাল যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নৃত্যবিদ্যার অনুশীলন করিতে হয়; তাহার পর নৃত্য কৌশল নর্ত্তকীর নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আমার নিজের জীবনে আমি এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়াছি। রুসিয়ার রাজকীয় বিদ্যালয়ে আমি কঠোর পরিশ্রম সহকারে নৃত্য ও নাট্যকলার অনুশীলন করিয়াছিলাম। নৃত্যের প্রতিই আমার অত্যধিক অনুরাগ ছিল। বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষালাভ করিয়াই আমি ক্ষান্ত হই নাই; গৃহে সুযোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নৃত্যের অভ্যাস ও অনুশীলন করিতাম, এজন্য আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলাম—প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া নৃত্য-কলার অনুশীলনে তৎপর

হইয়াছিলাম। তাই আজ আমি নর্ত্তকীসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিতা হইয়াছি, সর্ব্বসাধারণের নিকট সহানুভূতি পাইতেছি। শিক্ষামন্দির পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার নৃত্য চর্চ্চা ত্যাগ করি নাই; এখনও আমি ইহার সমুচিত অনুশীলন করিয়া থাকি।

আমার বয়স যখন নয় বৎসর মাত্র, তখন আমি শিক্ষার্থিনীরূপে রুসিয়ার রাজকীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলাম; এই বিদ্যালয়ে ছাত্রী নির্ব্বাচনের বিধিব্যবস্থা বড়ই কঠোর। এখানে বৎসরের কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া ছাত্রী নির্ব্বাচন করা হয়। এই দিন ছাত্রীরা তাহাদের অভিভাবকগণের সহিত শিক্ষা-মন্দিরের সুবিস্তৃত হলঘরে কর্ত্তৃপক্ষের সমক্ষে নীত হয়। প্রথম পরীক্ষা—বালিকার বয়স লইয়া। দশ বৎসরের অনধিক বয়স্কা বালিকারাই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পায়; আর যাহাদের বয়স দশ বৎসরের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়।

বয়স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বালিকাদিগকে ব্যালেট মাষ্টার বা নৃত্যাচার্য্যগণের নিকট উপস্থিত করা হয়। তাঁহারা নৃত্যশালার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া থাকেন। বালিকাদিগকে এই টেবিলের সম্মুখে সুবিস্তৃত কক্ষতলে কিছুক্ষণ পদচারণা করিতে হয়। পদচারণার পর মল্ল-কৌশল-প্রদর্শন; শিক্ষার্থিনীগণকে কয়েকটি মল্ল-কৌশলের পরিচয় দিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য, পরীক্ষার্থিনীর দেহযষ্টি নৃত্য-কলা-অনুশীলনের উপযোগী কি না তাহা পরীক্ষা করা। যদি কাহারও পদ-চারণায় কোন ত্রুটি লক্ষিত হয় অথবা দেহ কঠোর ও অনমনীয় দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকেও নৃত্যশালা নিষ্কাশিত করা হইয়া থাকে।

ইহার পর ডাক্তারের পরীক্ষা। উপর্য্যুপরি দুইটি অগ্নি-পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইলেও, বিদ্যালয়ের ডাক্তারের পরীক্ষায় শিক্ষার্থিনীর স্বাস্থ্য যদি নৃত্যশিক্ষার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, তবেই তাহাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষানবীসরূপে মনোনীত করা হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নির্ব্বাচিত ছাত্রীদিগকে প্রথমে ব্যায়াম, কসরত, নৃত্যকৌশল সম্বন্ধে নিয়মিতরূপে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পূর্ণ একবৎসরকাল এই-ভাবে শিক্ষাদান চলিতে থাকে। সম্বৎসরের পর শিক্ষার্থিনীদিগকে চতুর্থবার পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার ফলে যে সকল ছাত্রীর নৃত্য-কলার উৎকর্ষ লক্ষিত হয়, পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়, ভাবী পারদর্শীতা সূচিত হয়, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগকে শিক্ষানবীসের পর্য্যায় হইতে উন্নীত করিয়া "ব্যালেট ইন্‌স্‌-টিটিউসনের" ছাত্রীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

ব্যালেট ইন্‌স্‌টিটিউসনের ছাত্রীগণকে সদাসর্ব্বদা কতকগুলি বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এখানে তাহারা পূর্ব্বের মত যথেচ্ছ বিহার করিতে পায় না; বিদ্যালয়-সংলগ্ন ছাত্রীবাসেই তাহাদিগকে অবস্থান করিতে হয়। কতিপয় বর্ষীয়সী রমণী ইহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন; ইহারা ছাত্রীদের অভিভাবিকা নামেই অভিহিতা হন। যদি কখনও কোন ছাত্রীর বিদ্যালয়ের বাহিরে যাইবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অভিভাবিকা তাহার সহিত গমন করিয়া থাকেন। ছাত্রীগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিবিধানে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ উদাসীন নহেন; এ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য। রাত্রি নয়টার মধ্যেই সকল ছাত্রীকে শয্যাগ্রহণ করিতে হয়; বেলা নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত তাহারা নিদ্রামগ্ন থাকে; বারো ঘণ্টাকাল সুষুপ্তির পর তাহাদিগকে জাগ্রত করা হয়। এইরূপ নিদ্রার ব্যবস্থা চিকিৎসকগণের অনুমোদিত, বিদ্যালয়ের বিধানের অন্তর্গত ও সর্ব্বথা পালনীয়।

গীত, নৃত্য, বাদ্য ও নাটকীয় ভূমিকার অভিনয় সম্বন্ধে ছাত্রীগণকে

বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থিনীরা যতদিন এ সকল বিষয়ের প্রত্যেকটিতে প্রতিষ্ঠালাভ না করেন, ততদিন তাহাদিগকে অহরহ এগুলির অভ্যাস ও অনুশীলন ক'রতে হয়।

ইহার পর ব্যালেট নাচ। গীত, বাদ্য, নৃত্য ও নাট্যকলায় অভ্যস্ত হইলে ছাত্রীগণকে ব্যালেট নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যালেট নৃত্যে নর্ত্তকীগণ দলবদ্ধ হইয়া গীত ও বাদ্য সংযোগে তাল-লয়-মান রক্ষা করিয়া একসঙ্গে নাচিয়া থাকে। ব্যালেট নৃত্যকে ঐক্যতান নাচ বলা যাইতে পারে। ব্যালেট মাষ্টারের অধীনে দীর্ঘকালব্যাপী যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে এই নৃত্য শিক্ষা করিতে হয়। রুস রাজ্যে ব্যালেট নাচের বড়ই আদর।

ব্যালেট নৃত্যে কোন ছাত্রার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাইলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে অপেরায় একাকিনী নৃত্য করিবার অধিকার প্রদান করেন। এই অধিকার প্রাপ্ত হ'লে ছাত্রীগণ আপনাদিগকে অনেক পরিমাণে কৃতকৃত্য মনে করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাই সর্ব্বোচ্চ পদ নহে। ইহার উর্দ্ধতন পদ ব্যালেরিনা (Ballerina), ব্যালেরিনার পদপ্রাপ্তি সুলভ নহে ; ইহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। আমার অদৃষ্টে এই সম্মান ঘটিয়াছিল ; আমি ব্যালেরিনার পদপ্রাপ্তিরূপ সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলাম।

ব্যালেরিনা পদপ্রার্থিনীগণকে সাধারণতঃ সাত বৎসরকাল একাদিক্রমে একাকিনী নৃত্য করিতে হয়। সাত বৎসর পরে কর্ত্তৃপক্ষ নৃত্যশাস্ত্রে যদি নর্ত্তকীর বিশেষ অভিজ্ঞতা ও নিপুণতার পরিচয় পান, তবে তাহাকে ব্যালেরিনার পদ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এনা প্যাভ্‌লোভা চারিবৎসরকাল একাকিনী নৃত্য করিয়াই এই দুর্লভপদের অধিকারিনী হইয়াছিলেন।

এনা বলেন,—ব্যালেরিনা হইবার পর আমার কর্ম্মজীবন আরম্ভ

হইল। আমার অভিভাবকগণের আগ্রহাতিশয্যে জনসাধারণকে আমি আমার নৃত্যকলার কসরত দেখাইতে বাধ্য হইলাম। সে আজ দশ বৎসরের কথা,—যেদিন আমার কর্ম্মজীবন আশার আলোকে প্রথম উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সর্ব্বপ্রথম যেদিন আমি এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় অগ্রসর হই, আমার জীবনের সে এক স্মরণীয় দিন!

আমার নৃত্য-লীলা প্রদর্শনের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল; সেণ্টপিটার্স-বর্গের সাধারণ নাট্যশালা নৃত্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইল; নাট্যশালা হইতে বিজ্ঞাপন বাহির হইল; দেখিতে দেখিতে রাজধানীর রাজবর্ত্ম গুলির উভয়পার্শ্ব ই বিচিত্র বিচিত্র প্ল্যাকার্ডে মণ্ডিত হইয়া গেল। চারিদিকে প্রচারিত হইল,—রুসিয়ার রাজকীয় নাট্য-বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা, নৃত্যকলাকুশলা ব্যালেরিনা কুমারী এনা প্যাভ্লোভা সাধারণ নাট্যশালায় একখানি গীতিনাট্যের অভিনয়ে তাঁহার নৃত্যলীলা প্রদর্শন করিবেন।

দেখিতে দেখিতে নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল। সেণ্টপিটার্সবর্গের সাধারণ নাট্যশালা নন্দনকাননের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে; বহু-জাতীয় সুগন্ধি সুদৃশ্য পুষ্পে নাট্যমণ্ডপ সুসজ্জিত। লতা ও পত্রে সুচারুরূপে ভূষিত উৎসবময়ী নগরীর ন্যায় নয়ন-মন-বিমোহন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নাট্যমণ্ডপ রাজধানীর সম্ভ্রান্ত নরনারীগণের অভ্যর্থনার জন্য পুলকপূর্ণ চক্ষে দণ্ডায়মান। সুবর্ণখচিত চিত্রাঙ্কিত সুদৃশ্য গালিচা প্রেক্ষা গৃহে প্রসারিত, তাহার উপর বহুসংখ্যক আসন। সন্ধ্যা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে পুরবাসিগণ সেই সকল আসন পূর্ণ করিতে লাগিলেন; পুরুষ, রমণী, রাজা, প্রজা—সকলেই রঙ্গালয়ে উপস্থিত; স্বয়ং রুস সম্রাট রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়াছেন। নেপথ্যে (সজ্জাগৃহে) অভিনেতা, অভিনেত্রী, নর্ত্তকী ও রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের সমাগম হইয়াছে, আমিও উপস্থিত।

প্রথমে ঐক্যতান বাদন ; তাহার পর গীতিনাট্যের অভিনয় আরম্ভ হইল ; যথাসময়ে আমার পালা আসিল, আমি রঙ্গমঞ্চে আবিভূর্ত হইলাম। তখন সহস্র সহস্র কৌতূহলোদ্দীপক চক্ষু আমার উপর পতিত, আমার মস্তকের কেশাগ্র হইতে পদনখরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ অনুভূত হইল ; কিন্তু পরক্ষণে আমার চিন্তাম্লান উদ্ভ্রান্ত নেত্রযুগল সহসা পুলকপূর্ণ ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; আমি যেন দেখিলাম, আমার অজ্ঞাত কর্ম্মজীবনের তমোময় আবরণ ভেদ করিয়া নাট্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি আমার নেত্রপ্রান্তে বিরাজমানা ; আমাকে দুর্ল্লভ বর প্রদান করিবার জন্যই যেন সেই মহামহিমাময়ী দেবী অভয়া ও বরদা-মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন, আমার মোহ দূর হইল. প্রগাঢ় উৎসাহ-ভরে আমি আমার কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হইলাম, একে একে আমার শিক্ষিত বিদ্যার কসরৎ প্রদর্শন করিতে লাগিলাম, ঘন ঘন করতালি শব্দে রঙ্গালয় মুখরিত হইয়া উঠিল।

তাহার পর যখন দর্শকগণকে অভিবাদন করিয়া নাট্যপীঠ হইতে বিদায় লইতে উদ্যত হইলাম এবং যবনিকা যখন ধীরে ধীরে ঈষৎ অবনমিত হইল, তখন সহসা রঙ্গমঞ্চে যে অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইল, নাট্যজগতে তাহা অপূর্ব্ব ও অভিনব। আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে আনন্দ ও বিস্ময় দমন করিতে পারিলাম না। দেখিলাম, রুশিয়ার প্রবল প্রতাপ সম্রাট মহোদয় নাট্যপীঠে আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান! সম্রাট একটি বহুমূল্য হীরক-হার আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"ইহা তোমার কৃতিত্বের পুরস্কার!" দারুণ লজ্জায় আমার মস্তক যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল, দেহের সমস্ত রক্ত মুহূর্ত্ত-মধ্যে আমার মুখে আসিয়া জমিল, আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল, পরক্ষণেই অর্দ্ধবনত যবনিকার পতন হইল। তখন আমার

মোহ দূর হইয়াছে, ফিরিয়া দেখিলাম, সম্রাট অদৃশ্য হইয়াছেন, কিন্তু তখনও সমবেত দর্শকগণের নিরবচ্ছিন্ন করতালিশব্দে ও গুরুগম্ভীর হাস্যকোলাহলে রঙ্গালয় মুখরিত হইতেছিল।

ইহাই এনা প্যাভ্‌লোভার অভিনয়—জীবনের সূত্রপাত। ইহার পর এনা পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যে নৃত্যাভিনয় করিয়া অসাধারণ প্রতিষ্ঠার অধিকারিণী হইয়াছিল,—বারান্তরে চিত্রসহ তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

রঙ্গিণীর রূপ। *

রূপশালিনী লোক-বিমোহিনী। মনোমোহন করা যাহাদের উপজীবিকা তাহাদিগকে লাবণ্যময়ী হইতেই হইবে। রূপ কেবল কমল নয়নে, শশীমুখে, তিলফুল নাসায়, গৃধিনী শ্রবণে, বিম্বাধরে, মুক্তাদন্তে, কম্বুগ্রীবায়, মৃণালভুজে, চম্পকাঙ্গুলীতে, ক্ষীণমধ্যে, গুরু-নিতম্বে, রামরম্ভা উরুতে, চূর্ণকুন্তলে, ফণীর ন্যায় বেণীবিন্যাসে, চারুচরণ-যুগলে, নবকিশলয় কম্পনের ন্যায় দেহলতার প্রাবেপণে এবং স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তিতে নাই। রূপের বিকাশ ভাবে হয়, ভাববিমূঢ় মানুষ ভাবময় রূপের বিকাশে মজিয়া যায়। সহচরী অতি কুৎসিতা ছিল, কিন্তু সে যখন মান মাথুর কীর্ত্তনের সুরে গীত করিত, তখন তাহার রূপ যেন ফাটিয়া পড়িত। শ্রোতৃবৃন্দ তখন দেখিতেন, সহচরীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা বিশ্বব্যাপী বিরহের সম্মোহন কাতর ভাব যেন গলিয়া গড়াইতেছে। এই রূপই রূপ, এই রূপেই জগৎ মাতিয়া যায়। ভাব-

* জনৈক সংবাদপত্র-সম্পাদক এই প্রবন্ধের লেখক। কোনও বিশেষ কারণে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইল না।

বিকাশ-জন্য রূপ পুণ্যের লক্ষণ; দেহ পবিত্র না হইলে হৃদয় নির্ম্মল না থাকিলে ভাবের মোহে কুৎসিতাকেও সুন্দরী করিতে পারে না! ভাবের পূর্ণবিকাশ হইলে দর্শক ভাবেই বিভোর হইয়া যাইবে, অভিনেত্রীর ভাবময় দেহের গঠনের দিকে দৃষ্টি করিবে না। তবে সকলের ভাগ্যে ভাবের পূর্ণবিকাশ করা সম্ভব নহে, তাই দেহের লাবণ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। পিশাচীর ন্যায় ব্যবহার করিলে দেহের লাবণ্য থাকে না। পূর্ণ লাবণ্যময়ী—স্বয়ং সতী; যে রমণীর যতটুকু সতীত্ব আছে, তাহাতে ততটুকু লাবণ্য থাকিবেই। পিশাচী একেবারেই কুৎসিতা; সে কৌৎসিত্য অতি ভীষণ, অতি ভয়ঙ্কার জনক। এই কৌৎসিত্য ঢাকিবার জন্য রং, রুজ, তৈল, পেন্ট, পমেড, ওয়াস্ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রং করাও একটা বিদ্যা; ইউরোপে এই প্রসাধন বিদ্যার এখন খুব আদর। একজন ফরাসী রঙ্গিণীর রূপ বাড়াইয়া মাসে বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক রোজগার করে।

পরন্তু যে সকল রঙ্গিণী প্রধানা নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাহাদের পক্ষে কেবল রঙ্গের সাহায্যে রূপ বাহির করিলে হইবে না। তাঁহাদের ভাব চাই, দেহের পবিত্রতা চাই, মনের বল চাই—এত বল, যে বলের প্রভাবে সহস্র সহস্র শ্রোতা বিমূঢ় হইয়া থাকে। সামান্যা বার-বিলাসিনী প্রধানা নায়িকার অংশগ্রহণ করিয়া সর্ব্বলোক-মনোরঞ্জন করিতে পারে না। যাহারা গায়িকা, যাহারা অভিনয়ের নায়িকা তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী বেশ্যা হইলে চলিবে না। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বিখ্যাত গায়িকাদের মধ্যে কেহ কেহ কুমারী থাকে, সকলেই বিবাহ করে—দেহ বেচিয়া কেহ অর্থ উপার্জ্জন করে না। তাহারা জানে যে, পাপে সু-কণ্ঠ কর্কশ-কণ্ঠে পরিণত হয়, তাহারা জানে কেবল সু-কণ্ঠে নহে পবিত্র ভাবোন্মেষেও গান মিষ্ট লাগে—গীতে মানুষকে মাতাইয়া দেয়। আমাদের দেশেও যখন প্রকৃত সঙ্গীতের

আদর ছিল, তখন কিন্নর জাতীয়া কীর্ত্তনগায়িকা সকল বিবাহ করিত, গৃহস্থের ন্যায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত—তাই তাহাদের গান এত মিষ্ট লাগিত। সঙ্গীতের সে সম্মোহিনী শক্তি এখনকার বাঙ্গালী যুবক বুঝিতে পারিবেন না। এখনকার-সঙ্গীত বিদ্যাশূন্য যুবকদের কেবল সেই সঙ্গীত ভাল লাগে, যে সঙ্গীত রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত। তা যেমন তেমন রমণী হউক না কেন, রমণীত বটে। সুতরাং দেশে প্রকৃত সঙ্গীতের চর্চ্চা নাই।

সারা সিডন্স যে অসামান্যা রূপসী ছিলেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি যখন লেডী ম্যাক্‌বেথ সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার প্রভাপূর্ণ মুখভঙ্গী দেখিয়া শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইতেন। শ্রীমতী সিডন্স কখনও অত্যধিক রং মাখিতেন না, যে টুকু মাখিতেন সেটুকু যেন দেহের বর্ণের সহিত মিশাইয়া যাইত, বর্ণ প্রভা বৰ্দ্ধিত করিত। সারা সিডন্সের গলার আওয়াজ অতি মধুর ছিল—এত কোমল ছিল যে, গলার আওয়াজে সকল ভাবের অভিব্যক্তি করিতে পারিতেন। সিডন্স বেশ্যা ছিলেন না, প্রকৃতই মহীয়সী রমণী ছিলেন।

মেরী লীন্—সু-গায়িকা—কোকিলকণ্ঠী,জনবিমোহিনী সু-গায়িকা। লীনের রূপে যে দর্শক পাগল হইত তাহা নহে, তাঁহার মুখে বসন্তের দাগও ছিল। কিন্তু তিনি যখন বীটহোভন, মোজার্ট প্রভৃতির ভাবপূর্ণ গান করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া লোকে সত্য-সত্যই পাগল হইত। ইতালীয় কবি পেত্রার্কের এই গানটী—

"তোমায় কত ভালবাসি, কেমন ভালবাসি—জানি না!
তনু মন প্রাণ তোমারি চরণে,
লাজ সুখ মান তোমারি কারণে—
সঁপিয়াছি বঁধু, নাই অন্য কিছু—
কত ভালবাসি, তুমি দেখ না।

কি—জানি তুমি কেমন, হ'বে বা আমি যেমন,
অথবা আমি তোমারি মতন,
তব ভাব প্রভায় চির-মগনা।"

যখন লীন গান করিতেন, তখন ভাবাবেশে লোকে উন্মত্তবৎ হইত। কুড়ি হাজার লোক এক সঙ্গে সে মধুরকণ্ঠের অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী শুনিতে পাইত। লীন চরিত্রহীনা ছিলেন না, লীন সুরাপান করিতেন না।

মাদাম পাত্তীর ন্যায় সুগায়িকা এখন সুসভ্য সমাজে অতি বিরল। মাদামপাত্তীর যেমন রূপ তেমনি গুণ, মাদামপাত্তী চিরযৌবনা। মাদামপাত্তী সংযতেন্দ্রিয়া তেজস্বিনী রমণী। তাঁহার সহিত দুইটা মিষ্টালাপ করিবার আশায় ইউরোপের অনেক মুকুটধারী মস্তক এখনও তাঁহার বুটপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু মাদামপাত্তী তুচ্ছ ক্ষণেকের সুখ আশায় নিজের অমূল্য নিধি বিশ্ববিমোহিনী কণ্ঠধ্বনিকে নষ্ট করিতে চাহেন না। পাত্তী এখনও অজেয়া।

আর কত দৃষ্টান্ত দিব। তবে কোন ইতালীয় গায়িকা-অভিনেত্রীর উপদেশ-কথা ভাষান্তরিত করিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। তিনি বলেন যে,—"রূপ নয়নে, রূপ দেহে নহে। নয়নগ্রাহ্য রূপকে অন্য রূপে অনুভূতিগম্য করিয়া ফেলিলে, রূপের মোহ ছুটিয়া যায়, বিশ্ব-বিমোহিনী প্রভা উড়িয়া যায়। সুতরাং রূপসী অভিনেত্রী কদাপি যেন রূপের আধার দেহকে অনায়াসলভ্য না করেন। রূপ দেখাইয়া, গান শুনাইয়া, ভাব বুঝাইয়া যে লক্ষ লক্ষ লোকের মন মজাইবে, সে যেন নিজে না মজে। নিজেকে হারাইলেই পরকে পাওয়া যাইবে না। ইহাই প্রকৃত রূপের তপস্যা। রূপকে চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছা থাকিলে তপস্বিনী হইতে হইবে। বারবিলাসিনী জগজন-রঞ্জিনী

হইতেই পারে না, সে লম্পটের সুরাবিকৃত দৃষ্টিতে সুন্দরী বলিয়া পরিচিতা হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে লম্পট কয়জন ?"

আমাদের দেশে থিয়েটারের রুচি বেশ পাকা হইয়াছে। থিয়েটারের ব্যবসায় বেশ চলিবে। যাহাদের দেখিয়া, যাহাদের আদর্শে আমাদের দেশের থিয়েটার প্রতিষ্ঠাপিত, তাহাদের পদ্ধতি অনুযায়ী আমরাও ব্যবসা চালাই না কেন ?

মশক-চরিত।

১। বাপু মশক, তোমায় পায়ে পড়ি, কাণের কাছে অমন করিয়া পন্ পন্ করিও না। দংশন কর, রক্ত শোষ, আমার কোন আপত্তি নাই ; কিন্তু যাহা করিবে, নিঃশব্দে কর। ভাই, অনেক দিন হইতে তোমার ঐ গলাবাজি শুনিতেছি। তুমি কি মনে কর, তোমার ঐ গুন্‌গুনা আমার বড় মিষ্টি লাগে ? দোহাই তোমার, আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, তোমার ও আওয়াজে কোন মাধুর্য্য নাই। তোমার ঐ একঘেয়ে পালা শুনিয়া শুনিয়া আমার কাণ ঝালাপালা হইয়াছে ? এখন প্রাণ ওষ্ঠাগত ! বাপু হে, শুনিয়াছি গল্পের রাক্ষস গ্রামবাসীদিগের উপর নিত্য অত্যাচার—মহামার করিত। পাড়ার মুরুব্বীরা এক দিন রাত্রে একত্র হইয়া, স্থির করিলেন—একটা প্রতিকার করিতে হইবে। রাক্ষস আসিলে সকলে গললগ্নবাসে বলিলেন,—"রাক্ষস মহাশয়। যত সংহার করেন, আপনি তো তত আহার করিতে পারেন না ; নিরর্থক কতকগুলো হানাহানির প্রয়োজন কি ? প্রতিরাত্রে আপনার বলি স্বরূপ আমরা এক একজন উপস্থিত হইব, আপনি আহার করিবেন, তাহাতে আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করিব।" ভাই, এই নজিরে, এমনি

একটা বন্দোবস্ত করিলে হয় না? হে বিপুল হুল-শূল-ধারিন্! হে ভৈরবরবকারিন্! হে রক্তাপহারিন্! আমি প্রতি সন্ধ্যায় পঞ্চানন্দ-তলায় একটু করিয়া রক্ত দিয়া আসিব, তুমি তথায় ভূরি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইও! ভাই হে, মহতের দৃষ্টান্ত মহতেই অনুকরণ করে! রাক্ষস সদয় হইয়াছিল; তুমি কি হইবে না? কিন্তু তুমি যে ক্ষুদ্র!—

২। বাপু হে, শুনিয়াছি দুনিয়ার আবর্জ্জনায় তোমার জন্ম! তাই কি তুমি আসিয়াই অগ্রে আপনার বংশ মর্য্যাদা কীর্ত্তন কর! যদি তাই হয়, তাও অনাবশ্যক! তোমার যদি চক্ষু থাকিত, অনায়াসে দেখিতে পাইতে যে, বুনিয়াদি বংশের আর আদর এখন নাই! যে কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আবর্জ্জনারই গৌরব।

৩। দেখ, এমন করিয়া জ্বালাতন করিবার পূর্ব্বে তোমার ভাবা উচিত, যে তুমি অতি ক্ষুদ্র! আমার এক চপেটাঘাতে তোমার মশক-লীলা এখনই শেষ হইতে পারে। কিন্তু কি স্পর্দ্ধা তোমার! ভ্রূক্ষেপ নাই! থাকিবে কেন? দেখিয়াছ কি না, বাহাদুর বৈজ্ঞানিক বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াও তোমার বংশধ্বংশ করিতে পারিলেন না! জলে স্থলে কত অর্থ ব্যয় হইল, কেরোসিন তৈল মাহার্ঘ্য হইয়া উঠিল, কিন্তু তোমার বিজয় বিষাণ তেমনি সগৌরবে বাজিতেছে; তোমার খরসান হুল তেমনি অক্ষত রহিয়াছে! একটা চড়ে তোমার আর কি হইবে? আর তোমায় মারিতে গিয়া আমার লাভ হইবে কেবল গালে চড়! দেখ, মশক, তোমার উপর বিজাতীয় রাগে কখন কখন মনে করিয়াছি তোমাদিগকে তোপে উড়াইয়া দিয়া সমূলে নির্ম্মূল করি! কিন্তু হায় রে, "কুল জনপ্রভবস্য লজ্জা"—মশা মারিতে কামান পাতিব!

৪। বাপু হে, সময় সময় তোমার কাণ্ড দেখিয়া মনে হয়, তুমি অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র গমনশীল! তুমি কেমন করিয়া জানিলে, আমি এখানে নির্জ্জনে বসিয়া নাট্য-মন্দিরের

শুষ্ক অঙ্কে লিখিবার চেষ্টা করিতেছি? হায়, হায়! এত যত্নে মনঃসংযম করিলাম—কিন্তু আর কি লেখা হয়! তোমার শুভাগমনে, বীণাপাণি কে কিং-পাণী, স্বয়ং শূলপানীও সশঙ্কিত। ভাই হে, সত্য বল দেখি, মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গিয়াছিল কে?—মদন না তুমি? বাপু, তুমি কি ভাবিতেছ, আমি এখানে নাট্যরঙ্গ দেখিতে বসিয়াছি; তাই তোমার ঐ বিকট কন্‌সার্ট (concert) আমায় শুনিতেই হইবে! "বরং রাম শরঃ শ্রেয়ো নচ বৈভীষণং বচঃ"—রক্তপাত অভিনয়ের পূর্ব্বে তোমার ঐ সময়কার ঐকতান শুনিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে; লিখিব কি?—

৫। বাপুহে, অত হাঁকাহাঁকি কেন? তোমাদের কি একটা পরিষৎ আছে? তাইকি কেবলই আপনা আপনি শিঙ্গা বাজাইতেছ? এ সংসারে যারা আপনা আপনি শিঙ্গা বাজাইতে পারে, তাদেরই জয়! আমরা যদি কখন শিঙ্গা ফুঁকিবার চেষ্টা করি, তখনই মরি! এমনি আমাদের দুরদৃষ্ট! তা হোক, তবু এ মশ্বযোচিত দুরদৃষ্ট—মশার বিজয়গর্ব্ব হ'তে ভাল!

৬। ভাই, ভাল বুঝিতে পারিতেছি না! তুমিও কি একাকরী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পৃথিবীময় একভাষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছ? দেখ্‌ছি তুমি আবার উচ্চাশয়। ভাবি তাই, ভগবান যদি তোমায় হাতীর মত করিয়া গড়িতেন; আর শুঁড়ের মত কুল পানের মত দুখানা পাখা দিতেন, তার উপর তোমার মধুর প্রকৃতিটি বজায় থাকিত! কিন্তু ভগবান তো তোমায় সৃষ্টি করেন নাই। তুমি অজ্ঞান হইতে আপনি উদ্ভব হও। শুনিয়াছি মন দেহকে সৃষ্টি করে। তা তোমার যতটুকু মন ততটুকু হইয়াছে! তাই, একটি অনুরোধ, অতটুকুই থাকিও। চারি দিকে ক্রমোন্নতির ঘটা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাড়িবার চেষ্টা করিও না।

২। মশকরাজ, কোন মূর্খ বলিয়াছিল তুমি পরোপকারী মহাজন? গভীর তিমির-বসনা সন্ধ্যায় সুগভীর শঙ্খ রোলের সঙ্গে সঙ্গে,ঘনান্ধকার ঘনাইয়া যখন তোমাকে ঝাঁকে ঝাঁকে মাথার উপর উড়িতে দেখিতাম; ভাবিতাম, তুমি দেহের দূষিত রক্ত, মনের কুপ্রবৃত্তি হরণ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছ। কি নিদারুণ প্রাণান্তিক ভ্রান্তি! খাঁটি রক্তটুকু খাও, আবার অধিকন্তু উর্ব্বর দেহক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া বীজ বপন করিয়া যাও! মশক, তুমি খেতাব লইবার চেষ্টা করিতেছ না কেন? বড় সাহেবদের একবার ছাঁকা ছাঁকা করিয়া ধর না! তোমার মত অনেক নজির আছে। বাহাদুর তো তুমি বটেই, রায় বাহাদুর উপাধির জন্য তোমার চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই, আরও উঁচু নজর কর!

মশক, দিবসে যদিও কখন কখন তোমার দর্শনলাভ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি নিশাচর—কামরূপী। তাই নানারূপে নানাস্থলে রক্ত শোষণ কর। তোমায় কখন দেখি, ধনীগৃহে ধনীর; কখন দেখি আদালতে মক্কেলের; কখন দেখি, জমিদারি কাছারিতে প্রজার রক্ত শোষন করিতেছ! বলিতে পারিনা, তোমাদের কমিউনিটিতে (community) মিউনিসিপালিটী (municipality) আছে কি না! কিন্তু তোমার পূর্ণ বিকাশ এক শ্রেণীর সমালোচকে—যাদের চক্ষু নাই, আছে কেবল হুল! বোধ করি, তুমিই নিরয় ঘোরে বহ্বাকারে বিরাজ কর বলিয়া যমপুরী এত ভয়ঙ্করী! বাপু, স্বর্গেও কি তুমি আছ? থাক যদি, তাহা হইলে কোন্ বর্ব্বর বৈকুণ্ঠ বাসের প্রার্থী? যে স্বর্গে তোমার ঐ সানাই বাজে তেমন স্বর্গ আমি চাই না।

বসুদেব—

ষ্টার থিয়েটারে বিজয়া সম্মিলনীর গীত।

১৩১৮ সাল।

(শ্রীঅমৃতলাল বসু রচিত।)

(১)

চলিলে আনন্দময়ি নিরানন্দ ক'রে ঘর।
আমার নয়ন-নিধি হরে' নিতে হেথা আজ এলেন হর ॥
মণ্ডপ দেখিয়া শূন্য,
হৃদি তন্ত্রী হয় ছিন্ন,
শোকেতে আচ্ছন্ন প্রাণ ঝরে আঁখি ঝর ঝর ॥
ঢোলেতে বাজিছে বোল,
সে যেন রোদন রোল,
বিদায়ে কি কাঁদে বাঁশী মানা কর দিগম্বর ;—
তুমি নিলে উমাশশী বাঁশী নিলে দাসীর স্বর ॥

(২)

পাছু ফিরে দেখ মা উমা পুরী আমার অন্ধকার।
থেকে যানা আর কটাদিন (সেথা) লুটবে না তোর কেউ ভাঁড়ার ॥
তুই হাসতে হাসতে যাস মা চলে,
আর আমি ভাসি হেথা নয়ন জলে,
দয়াময়ী ব'লে তোকে ডাকে না মা এ সংসার ॥
আমায় বুঝিয়ে দে মা মহামায়া,
পড়েছে (তোর) দয়ার উপর কিসের ছায়া,
জানিয়া তো হরজায়া আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সকল ছার ;—
কেবল তুই মা মুখ ফিরুলে করে বুকের ভিতর হাহাকার ॥

(৩)

দেখ অই শান্তি ঘটের জলে।
আর দেখ মা চক্ষু বুজে তোমার নিজের হৃদয় কমলে॥
তুমি দেখতে পাবে দিবানিশি
তোমার ঝি-জামায়ে মেশামিশি
হর আর তোমার উমাশশী হাসে বসি অই দুটি স্থলে॥
এই সংসার আমার ছেলে পুলে,
খাওয়াতে যে হয় জাগিয়ে তুলে,
আমি অন্নদিই বৃক্ষমূলে পশু পক্ষি নর কুলে চলাচলে ;—
এ সব ভুলে খালি তোমার কোলে থাকি বল্ মা কি ব'লে॥

নাট্যশালা।

(শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিত।)

নাট্যশালা সুবিশাল সীমাশূন্য স্থান,
ব্যাপিয়া বিপুল বিশ্ব বিস্তৃতি মহান॥
দৃশ্যপট চারিধারে,
কে তার গননা করে,
নদ নদী, অন্ধকার গহন কান্তার।
অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ মণ্ডিত তুষার॥
অনন্ত নীলিমা মাখা গভীর সাগর,
উর্ম্মিমালা নাচে কত বক্ষের উপর॥
কভু অতি শান্ত ধীর,
অস্থির কখন নীর,

প্রক্ষিপ্ত লবণবারি প্লাবি বেলাবন,
গভীর গর্জ্জনে তার বধির শ্রবণ ॥

সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপ মস্তকে ছাদন।
শোভে তায় হীরা মুক্তা মনি অগণন ॥
নিম্নদেশে মনোরম—
সুশ্যামল আস্তরণ,
ফুটিয়াছে নানাজাতি, নানাবর্ণ ফুল,
মধুগন্ধে অন্ধ অলি ছুটিছে আকুল।

আপনি প্রকৃতি দেবী নানা আভরণে
সাজায়ে দেছেন এ বিশাল রঙ্গাঙ্গনে ॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,
দিবানিশি ব্যস্ত তারা,
রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করিবার তরে।
ব্যজন করিতে ধীরে পবন সঞ্চরে।

নানাজাতি নটনটী সংখ্যা কেবা করে।
নানামত নাট্যরঙ্গে নিয়ত বিহরে ॥
কেহ ক্ষুদ্র শিক্ষাধীন,
কেহ বিজ্ঞ সুপ্রবীণ,
শান্ত শিষ্ট মিষ্টভাষী তায় কতজন।
ক্রূরমতি কেহ পাপে সদা নিমগন ॥

কতমত অভিনয় হয় চারিধারে।
প্রেমান্ধ দম্পতি কোথা প্রেমালাপ করে ॥
কোথা স্বার্থ সিদ্ধি তরে,
দ্বন্দ্ব করে পরস্পরে ;

কেহ প্রেমাকুল প্রাণে ডাকে ভগবান।
অভিনয় রঙ্গ তায় নাহি চাহে প্রাণ॥

কোথা প্রজ্জ্বলিত ঘোর সমর অনল।
অস্ত্র ঝরে যেন ঘোর বরিষার জল॥
বীরকণ্ঠে হুহুঙ্কার,—
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার,
কত শত বীরদেহ লুণ্ঠিত ধরায়,—
অবসান নাট্যলীলা—গৃহে ফিরে যায়॥

ক্ষুদ্রদেহ লয়ে নট পশে নাট্যশালে।
আপনার অভিনয় করে কুতুহলে॥
বিবেক শিক্ষক তার
লক্ষ স্বার্থ সবাকার
সময় জীবনব্যাপী,—কালপূর্ণ হলে,
নাট্যরঙ্গ সাঙ্গ হয় ধরা নাট্যশালে॥

নাট্য প্রসঙ্গ।

লব্ধ প্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একখানি সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছেন। "ষ্টার" থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্র বাবুর নাটক অভিনীত হইবে।

* * * * *

নট-গুরু শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন; তাঁহার পীড়ায় সকলেই চিন্তিত; ভগবান্ নাট্যাচার্য্যকে রোগমুক্ত করুন—ইহাই আমাদের কামনা।

* * * * *

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ "কহিনুর" থিয়েটারে যোগদান করিয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কি রচনার পাক চড়াইয়াছেন—তাহা এখনও অপ্রকাশ।

* * * * *

সংস্কৃত নাটকাবলির অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "অলীক বাবু" নামে এক খানি প্রহসন লিখিয়াছেন। গত ২৫শে কার্ত্তিক শনিবার "মিনার্ভা" থিয়েটারে "অলীক বাবু" প্রথম দর্শন দিয়াছেন।

* * * * *

প্রসিদ্ধ গীতি-নাট্যকার শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এখন "কোহিনুরে"। সম্প্রতি তিনি একখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছেন; "কোহিনুরে" তাহার মহলা চলিতেছে। গীতিনাট্য খানির নাম হইয়াছে—"জেনোবিয়া।"

* * * * *

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ একখান পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছেন; বহুদিন হইতে "মিনার্ভায়" এই নাটকের মহলা চলিতেছে। এই নাটক খানি "তপোবল" নামে শীঘ্রই "মিনার্ভা" থিয়েটারে অভিনীত হইবে।

* * * * *

প্রসিদ্ধ বিলাতী অভিনেতা অ্যালেন উইল্কি তাঁহার দলবল লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পাশ্চাত্য নাট্য-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন। "গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসে" তাঁহাদের অভিনয় চলিতেছে। গত ১৯শে কার্ত্তিক রবিবার অ্যালেন উইল্কি সদলবলে "কোহিনুর" রঙ্গমঞ্চে "ম্যাকবেথ"ও ২৫শে কার্ত্তিক রবিবার "ওথেলো" অভিনয় করিয়াছিলেন।

* * * * *

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রীযুত মনোমোহন গোস্বামী অসুস্থ হইয়াছিলেন, আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ছোটলাট বাহাদুরের

আদেশে মনোমোহন বাবুর "সংসার" নাটকের অভিনয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। "সংসার" লিখিয়া গোস্বামী মহাশয় স্থায়ী যশের অধিকারী হইয়াছিলেন; এতদিন পরে তাঁহার সাধের "সংসার" বন্ধ হইল।

* * * * *

স্বনামধন্য প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুত মনোমোহন বসু পীড়িত হইয়াছেন। পীড়া কঠিন, তিনি শয্যাগত। বসু মহাশয়ের বয়স হইয়াছে ৮৩ বৎসর। এ বয়সেও তিনি সাহিত্য-সেবায় বিরত নহেন; তাঁহার রচিত "সতীর অভিমান" নাট্যমন্দিরের গ্রাহকগণের হৃদয়ে আনন্দের তুফান তুলিয়াছিল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, মনোমোহন বাবু অচিরে নিরাময় হউন।

* * * * *

নাট্য-গগনের আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হইয়াছে। গত ৬ই কার্ত্তিক রবিবার রাত্রি ১১টার সময় সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য রামতরণ সান্ন্যাল মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। রামতরণ বাবুর বিয়োগে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু লিখিত ইঁহার বিস্তারিত জীবনবৃত্ত নাট্য-মন্দিরে অগ্রহায়ণের সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

* * * * *

গত ৮ই কার্ত্তিক বুধবার, গ্রেটন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রশংসার সহিত অভিনীত "বাজীরাও" নাটকের রচয়িতা শ্রীযুত মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসাহিত করিবার জন্য এক বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল। অভিনয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ মনিলাল বাবুকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সে দিন গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে বিপুল জন-সমাগম হইয়াছিল। নবীন নাট্যকারের প্রতি নাট্যামোদী জনসাধারণের এই অনুরাগ আশার কথা, প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

গত ২২শে কার্ত্তিক বুধবার "গ্রেট ন্যাশান্যাল" থিয়েটারের লব্ধ প্রতিষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতি সুশীলাবালার সাহায্য রজনী হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে "বলিদান" ও "বিল্বমঙ্গল" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। "বলিদানে" সুশীলাবালা—"জোবি" এবং "বিল্বমঙ্গলে"—"পাগলিনী"। উভয় ভূমিকাতেই সুশীলা প্রথিত যশের অধিকারিণী। সুতরাং সুশীলার গুণমুগ্ধ দর্শকবৃন্দ সুশীলার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের যথেষ্ট অবকাশও পাইয়াছিলেন—তাহা বলাই বাহুল্য।

* * * * *

কলিকাতার গৌরব-স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ "ষ্টার" থিয়েটার গত ২৫শে কার্ত্তিক হইতে শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের তত্ত্বাবধানে নূতন ধাঁজে নূতন আয়োজনে মহা আড়ম্বরে পরিচালিত হইতেছে। নব প্রতিষ্ঠিত "গ্রেট ন্যাশান্যাল" থিয়েটারে স্থানাভাবরশতঃ প্রত্যহ শতশত দর্শক ভগ্ন মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করায়, অমরেন্দ্র বাবু সদলবলে সুবিশাল "ষ্টার" রঙ্গমঞ্চ অভিনয়ার্থ মনোনীত করিয়াছেন। অমরেন্দ্র বাবু এখন ষ্টারের অধ্যক্ষ; তাঁহার নেতৃত্বে, বিজ্ঞ বহুদর্শী সুপ্রবীণ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর সুপরামর্শে এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুত হরিপ্রসাদ বসুর আন্তরিক যত্নে ষ্টার থিয়েটার নাট্যানুরাগী সুধীবৃন্দের নিকট অধিকতর আদৃত হইবে বলিয়াই মনে হয়। গত ২৫শে কার্ত্তিক শনিবার ষ্টার থিয়েটারে মহাসমারোহে "সৎসঙ্গ" অভিনীত হইয়াছে।

* * * * *

নটগুরু শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমগ্র কবিতাবলি সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের নাম হইয়াছে "প্রতিধ্বনি।" সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার "প্রতিধ্বনি"র ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"কবি গিরিশচন্দ্রকে সম্যক বুঝিতে হইলে, তাঁহার নাটকও দেখিতে হইবে, তাঁহার কবিতাগুলিও

পড়িতে হইবে। সাহিত্যসেবক পাঠক বলিবেন, সে সকল আমরা পড়িয়াছি, শুনিয়াছি। শুনিয়াছেন বটে, তখন সে গুলি ছিল ধ্বনি—এখন শুনুন প্রতিধ্বনি। ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী, প্রতিধ্বনি আবহমান কাল থাকে।" এই পুস্তকে গিরিশ বাবুর রচিত ৪৩টি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। "নাট্যমন্দিরে"র গ্রাহকগণ গিরিশ বাবুর সরস কবিতার রসাস্বাদন করিয়াছেন, সুতরাং তাহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। সুন্দর কাগজে এই পুস্তক মুদ্রিত, দিলাতিবৎ চমৎকার বাঁধাই। মূল্য বারো আনা, গুরুদাস বাবুর দোকানে প্রাপ্তব্য।

* * * * * *

আলিপুরের সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ "বুদ্ধ বাণী" নামে একখানি সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধদেব জীবোদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি কবিবর Edwin Arnold বিরচিত Light of Asia নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে অতি মনোজ্ঞ ভাষায় ও ভক্তপ্রাণের পূর্ণ আবেগের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সেই উক্তিগুলির পদ্যানুবাদ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন। আজ কাল কাব্য-সাহিত্যে কবিতার নামে যে সকল 'রাবিস' পাচার হইতেছে, আলোচ্য কবিতাগুলি সে শ্রেণীর নহে। গ্রন্থকার উচ্চ শিক্ষিত ও কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার কবিতার ভাষা যেমন সরল, তেমনি প্রাঞ্জল। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ সুন্দর হইয়াছে, মূল্য চারি আনা ; ২৮ নং ঈশ্বর গাঙ্গুলীর লেন, কালিঘাট—এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।